কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

শ্রীমদ্ভাগবত

সার সংকলন

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা

অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় ভাগবতের স্থান পঞ্চম। দুর্ভাগ্যক্রমে ভাগবত দুখানি—শ্রীমদ্‌ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত এবং দেবী ভাগবত। এই গ্রন্থের পুরাণ পরিচয়ে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত যদি মহাপুরাণ হয়, তা হলে দেবী ভাগবত উপপুরাণ। অন্যথায় দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত উপপুরাণ। দুখানিকেই মহাপুরাণ বললে হিসাবে মিলবে না। অথচ দুই গ্রন্থেই বারোটি স্কন্ধে আঠারো হাজার শ্লোক। পুরাণের লক্ষণাদি মিলিয়েও কাউকে হেয় করা যায় না। তাই সমন্বয়ের চেষ্টায় বলা হয়েছে যে পুরাকালে একখানি গ্রন্থ ভাগবত নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ প্রভাবের সময় গ্রন্থটি অপ্রচলিত হয়ে পড়লে ব্রহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের পরে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুখানি ভাগবত প্রচারিত হয় এবং উভয় গ্রন্থেই মূল ভাগবতের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান। পার্থক্য এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৈষ্ণব দর্শনের প্রাধান্য এবং দেবী ভাগবতে তন্ত্রের প্রভাব পরিস্ফুট। এদের কোনটিকে মহাপুরাণ না বলে পুরাণ বললে গ্রন্থের মর্যাদা কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না। উৎকর্ষ দিয়ে হবে এদের বিচার।

বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক উইলসন সাহেব মনে করেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবত দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। কোলব্রুক প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই গ্রন্থের রচয়িতা বোপদেব। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেবগিরিতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর আশ্রয়দাতা হেমাদ্রি এই গ্রন্থ থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন বলে অনেকেই একে বোপদেবের রচনা বলা অসঙ্গত মনে করেন।

তবে এই গ্রন্থ দেবগিরিতে না হলেও দক্ষিণ ভারতের কোন স্থানে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বলরামের তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলির নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো। গ্রন্থকার উত্তর ভারতের অধিবাসী হলে এই বিবরণ অন্য রকম হত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতকে বিষ্ণু ভাগবতও বলা হয়। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রচার এর মূল উদ্দেশ্য হলেও কৃষ্ণের লীলা এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। দশম ও একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ আছে। দশম স্কন্ধটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এই অংশে মথুরা বৃন্দাবন ও দ্বারকায় কৃষ্ণ লীলার

কথা বিবৃত হয়েছে। কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাত্রে বনের মধ্যে বিহার করেছেন। এই বর্ণনা অনেক স্থলেই অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই লীলার পূর্বে ও পরে কৃষ্ণের যে বয়সের উল্লেখ আছে, তা ছয় ও সাত বৎসর। এই বয়সেই তিনি অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন।

আর একটি বিস্ময়কর কথা এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার চরিত নেই, এমন কি রাধা নামের উল্লেখও কোনখানে নেই। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে এই গ্রন্থ রচনার কালে রাধার উপাসনা প্রচলিত হয় নি এবং রাধা বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হন নি। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে দেবী ভাগবতে রাধা চরিত আছে এবং এর থেকেই অনুমান করা যায় যে দেবী ভাগবত পরবর্তী কালের রচনা। অনেকে মনে করেন যে তন্ত্রের প্রভাবেই রাধার উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তন্ত্রানুসারী দেবী ভাগবতকে আধুনিক গ্রন্থ ভাবলে অসঙ্গত হবে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তান্ত্রিক মতবাদের প্রচলন প্রথম শতাব্দীতেও ছিল এবং নেপালে ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা তন্ত্রের পুঁথি পাওয়া গেছে। এর থেকে এও অনুমান করা হয় যে দেবী ভাগবতের কিছু অংশ শ্রীমদ্‌ভাগবতের চেয়ে পুরাতন হলেও অনেকাংশ পরবর্তী কালের রচনা। মূল ভাগবত পুরাণ অবলম্বন করেই এই দুটি ভাগবত ধীরে ধীরে বর্তমানের বিরাট আকার ধারণ করেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দার্শনিক উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। গীতায় কৃষ্ণ যে মত প্রকাশ করেছেন, বৈদান্তিক তত্ত্বের সঙ্গে সেই মত নানা উপাখ্যানের সাহায্যে বোঝাবার জন্যই এই ভাগবত রচনার প্রয়োজন হয়েছিল। বেদব্যাসের বেদান্ত মত এই ভাগবতে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বিবৃত হয়েছে। দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসকে বলছেন, তুমি ধর্ম ও অধর্মের কথা বলেছ, পুরাণ ও কাব্য রচনা করেছ। কিন্তু ভগবানের যশ প্রচার না করলে তাঁর পরিতোষ হয় না। যদি হরির গুণ কীর্তন না হয় তো মনোহর পদাবলী সম্বলিত বাক্য রচনা বৃথা। দেবর্ষির এই কথা শুনেই বেদব্যাস ভাগবত রচনা করেছিলেন। ভক্তিই ভাগবতের মূল উৎস।

এই পুরাণের রচনাশৈলী সুন্দর। ভাষাও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। তবে গদ্যাংশের ভাষা দুরূহ। রস বিচারে মনে হয় যে এই গ্রন্থের নানা স্থানে কবি-প্রতিভার পরিচয় আছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে বৈষ্ণবদের নিকটে

এই গ্রন্থের আদর অপরিসীম, অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এই শ্রীমদ্‌ভাগবতই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। একে পুরাণ না বলে ধর্মগ্রন্থ বলাই বেশি সমীচীন হবে।

আর একটি কথার উল্লেখ না করলে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে উদ্ধব গীতার কথা। মহাভারতে যেমন ভাগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তেমনি উদ্ধব গীতা। মহাভারতের গীতায় যুবক কৃষ্ণ তাঁর সমবয়সী আত্মীয় অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং একশো পঁচিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁদের মন্ত্রী ও বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছেন ভাগবতের গীতায়। এই গীতার স্থানে স্থানে এমন কবিত্বের সমাবেশ আছে যে তা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে।

পরিশেষে বলা কর্তব্য যে এই সার সংকলনে আর্যশাস্ত্রে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল অন্বয় ও অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে এবং পুরাণ পরিচয়ের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে মুখ্যত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাস এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতকোষ থেকে। এই বিরাট গ্রন্থ অনুবাদের পিছনে স্নেহাস্পদ শ্রীবিপুলকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহের কথাও সস্নেহে স্মরণ করি। তাঁর অনুরোধে হয়তো আমাকে দেবী ভাগবতেরও সার সংকলন করতে হবে।

গ্রন্থকার

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭, সল্ট লেক সিটি,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৪

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

সপ্তম স্কন্ধ

অষ্টম স্কন্ধ

বিষয়		পৃষ্ঠা

নবম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ

পূর্বার্ধ

বিষয়		পৃষ্ঠা

উত্তরার্ধ

বিষয়		পৃষ্ঠা

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

পুরাণ পরিচয়

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরা-ভবম্ ইতি পুরা-ট্যু বা তুট, নিপাতনে তুড় ভাব বা 'ত' লোপ পেয়ে পুরাণ হয়েছে। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ব বেদে আছে যে যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে ঋক্ সাম ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল।— ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ (অথর্ব ১১.৭.২৪)। এই রকমেরই কথা আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২.৪.১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪.৬.১০.৬)।—ভিজে কাঠের আগুন থেকে যেমন পৃথক ধোঁয়া বার হয়, তেমনি সমস্ত বেদ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সেই মহান ভূতের নিঃশ্বাস। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ।—ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম (৭.১.১)। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের প্রার্থনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, কতকটা সেই ভাবেই ঋষিরা পুরাণও পেয়েছিলেন। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে 'পুরাণ বেদ, এ সেই বেদ' এই কথা বলে অধ্বর্যু পুরাণ কথা বলেন।—অধ্বর্যুস্তাক্ষ্যো বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ··· পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত (১৩.৪.৩.১৩)।

এখন যেমন পুরাণকে ইতিহাস মনে করা হয় না, সেকালেও তা হত না। ইতিহাস শব্দটিও প্রচলিত ছিল এবং তার একটি বিশেষ অর্থ ছিল। বেদের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন যে বেদে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি ঘটনার নাম ইতিহাস।—দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। এবং আগে অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণের নাম পুরাণ।—ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং

জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্। শঙ্করাচার্যও তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একই কথা লিখেছেন—উর্বশী পুরূরবার সংবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস এবং সর্বাগ্রে শুধু অসৎ ছিল ইত্যাদি বিবরণের নাম পুরাণ।

একালে অবশ্য পুরাণের এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেকালে যা ইতিহাস বলা হত, তাও এখন পুরাণের অন্তর্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেকালের মানুষ যা ইতিহাস বলে মনে করতেন, একালের মানুষ তা আর ইতিহাস মনে করেন না। দেবাসুরের যুদ্ধ বা উর্বশী পুরূরবার কাহিনী এখন পুরাণেরই অন্তর্গত হয়েছে। সূর্য বংশের রাম বা চন্দ্র বংশের কৃষ্ণকে এখন আর ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে পুরাকালে পুরাণ নামে একখানি পবিত্র গ্রন্থ ছিল। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র মনু-সংহিতা ও মহাভারতে পাওয়া যায় যে পুরাণের সংখ্যা অনেক। শিব পুরাণের রেবা খণ্ডে আছে যে বেদব্যাস ছিলেন অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা।—অষ্টাদশ পুরাণানাং বক্তা সত্যবতী সুতঃ। পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডেও ঠিক একই কথা আছে। কিন্তু মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট ভাষায় আছে যে প্রথমে একখানি পুরাণই ছিল। পুরাণমেকমেবাসীৎ (৫৩.৪)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে যে সকল শাস্ত্রের আগে ব্রহ্মা পুরাণ প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়।—

প্রথমং সর্বশাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্তেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা। (১.৫৮)

এই পুরাণে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতা প্রচার করেন।

এই সব পৌরাণিক উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতাটি প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসকে একত্র করে তাকেই পুরাণ সংহিতা

বলেছিলেন। সংহিতা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই রকম। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে পুরাণ, তাতে এই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার কথা ছিল। এই অংশের রচয়িতার নাম জানা যায় না বলেই তাকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসের কথা, পূর্বে যা ইতিহাস নামেই প্রচলিত ছিল। এই একখানি গ্রন্থ থেকেই পরবর্তী কালে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বেদব্যাস যদি নিজে এই মহাপুরাণগুলি রচনা করতেন, তাহলে একই বিষয়বস্তু সকল গ্রন্থে আলোচিত হত না এবং বিভিন্ন পুরাণে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হত না।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধি দিয়ে পুরাণ সংহিতাটি রচনা করেন। নিজের চোখে দেখে যা লেখা হয় তার নাম আখ্যান, উপাখ্যান হল পরম্পরাশ্রুত কথা, পরলোক ও অন্যান্য বিষয়ে গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধকল্পাদি নির্ণয়কে কল্পশুদ্ধি বলা হয়। বেদব্যাস তাঁর সূত জাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে এই পুরাণ সংহিতা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ পুরাণই এই সূতের মুখে বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে যে সূত তাঁদের জাতীয় নাম এবং পুরাণ পাঠ তাঁদের জাতীয় ধর্ম। বেদব্যাসের শিষ্য সূতের বর্ণনায় শ্রোতাদের দেহ রোমাঞ্চিত হত বলেই তাঁর নাম রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ হয়েছিল। সেদিন এই পুরাণ ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বেদব্যাসের কাল পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এই পুরাণ সংহিতায় বিধৃত হয়েছিল।

সেকালে পুরাণ সংহিতা কোন ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হত না। তা হলে বেদব্যাস সূতকে পুরাণ সংহিতা দিতেন না। সূতের পিতা ব্রাহ্মণ

ছিলেন না। পুরাণ সংহিতা ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হলে বেদব্যাস নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই গ্রন্থ দিতেন এবং বেদের মতো পুরাণও ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত হত। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দ্বিতীয় ভাগে ঠিক এই কথাই লিখেছেন, 'পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্মোপদেশ দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্বতন পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষট্‌কর্মশালী ব্রাহ্মণ বর্ণেরই বৃত্তি বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি, মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়।'

রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্য ছিল বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন কশ্যপ বংশীয়ের নাম শাংসপায়ন অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এঁরা তিনজন গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন করে এক একখানি নূতন পুরাণ রচনা করেন। এই ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচয়িতা পুরাণগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। পুরাণগুলির ভাষা ভাব ও রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করে এই কথাই প্রমাণ হয় যে একটি সুবিস্তৃত কালের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন, যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের

এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণু পুরাণ কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।'

এই প্রসঙ্গেই পুরাণগুলির রচনা কালের কথা এসে পড়ে। সাধারণ ভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং তিনি দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। পুরাণেই এই হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন, 'And the testimony that establishes their existence three centuries before Christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious intitutions or beliefs of the ancient world.' তাঁর মতে খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগে এই পুরাণগুলি যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সব প্রমাণ দেখা যায় তাতে আরও অনেক প্রাচীন-কালে—প্রাচীন পৃথিবীর কোন জাতির কল্পনায়ও যা আসতে পারে না, তেমন অতীতে—এই সব পুরাণ বিদ্যমান ছিল বলা যেতে পারে। এই সশ্রদ্ধ মন্তব্যে এ দেশের পণ্ডিতরা সুখী হতে পারেন নি। পাঁচ হাজার বছরকে তিনশো বছর বলায় তাঁদের সংস্কারে বোধহয় আঘাত লেগেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে বিষ্ণু পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজ-বংশের কথায় বুদ্ধ ও নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরুষের উল্লেখ দেখেই তাঁর মনে হয়েছে যে গ্রন্থখানি এই সময়ের পরে রচিত। ভবিষ্যৎ রাজ-বংশের কথা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে, সে কথা তাঁর মনে হয় নি, বা হলেও সে সম্ভাবনার কথা তিনি মেনে নেন নি।

সে যুগে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নি। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তখন হাতে লিখে রক্ষা করা হত এবং পণ্ডিতরা এই কাজ করবার সময়ে যে কিছু যোগ করতেন না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক গ্রন্থেই অনেক শ্লোক অনায়াসে প্রক্ষিপ্ত হত।

যে পুরাণে শুধু সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বৈদিক যুগের। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের কল্পনায় উদিত হয়েছিল, এই পুরাণও তেমনি তাঁদের তপস্যার ফল। বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড মৎস্য প্রভৃতি পুরাণেই পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ পাওয়া যায়। সেগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টি-তত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা লয় ও পুনঃসৃষ্টি, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। বংশানুচরিতে সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের বিবরণ। বৈদিক পুরাণে শুধু সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনা ছিল বলে মেনে নিতে হয় যে পরবর্তী কালেই পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। হতে পারে যে বেদব্যাস সঙ্কলিত প্রথম পুরাণ সংহিতার এই পঞ্চ লক্ষণ পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার আদর্শ বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বেদব্যাস সঙ্কলিত মূল পুরাণ সংহিতাও যে অতি প্রাচীন কালে রচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন বলা উচিত কিনা তার বিচার এখন অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে অনেক পরবর্তী কালের রচনা, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম নিয়েও কিছু মতবিরোধ আছে। যেমন, কেউ বলেন যে বিষ্ণু পুরাণের পর শিব পুরাণ, কেউ বলেন বায়ু পুরাণ বিষ্ণু পুরাণের পর। কারও মতে শিব ও বায়ু পুরাণ একই, আবার অন্যের মতে এই দুটি পুরাণ ভিন্ন। শিব পুরাণও দুখানি আছে। ভাগবত নিয়েও এই রকম মতভেদ আছে। বৈষ্ণবরা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন; কিন্তু শাক্তরা বলেন দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ। কাজেই এই দুই পুরাণের একটিকে মহাপুরাণ ও অন্যটিকে উপপুরাণ

বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতই মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত।

এই সব পুরাণের ক্রম নিয়েও পুরাণে পুরাণে বিরোধ আছে। এই বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণের মতই সর্বাধিক গ্রাহ্য। ক্রমানুসারে বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়। কাজেই তার পরে যে সব পুরাণ রচিত হয়েছে তার ক্রম নির্দেশ যে বিষ্ণু পুরাণে সম্ভব নয়, তাও স্বীকার করতে হয়। মোটামুটি ভাবে সমন্বয় করে যে ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই ভাবেই পুরাণগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় উইলসন সাহেবের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রথম ব্রহ্ম পুরাণ। এর পূর্ব ভাগে সৃষ্টি প্রসঙ্গে দেবাসুরের জন্ম বৃত্তান্ত এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনায় বিষ্ণু পুরাণের সঙ্গে মিল অত্যন্ত বেশি। এতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নেই। উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে এই পুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দের পরে রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণ দ্বিতীয় বৃহত্তম। অথচ পুরাণের প্রকৃত লক্ষণ এতে নেই। সৃষ্টি খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ভূমি খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল, স্বর্গ খণ্ডের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরে তীর্থের মাহাত্ম্য ও ধর্মালোচনা, পাতাল খণ্ডে রামায়ণের একটি অংশ এবং উত্তর খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের বিবৃতি। এই পুরাণে ভারতে ম্লেচ্ছের আগমন, জৈন আচার ও আধুনিক বৈষ্ণবদের চিহ্ন ধারণের প্রসঙ্গ দেখে অনেকেই এটি দ্বাদশ শতাব্দের পরের রচনা মনে করেন এবং শেষ খণ্ডটি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দে রচিত বলে অনুমান করেন।

তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ। এই পুরাণ ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি বিবরণ ও ধ্রুব 'প্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে ভরত বংশের বিবরণ ও জম্বু দ্বীপ ও সপ্ত পাতাল প্রভৃতির বর্ণনা,

তৃতীয় অংশে মন্বন্তর ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি, চতুর্থ অংশে সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, পঞ্চম অংশে কৃষ্ণের কথা ও ষষ্ঠ অংশে কলির বর্ণনা আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে ভবিষ্য রাজবংশের বিচার করে একাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধরাও এ দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

চতুর্থ বায়ু বা শিব পুরাণ। বায়ু পুরাণ নামে যে পুরাণ এখন প্রচলিত আছে, তা সব চেয়ে প্রাচীন ও পুরাণের সমস্ত লক্ষণ যুক্ত। ছটি সংহিতায় বিভক্ত শিব পুরাণের একটি সংহিতার নাম বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ নামে তার দুটি ভাগ। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিবপূজার বিধি এই পুরাণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম ভাগবত পুরাণ। ভাগবত পুরাণ দুখানি—শ্রীমদ্‌ভাগবত ও দেবী ভাগবত। অনেকের মতে রচনার গুণ ও সাহিত্যিক মূল্যে শ্রীমদভাগবতই শ্রেষ্ঠ পুরাণ। তাঁদের ধারণা যে এটি বেদব্যাস বিরচিত এবং বিষ্ণু পুরাণের সমকালীন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার এই পুরাণের উদ্দেশ্য বলে বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের পূজা করেন। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধ আছে এবং অন্যান্য পুরাণের ন্যায় নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পুরাণের মতে সকলের উপরে ভক্তি এবং ভক্তি থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শাক্ত মতে দেবী ভাগবতই পঞ্চম পুরাণ। এই পুরাণটিও দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং দুটি ভাগবতেই শ্লোকের সংখ্যা আঠারো হাজার। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার চরিত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নারদ পুরাণ। চার পাদে বিভক্ত এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্তন করা হয়েছে। হরির উপাসনায় যে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তা নানা উপাখ্যান দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা আছে। নারদীয় ও বৃহন্নারদীয় নামে

একই রকমের দুখানি পুরাণ আছে। এই পুরাণের শেষাংশে আছে দেবনিন্দক ও গোঘাতকের নিকট যেন এই পুরাণ পাঠ না করা হয়। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে মুসলমান অধিকারের পর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দে এই পুরাণ রচিত হয়েছে। এতে পুরাণের লক্ষণ নেই বলে একে পুরাণ না বলে ভক্তিগ্রন্থ বললেই ভাল হত।

সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই পুরাণে সৃষ্টি রহস্য, দর্শন, তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ তো আছেই, তার উপরে নানা সুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে আছে দেবী মাহাত্ম্য নামে দুর্গা স্তব। এই দুর্গা স্তব চণ্ডী নামে হিন্দুর গৃহে পূজার মতো শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা হয়' পুরাকালে চণ্ডীমণ্ডপে নিত্য চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা ছিল। এই পুরাণটি অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন এবং নবম বা দশম শতাব্দে সংগৃহীত বলে অনুমান করা হয়।

অষ্টম অগ্নি পুরাণ। অগ্নির নিকট থেকে পাওয়া বলে এই পুরাণ অগ্নি পুরাণ নামে অভিহিত। এই পুরাণে অবতারের কথা, রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনী এবং পূজা ও ব্রত পদ্ধতি, দেব-দেবীর আকার বর্ণনা ও তীর্থ মাহাত্ম্যের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা আছে। যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও পশু চিকিৎসা, সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দ-প্রকরণ রাজধর্ম ও রত্ননিরূপণ এবং ব্যাকরণ অংশে ধাতু ও শব্দরূপও পাওয়া যায়। যুদ্ধপ্রণালী ও অস্ত্রাদি নির্মাণের পদ্ধতি, দুর্গ ও নগর নির্মাণের কৌশল, এমন কি তন্ত্রের বীজমন্ত্রও এই পুরাণে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে কোন প্রাচীন পুরাণ বলে মনে হয় না, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংকলন।

নবম ভবিষ্য পুরাণ। এই পুরাণের পাঁচটি পর্বে ব্রহ্মের প্রাধান্য প্রকাশের প্রয়াস আছে। প্রথম চারটি পর্বে সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনার পরে বিষ্ণু শিব ও সূর্য পূজা ও এই দেবতাদের মাহাত্ম্যের বিশদ বর্ণনা আছে। পঞ্চম পর্বে স্বর্গের বর্ণনা। প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীও এই পুরাণে আছে। এরই মধ্যে শাক দ্বীপের সূর্য-উপাসক

মগ জাতির উল্লেখ দেখে উইলসন সাহেব মনে করেন যে এতে ইরাণের অগ্নি-উপাসকদের কথা বলা হয়েছে। বম্বে থেকে প্রকাশিত ভবিষ্য পুরাণে মোগল বাদশাহ আকবরের কথা, কলকাতার বর্ণনা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের নাম দেখে অনেকে একে পুরাণ না বলে আধুনিক গ্রন্থ কিংবা কতকগুলি বিষয়কে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

দশম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত। ব্রহ্ম খণ্ডে সৃষ্টির ব্যাপারে কৃষ্ণের দেহ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি খণ্ডে সৃষ্টি কার্যে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী ও রাধা এই পঞ্চ প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, গণেশ খণ্ডে গণেশের কথা এবং কৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে কৃষ্ণলীলার কথা। প্রকৃতি ও গণেশ খণ্ডে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। রাধার প্রসঙ্গ আর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না বলে অনেকেই মনে করেন যে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই রাধা কৃষ্ণ লীলার কথা প্রচলিত হয়েছে।

একাদশ লিঙ্গ পুরাণ। দুই ভাগে বিভক্ত এই পুরাণের উদ্দেশ্য শিব মাহাত্ম্য ও লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রচার। প্রথম ভাগে সৃষ্টি বিবরণের পর লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা, শিবের বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণু ও শিব মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে আছে যে প্রলয়ের পরে যে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, তার জ্যোতিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই লিঙ্গ থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে পুরাণটি আধুনিক হলেও এই সময় থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়েছে।

দ্বাদশ বরাহ পুরাণ। এই পুরাণে বরাহ অবতারের লীলা প্রসঙ্গ আছে। পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি বিবরণ, দশাবতার তত্ত্ব, পূজাপার্বণ, ব্রত কথা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। অনেকে এটিকেও লিঙ্গ পুরাণের মতো পুরাণ না বলে একখানি ধর্মগ্রন্থ বলেন। রামানুজের

কালের কথা দেখে এই পুরাণকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ। এই বৃহত্তম পুরাণটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কাশী উৎকল ও প্রভাস খণ্ডে এই তিনটি তীর্থ ও দেবতার মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। মহেশ্বর খণ্ডে শিবের ও বৈষ্ণব খণ্ডে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ব্রহ্ম খণ্ডে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক তীর্থের কথা আছে। অনেকে বলেন যে অবন্তী খণ্ড নামে আর একটি খণ্ডে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ আছে। এই খণ্ডগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলে মনে করা হয়। স্কন্দ পুরাণে এত তীর্থের বিবরণ আছে যে এটিকে তীর্থের পুরাণ বললে অনুচিত হবে না।

চতুর্দশ বামন পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর বামন অবতারের কাহিনীই প্রধান। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী থাকলেও এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিন চার শো বৎসর পূবে কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ এই পুরাণ সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

পঞ্চদশ কূর্ম পুরাণ। এই পুরাণের চারটি সংহিতার মধ্যে এখন শুধু ব্রহ্ম সংহিতাই পাওয়া যায় এবং এই সংহিতাটিই কূর্ম পুরাণ নামে প্রচলিত। এতে সৃষ্টি ও বংশ বিবরণ থেকে শুরু করে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও ক্রিয়া মাহাত্ম্য আছে। ঈশ্বর গীতায় দর্শন তত্ত্বের আলোচনায় ভক্তি সাঙ্খ্য ও জ্ঞান যোগ প্রভৃতি এবং ব্যাস গীতায় ব্রহ্মচারী ধর্মের কথা আছে। অনেকের মতে এই ঈশ্বর গীতা শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সঙ্গে তুলনীয়। শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য এই পুরাণে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এই পুরাণের মতে শিব পুরাণ ও বায়ু পুরাণ এই দুইটি মহাপুরাণ। এতে কয়েকটি তন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ দেখে মনে করা হয় যে পুরাণখানি বেশি পুরাতন নয়।

ষোড়শ মৎস্য পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের কাহিনী প্রধান হলেও আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনী, সূর্য ও চন্দ্র বংশ ও ভবিষ্য রাজ বংশের বিবরণ আছে। এতে মহাপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ

আছে; কিন্তু এই পুরাণে উপপুরাণের বর্ণনা দেখে অনেকে একে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করেন না।

সপ্তদশ গরুড় পুরাণ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণে গরুড়ের কোন কথা নেই। এতে অনেক পূজা প্রায়শ্চিত্ত ব্রতকথাদি আছে। রত্ন পরীক্ষা, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, স্ত্রী বশীকরণ, মশক নিবারণের কথাও আছে। এ ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, নানা পৌরাণিক কাহিনী ও নরকের বর্ণনা আছে। এই পুরাণে অনেক নীতি কথা ও রাজ ধর্মের কথাও পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। স্কন্দ পুরাণের সব কয়টি খণ্ড যেমন একত্রে পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও পাওয়া যায় না। বায়ু পুরাণের শেষ অংশের নাম ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। এখন যা পাওয়া যায় তাতে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই রামায়ণের অন্তর্গত রাম গীতায় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে।

উপরে উক্ত পুরাণগুলির সংকলন কাল সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত তা মেনে নিলেও অনেকে তা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন যে প্রধান পুরাণগুলির সঙ্কলন কাল বৈদিক যুগের ঠিক পরেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অনুবাদ করেছিলেন ডক্টর বুহলার। তিনি ঐ গ্রন্থখানি তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলে মনে করেন, এমন কি পাণিনির পূর্বেও তা রচিত হয়ে থাকতে পারে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবের কোন উল্লেখ না থাকায় এটি খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দে রচিত বলে মনে করা হয়। আর এই গ্রন্থে কোন পুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের মতে ভবিষ্য পুরাণের ক্রম নবম বলে সে সময়ে এর পূর্বেকার আটখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল ভাবলে অনুচিত হবে না। যবদ্বীপে যে ব্রহ্মাণ্ড

পুরাণ পাওয়া যায় তা এ দেশের পুরাণ থেকে অভিন্ন। পঞ্চম শতাব্দে হিন্দুরা এই গ্রন্থ যবদ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানকার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভবিষ্য রাজবংশের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণের শেষ পুরাণ এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে পঞ্চম শতাব্দের পূর্বেই সমস্ত পুরাণগুলি রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্য রাজবংশ এর পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতে তখন গুপ্ত যুগের শেষ অবস্থা। অনুমান করা যেতে পারে যে ষষ্ঠ শতাব্দে গুপ্ত যুগের শেষ রাজারাই নিজেদের নাম পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়েছেন। এই ভাবে বিচার করলে মেনে নিতে আপত্তি হবে না যে বিষ্ণু পুরাণ পরীক্ষিতের সময়, গরুড় পুরাণ জনমেজয়ের পর এবং জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সংকলিত হয়েছিল।

বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয় যে সেটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ ছিল। কী ভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, প্রাণীর জন্ম হয়েছে কী ভাবে এবং পুরাকালে যে ইতিহাস প্রচলিত ছিল তাই সযত্নে সঙ্কলন করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য শ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে পরবর্তী কালে এই পুরাণ প্রচারের উদ্দেশ্য হয়েছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তির মহিমা প্রচার।' অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্দেশ্যই উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শৈব পুরাণকার শিবকে বলেছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, তেমনি বৈষ্ণব পুরাণকার বিষ্ণুকে এই সম্মান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে শাক্ত পুরাণকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির জননী রূপেও প্রচার করেছেন। আবার সৌরগণের বর্ণনায় সূর্যই সকলের প্রসবিতা। লিঙ্গ পুরাণে শিব বলছেন, তোমরা দুই মহাবলই আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তুমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার ডান পাশে ও তুমি হৃদয়োস্তব বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার বাম পাশে উৎপন্ন হয়েছ। শিব তাই বিষ্ণুকে

বৎস বলে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলছেন আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করছি এবং শিব তাঁর বশে সংহার করছেন। এই ব্রহ্মাই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে বলছেন, হে দেবী, তুমি আমার বিষ্ণুর ও শিবের শরীর উৎপাদন করেছ। ভবিষ্য পুরাণে সূর্যকেই সকলের প্রসবিতা বলা হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে দশটিতে শিবের, চারটিতে ব্রহ্মের, দুটিতে বিষ্ণুর এবং দুটিতে ভগবতীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই পুরাণেরই সম্ভব কাণ্ডে পাওয়া যায় যে শিব লিঙ্গ স্কন্দ ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্য মার্কণ্ডেয় মৎস্য কূর্ম বরাহ ও বামন এই দশটি পুরাণে শিবের, বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় ও নারদ এই চারখানি পুরাণে বিষ্ণুর, ব্রহ্ম ও পদ্ম এই দুটি পুরাণে ব্রহ্মের, অগ্নি পুরাণে অগ্নির ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সূর্যের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। শাস্ত্রকাররা এই অষ্টাদশ পুরাণকে প্রধানত সাত্ত্বিক তামসিক ও রাজসিক অথবা বৈষ্ণব শৈব ও ব্রাহ্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বিষ্ণু নারদ শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় পদ্ম ও বরাহ এই ছখানি পুরাণ সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণব পুরাণ, শিব লিঙ্গ মৎস্য কূর্ম স্কন্দ ও অগ্নি এই ছখানি পুরাণ তামসিক বা শৈব পুরাণ এবং ব্রহ্ম বামন মার্কণ্ডেয় ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত ও ব্রহ্মাণ্ড এই ছখানি রাজসিক বা ব্রাহ্মপুরাণ। শেষ পুরাণগুলিতে ব্রহ্মের প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। এই বিভাগেও মতান্তর দেখা যায়। শুধু মতের বিরোধ নয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। বিভিন্ন পুরাণে এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে বিরোধ, পুরাণকাররা নিজেরাই তার কারণ বলেছেন। বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলেছেন যে কল্প ভেদে রচনা ভেদ হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই দেবতা অনেক ও তাদের প্রত্যেকের উপাসনা প্রচলিত আছে। ঋষিরাও নিজেদের মনোমত দেবতার উপাসনা করতেন এবং সেই দেবতাকে সকলের প্রিয় করবার জন্য নানা ভাবে তাঁদের মহিমা কীর্তন

করতেন। পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার সময়ে এই মনোভাবের জন্যই পুরাণে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে।

পুরাণের মতো উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ, এই কথাই সাধারণ ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু অনুসন্ধান করলে শতাধিক উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণের মতো বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণও আছে। বৌদ্ধরা তাদের নখানি পুরাণকে নবধর্ম বলে। জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নামে এক একখানি পুরাণ আছে। তার মধ্যে আদি পদ্ম উত্তর ও অরিষ্টনৈমি এই চারখানি পুরাণ প্রধান।

পুরাণের দেবতত্ত্ব বা অবতারবাদ আলোচনা করতে হলে বেদে এই দুটি প্রসঙ্গের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা দরকার। প্রাচীন আর্য সমাজে ব্রহ্মাই ছিলেন উপাস্য দেবতা। কিন্তু বিষ্ণু শিব ও শক্তির উল্লেখও বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। চারটি বেদেই বিষ্ণুর বহু মন্ত্র আছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণুও যে একজন প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে যখন বেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদগুলি রচিত হয় তখন অন্যান্য দেবতার চেয়ে ব্রহ্মার উপাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে। চার বেদেই আমরা রুদ্রের নাম পাই। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় সংহিতায় রুদ্রাধ্যায় আছে। তাতে রুদ্রের শত নামের মধ্যে শিব ও মহাদেব নাম আছে। সূর্যও প্রধান দেবতা, সমস্ত বেদেই তাঁর স্তব আছে। দুর্গা বা শক্তির উপাসনাও যে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে আছে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে রচিত পুরাণগুলিতে এই বৈদিক দেবতারা সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছেন।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্রহ্মের উপাসনাই সবচেয়ে প্রাচীন, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা পরে প্রচলিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের উপাসনাও প্রচলিত ছিল না বলে বৈদিক গ্রন্থে তার বর্ণনা নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয়

উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৈদিক গ্রন্থে দেবতত্ত্বের যেরূপ আভাস, পুরাণে তাহাই সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পূর্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তজনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া হিন্দু ধর্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্তিত ও কি বিপর্যস্তই হইয়াছে!'

এই অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক গ্রন্থে আমরা অনেকগুলি অবতারের নাম দেখতে পাই। ঋগ্বেদে বামন অবতারের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে বামন মৎস্য কূর্ম ও বরাহ অবতারের কথা, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কূর্ম অবতারের কথা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বৈদিক গ্রন্থে অবতার ব্রহ্মার, বিষ্ণুর নয়। বৈষ্ণব পুরাণকাররা এই সব অবতার বিষ্ণুর নামে প্রচার করেছেন অনেক পরবর্তী কালে। ঠিক একই ভাবে শৈব পুরাণকার ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে শিবের নানা অবতারের কথা বলেছেন। সূর্যের অবতারের কথা বলা হয়েছে ভবিষ্য প্রভৃতি সৌর পুরাণে। শাক্ত পুরাণকাররা মার্কেণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে দেবীর অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হবে যে বৈদিক গ্রন্থে এই অবতারবাদ পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন প্রকাশে সহায়তা করেছিল। পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল, তখন মৎস্য ছিল ব্রহ্মের বা ব্রহ্মার অবতার, পৃথিবী কর্দমাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জন্ম হয় কূর্মের, তারপর

ক্রমে ক্রমে বরাহ, বামন ও মনুষ্যের। এই ভাবেই পূর্ণাবয়ব মানুষ পৃথিবীতে এসেছে।

পুরাণে যে প্রাচীন ভারতের একটা বিশ্বস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে কোন সংশয় নেই। অন্তত এ দেশে লিখিত ইতিহাসের পূর্বে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, তার পরিচয় শুধু পুরাণেই আছে। এ কথা বলেছিলেন এ দেশের পণ্ডিত ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে এ কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ বলেছিলেন যে মৎস্য পুরাণের অন্ধ্র রাজবংশ ও রাজাদের রাজত্ব কাল ভুল নয়। এ. বি. কীথ পুরাণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেও এফ. ই. পার্জিটার ও এল ডি. বার্নেট মনে করেন যে বেদের চেয়ে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সব কথা হয়তো সত্য নয়, কিংবা কিছু অসঙ্গতিও হয়তো আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি যে মূখ্যত এ দেশের ঐতিহাসিক দলিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূর্য বংশের ইক্ষ্বাকু অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর এক পুত্র নিমি ছিলেন বিদেহের রাজা। এই সূর্য বংশেরই এক রাজা বৈশালীতে রাজত্ব করতেন, আর একজন গুজরাতে। সূর্য বংশের কন্যা ইলা ও চন্দ্র বংশের পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা এলাহাবাদে রাজত্ব করেন। পুরূরবার পুত্র অমাবসু কনৌজে রাজা হয়েছিলেন, আর কাশীর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই সব রাজকুলের আদি পুরুষ ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৩ হাজার বছর আগের মানুষ। অর্জুনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের কথাও পুরাণে আছে। তারপরে ভবিষ্য রাজবংশের কথাও অনেক পুরাণে আছে। এই সব রাজাদের নাম আমাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন শিশুনাগ নন্দ মৌর্য শুঙ্গ কণ্ব অন্ধ্র ও গুপ্ত রাজাদের কথা। কী ভাবে এই সব নাম পুরাণে এসেছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শক হূণ যবন আভীর প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী জাতির কথাও পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণে

আছে বলেই এদের কথা ইতিহাস নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সৃষ্টি রহস্য ও প্রাচীন ইতিহাস ছাড়াও আরও অনেক রকমের কথা পুরাণে আছে। শুধু পূজাপদ্ধতি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দর্শন তত্ত্ব ও তীর্থ-মাহাত্ম্য নয়, রাজধর্ম যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা আয়ুর্বিদ্যা ও পশু-চিকিৎসা সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণ দুর্গ নির্মাণ নগর ও গ্রাম পত্তনের কথাও আলোচিত হয়েছে। এই সব আলোচনায় তৎকালীন উৎকর্ষের পরিচয় জানা যায়। এক কথায়, এই সব পুরাণ প্রাচীন হিন্দু জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় বিশ্বস্ত ইতিহাস। শ্রদ্ধা সহকারে এই পুরাণগুলি পাঠ না করলে ভারতবাসী তার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা অবহিত হতে পারবে না। ইদানীং দুষ্প্রাপ্য বলেই পুরাণ তার মূল্য হারিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার সত্য মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো পুরাণও ভারতের অমূল্য রত্ন।

পুরাণ বা মহাপুরাণের মতো উপপুরাণের কোন সঠিক সংজ্ঞা ও সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ মহাপুরাণ নিয়ে যে বিতর্ক আছে, তার জন্য একাধিক মহাপুরাণকে উপপুরাণের অন্তর্গত করা হয়। যেমন শিব ও বায়ু পুরাণের মধ্যে একখানি মহাপুরাণ, অপরটি উপপুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী ভাগবতের মধ্যেও একখানি মহাপুরাণ ও অপরটি উপপুরাণ। অনেক পণ্ডিতের মতে মহাভারতও একখানি মহাপুরাণ। সে ক্ষেত্রে অষ্টাদশ সংখ্যাকে না বাড়াতে চাইলে মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত আর একখানি পুরাণকে উপপুরাণের পর্যায়ে ফেলতে হবে। পুরাণ ও উপপুরাণের কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নি বলে লক্ষণ দিয়েও গ্রন্থ বিচার সম্ভব নয়। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে বেদব্যাসের পরবর্তী ঋষিরা পুরাণের লক্ষণযুক্ত একই

বিষয়বস্তু নিয়ে যে সব ছোট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেগুলিই উপপুরাণ। এর সংখ্যাও অষ্টাদশ বলে মনে করা হলেও উপপুরাণ নামে প্রচলিত আরও অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। বেদব্যাসের নামে প্রচলিত উপপুরাণও আছে।

কূর্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সতেরো থেকে কুড়ি এই চারটি শ্লোকে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। এই মত অনুসারে প্রথম সনৎকুমারোক্ত আছ্য, দ্বিতীয় নারসিংহ, তৃতীয় কুমারোক্ত স্কন্দ, চতুর্থ নন্দীশপ্রোক্ত শিবধর্ম, পঞ্চম তুর্বাসাঃ, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাপিল, অষ্টম বামন, নবম উশনাঃ, দশম ব্রহ্মাণ্ড, একাদশ বারুণ, দ্বাদশ কালিকা, ত্রয়োদশ মাহেশ্বর, চতুর্দশ শাম্ব, পঞ্চদশ সর্বার্থ সঞ্চায়ক সৌর, ষোড়শ পরাশরোক্ত, সপ্তদশ মারীচ এবং অষ্টাদশ ভার্গব।

এই নামগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকাতেও স্কন্দ, নারদীয়, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের নাম আছে। কূর্ম পুরাণের এই বচন উদ্ধৃত করবার সময় হেমাদ্রি বামনের বদলে মানব ও ভার্গবের বদলে ভাগবত বলেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে ভাগবত তুখানি—শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত ও দেবী ভাগবত। এদের মধ্যে একখানি মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দাবীই সর্বাধিক। বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী ভাগবতের স্কন্ধ ও শ্লোক সংখ্যা সমান এবং তুটি গ্রন্থই বিরাট আকারের। হেমাদ্রি প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের মতে কালিকা পুরাণ দেবী ভাগবতেরই উপপুরাণ।—ইদং যৎ কালিকাখ্যন্তু মূলং ভাগবতন্তু তৎ। কালিকা পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যেরই বর্ণনা এবং এই কারণেই দেবী ভাগবতকেই মহাপুরাণ বলা উচিত। এ কথা মানতে হলে মহাভারতের মতো শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণ আখ্যা না দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। এই ভাবে মহাপুরাণ বলে স্বীকার না করলে শিব বা বায়ু পুরাণের মধ্যে যে কোন একখানি উপপুরাণের পর্যায়ে পড়বে। নারদীয় পুরাণ শিব পুরাণকে মহাপুরাণ

বলেছেন ; আর পণ্ডিতরা বলেছেন যে কল্পভেদে কখনও বায়ু পুরাণ কখনও শিব পুরাণ মহা পুরাণ এবং অপরটি উপপুরাণ।

পুরাণ ও উপপুরাণ নিয়ে মতের যে বিরোধ তার সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি যে ভাগবত পুরাণ তাতে কোন সংশয় নেই। সেকালে একখানি গ্রন্থই ভাগবত নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ে এই গ্রন্থ বোধ হয় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের পরে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুখানি ভাগবত প্রচারিত হয়। বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীমদ্‌ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত প্রচার করেন এবং শাক্তরা প্রচার করেন দেবী ভাগবত। মূল ভাগবত পুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে ষোল হাজার শ্লোক ছিল বলে দুখানি গ্রন্থেই সমান সংখ্যক স্কন্ধ ও শ্লোক রচনা করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই মূল ভাগবতের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান। পার্থক্য এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৈষ্ণব দর্শনের প্রাধান্য এবং তন্ত্রানুসারী দেবী ভাগবতে তন্ত্রের প্রভাব পরিস্ফুট।

এই সব বিতর্ক থেকেই বোঝা যাবে যে অনেক উপপুরাণ মর্যাদায় মহাপুরাণেরই মতো এবং কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদার দাবীও রাখে। কালের বিচারে উপপুরাণগুলি যে অর্বাচীন সে কথাও ঠিক নয়। অনেক উপপুরাণ অতি প্রাচীন কালে সংগৃহীত হয়েছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থে তাদের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ষড়্‌গুরুশিষ্য তাঁর বেদার্থ দীপিকায় নৃসিংহ উপপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এরও পূর্বে অলবেরুণী নন্দা আদিত্য সোম সাম্ব ও নরসিংহ প্রভৃতি উপপুরাণের উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের নবম থেকে বিংশ শ্লোকে পুরাণ ও উপপুরাণের দশটি লক্ষণের কথা আছে। এই লক্ষণগুলি সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়। এই দশের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাকলেও পুরাণবিদরা তাকে পুরাণ বলে স্বীকার করেন। অনেক পুরাণে পাঁচটি লক্ষণও

বলা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে পুরাণ ও উপপুরাণের কোন ভিন্ন লক্ষণ নেই। একই বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থ মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত না হলেই তা উপপুরাণ বলে মনে করা হবে।

মহাপুরাণের মতো উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টদশ বলে মেনে নেওয়া হলেও কূর্ম পুরাণে উল্লিখিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম অবিসম্বাদিত নয়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নামের তালিকা এক নয় এবং মিলিয়ে দেখলে আরও অনেক নাম পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম নানা গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণ উপপুরাণগুলির মধ্যে মহাপুরাণের মতো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কালিকা পুরাণ দেবী ভাগবতেরই অংশ। ধর্ম পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, বশিষ্ঠ পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, বায়বীয় পুরাণ, ভাস্কর প্রভৃতি পুরাণের নামও উল্লেখযোগ্য। কল্কি পুরাণ বেদব্যাসের রচনা বলে মনে করা হয়। শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত উপপুরাণ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম পাওয়া যায় —'সৌর' 'গাণপত্য' ও 'সঙ্কীর্ণ' উপপুরাণ। সব মিলিয়ে উপপুরাণের সংখ্যা একশোরও বেশি হতে পারে।

পুরাণের মতো উপপুরাণগুলিতেও ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান কথা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য এই উপপুরাণগুলি থেকেও বহু বিশ্বস্ত তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। কাজেই তথ্যানুসন্ধানীর নিকটে এদের মূল্য পুরাণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

শ্রীমদ্‌ভাগবত

সার সঙ্কলন

প্রথম স্কন্ধ

ভগবৎ কথা ও ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য

দেবর্ষি নারদের উপদেশে বেদব্যাস পরমেশ্বরের ধ্যান করে ভগবানের লীলা-প্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়ন করতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে মহাপুরুষদের চিরাচরিত ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এই ধর্মে কোন কপটতা নেই, কোন স্বার্থ সিদ্ধির এমন কি মোক্ষ লাভের ইচ্ছাও নেই। তাই এটি নির্মল ধর্ম। পুণ্য কাজ করে সৌভাগ্য অর্জন করলেই এই শাস্ত্র শোনবার আগ্রহ জন্মে। ভাগবত শাস্ত্র কল্পবৃক্ষ বেদের ফল। এত দিন বৈকুণ্ঠের সম্পদ ছিল। দেবর্ষি নারদ তা বৈকুণ্ঠ থেকে এনে ব্যাসকে দিয়েছিলেন, ব্যাস তা তাঁর পুত্র শুকদেবকে দিয়েছিলেন এবং শুকদেবের মুখ থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে।

কলিযুগের প্রথমে নৈমিষারণ্যে শৌণক প্রভৃতি ঋষিরা স্বর্গ লাভের বাসনায় সহস্র বৎসর যজ্ঞ করেছিলেন। সেই সময়ে সূত সেখানে উপস্থিত হলে ঋষিরা তাঁকে আসন দিয়ে বললেন, তুমি তো পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম শাস্ত্র সমস্তই অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করেছ, তুমি তার সার আমাদের বল।

ঋষিদের এই কথা শুনে রোমহর্ষণের পুত্র সূত সসম্মানে উত্তর করলেন, আমি শুকদেবকে প্রণাম করি। নরোত্তম নরনারায়ণ

দেবী সরস্বতী ও ব্যাসকে নমস্কার করে জয়প্রদ শাস্ত্র পাঠ করতে হয়। যে ধর্মে ভগবানে ভক্তি হয়, সেই নিষ্কাম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বাসুদেবে ভক্তি হলে বৈরাগ্য আসে। এই ধর্মের ফলেই জীবের মুক্তি। অর্থ লাভ বা বিষয় ভোগ ধর্ম নয়। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ভোগ করা উচিত। যাঁরা তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁরা বলেন যে অদ্বিতীয় জ্ঞানই তত্ত্ব। একেই বেদান্তে ব্রহ্ম, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা ও ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান বলে।—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১

শাস্ত্রে ভগবানের তত্ত্ব শুনেই ভক্তির উদয় হয়। তাই একাগ্র চিত্তে ভগবানের কথা শোনা, তাঁর লীলা কীর্তন করা এবং ধ্যান ও পূজা করা উচিত। তীর্থের সেবা করে মহাপুরুষের সেবা করার সৌভাগ্য হয় এবং মহতের সেবায় ভগবানের উপাসনায় শ্রদ্ধা জন্মে। হরির কথা শুনলে ভগবান তার হৃদয়ে এসে সমস্ত পাপ নষ্ট করেন। তখন আর লোভ বা কামে মন ব্যস্ত হয় না, সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে মন প্রসন্ন হয়। ভক্তিতেই ভগবানের স্বরূপের সাক্ষাৎ হয়। এই জন্যই পুরাকালে মুনিরা বাসুদেবের সেবা করতেন। বাসুদেবই সমস্ত বেদ যজ্ঞ যোগ ক্রিয়া জ্ঞান তপস্যা ও ধর্ম, বাসুদেবই সমস্ত কর্ম ফলের উদ্দেশ্য। তিনি কার্য-কারণরূপ ত্রিগুণ মায়ায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে গুণযুক্ত মনে হলেও তিনি নির্গুণ। সমস্ত জীবে বর্তমান বলে তাঁকে বহু মনে হয়। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সমস্ত লোক পালন করেন।

ভগবানের চব্বিশ অবতার

সূত বললেন, ভগবান প্রথমে পুরুষ রূপ ধারণ করেছিলেন। এই রূপেই যখন তিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই মূর্তিই সমস্ত অবতারের অক্ষয়

বীজ স্বরূপ এবং এঁরই অংশে সমস্ত অবতারের উৎপত্তি ও লয় হয়।

তিনি কৌমার নামে ব্রাহ্মণ দেহ আশ্রয় করে দুষ্কর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় বার রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন। তৃতীয় অবতার ঋষি স্বর্গে তিনি নারদ হয়ে জন্মে বৈষ্ণব তন্ত্র প্রচার করেন। চতুর্থ অবতারে নরনারায়ণ ঋষি রূপে কঠোর তপস্যা করেন। কপিল তাঁর পঞ্চম অবতার, সাংখ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য তাঁর জন্ম। ষষ্ঠ অবতারে তিনি দত্তাত্রেয় নামে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন। যজ্ঞ তাঁর সপ্তম অবতার, রুচির পুত্র রূপে জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি ইন্দ্র হয়েছিলেন। তারপর ঋষভ নামে তাঁর অষ্টম অবতার, নাভি রাজার পুত্র হয়ে তিনি জন্মেছিলেন। নবম অবতারে তাঁর নাম হয় পৃথু। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি মৎস্য অবতার রূপে বৈবস্বত মনুকে নৌকায় রক্ষা করেছিলেন। তারপর দেবাসুর যখন সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তিনি কূর্ম রূপ ধারণ করেন। এটি তাঁর একাদশ অবতার। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অবতারও এই সময়ে। প্রথমে তিনি ধন্বন্তরি রূপে অমৃত কলস নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, তারপর মোহিনী মূর্তিতে অসুরদের মুগ্ধ করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন। চতুর্দশ অবতারে তিনি নৃসিংহ মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। তারপর পঞ্চদশ অবতারে বলিকে স্বর্গচ্যুত করবার জন্য বামন রূপ ধারণ করেছিলেন। পরশুরাম তার ষোড়শ অবতার। ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী দেখে তিনি একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য করেছিলেন। তারপর তিনি বেদব্যাস রূপে জন্মে বেদ বিভাগ করেন। দশরথের পুত্র রাম হয়ে জন্মে তিনি রাবণ বধ করেন। তারপর পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তিনি যদু বংশে রাম ও কৃষ্ণ নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ দুটি তাঁর ঊনবিংশ ও বিংশ অবতার।

কলিযুগ আরম্ভ হলে তিনি মগধে বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হবেন। কলির শেষে তিনি জন্মাবেন কল্কি নামে। হরির অসংখ্য অবতার। এঁরা কেউ পুরুষের অংশ, কেউ কলা বা বিভূতি। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। [দুটি অবতারের নাম নেই।] নিরাকার চৈতন্যময় ভগবানের এই স্থূল রূপ মায়াগুণে আত্মায় বিরচিত হয়েছে।

বেদব্যাস ভাগবত নামে এই পুরাণ রচনা করে শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। মহারাজা পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গাতীরে আমৃত্যু উপবাস ব্রত নিয়ে ঋষিদের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন শুকদেব এই ভাগবত কীর্তন করেছিলেন। সেই সভায় বসে আমি যেমন শুনেছি ও বুঝেছি, তাই আপনাদের বলছি।

নারদ-বেদব্যাস সংবাদ

সূতের এই কথা শুনে কুলপতি শৌণক বললেন, এই বিষয়ে তোমার কাছে আমরা সব কথা জানতে চাই। বেদব্যাস শুকদেব ভাগবত রচনা ও পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে যাবতীয় কথা জানবার জন্য আমরা আগ্রহী।

সূত বললেন, দ্বাপর যুগ এলে মহর্ষি পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে হরির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বদরিকাশ্রমে সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দিব্য চক্ষে জগতের অবস্থা দেখে যুগের প্রযোজন অনুযায়ী ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামে বেদ বিভাগ করলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ হল। চারি বেদ পেলেন পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ পেলেন পুরাণ শাস্ত্র। স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজাতির পক্ষে বেদ শ্রুতি-গোচর নয় বলে বেদব্যাস সবার জন্য মহাভারত রচনা করলেন। এইসব কাজের পরেও তাঁর মন প্রসন্ন হল না দেখে তিনি এই অপূর্ণতার কারণ ভাবতে লাগলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন এবং উপবিষ্ট হয়ে

হাসতে হাসতে বললেন, তুমি তো সবই করেছ, তবু তোমার দুঃখ কেন!

ব্যাস বললেন, সর্বজ্ঞ নারদ, আপনিই এর কারণ বলুন।

নারদ এর উত্তরে বললেন, ধর্মের কথা তুমি সবিস্তারে বলেছ, কিন্তু ভগবানের নির্মল লীলার কথা বল নি। লোকে এখন যা ধর্ম বলে মনে করে, তা নিষেধ করলে তারা সত্য বলে মানবে না। এই আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞদের জন্য তুমি ভগবানের লীলা প্রচার কর। পূর্ব জন্মে আমি এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসীর পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম এবং বর্ষায় ঋষিরা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। বালক বয়সেই আমি তাঁদের সেবায় সন্তুষ্ট করে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ পেয়েছিলাম। এই শাস্ত্রেই আমি ভগবান বাসুদেবের মায়ার প্রভাব জেনেছি। এ তাঁরই উপদেশ। তুমি তাঁর এই লীলার কথা প্রচার কর।

বেদব্যাস বললেন, উপদেশ লাভের পর আপনি কী করেছিলেন বলুন।

নারদ বললেন, আমি মায়ের একমাত্র পুত্র বলে মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু আমার পাঁচ বছর বয়সেই সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন আমি সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেড়ে উত্তর দিকে চলতে থাকি। সেদিকে সমৃদ্ধ জনপদ বন ও উপবন। আমি ক্লান্ত ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলাম। একটি জলাশয়ে স্নান ও জলপান করে নির্জন বনের একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে বসলাম। তারপর ঋষিদের মুখে শোনা পরমাত্মার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভক্তি-ভরে ভগবানের ধ্যান করতে করতে আমার চোখ সজল হল এবং আমার হৃদয়ে হরি আবির্ভূত হলেন। অত্যধিক প্রেমে আমার দেহ পুলকিত হয়ে উঠল এবং আনন্দের আতিশয্যে পরমাত্মাকে আর দেখতে পেলাম না। ভগবানের সেই রূপ আর দেখতে না পেয়ে উন্মত্তের মতো আমি উঠে দাঁড়ালাম। অনেক চেষ্টা করেও পুনরায়

তাঁকে দেখতে না পেয়ে খুব কাতর হলাম। এই সময়ে ভগবান অগোচরে থেকেই বললেন, এ জন্মে তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না, পর জন্মে তুমি আমার পার্ষদ হবে। তারপর আমি ভগবানের নাম কীর্তন করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলাম। সময় হলে আমার মৃত্যু হল। প্রলয়কালে ভগবান সমুদ্রের জলে শয়ন করলে ব্রহ্মার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি তাঁর দেহে প্রবেশ করলাম। সহস্র যুগের পর তিনি নিদ্রোত্থিত হয়ে সৃষ্টির ইচ্ছা করলে তাঁর ইন্দ্রিয় থেকে মরীচি প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আমারও জন্ম হল। এখন আমি বীণা বাজিয়ে হরির কথা গান করে জগতের সর্বত্র বিচরণ করি।

সূত বললেন, নারদ বেদব্যাসকে এই কথা বলে বীণা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন এবং বেদব্যাস নিজের আশ্রমে এসে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তাঁকে ও তাঁর আশ্রিত মায়াকে দেখতে পেলেন। তারপর তিনি ভাগবত সংহিতা রচনা করে নিজের পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করালেন। শুকদেবের বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হলেও হরির লীলারস আস্বাদনের জন্য আকৃষ্ট হয়েছিল।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ

সূত বললেন, এইবারে পাণ্ডবদের কথা বলব। এখান থেকেই কৃষ্ণ কথার উদয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে বীরদের মৃত্যু হলে ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়। তাঁকে খুশী করবার জন্য অশ্বত্থামা রাত্রিকালে দ্রৌপদীর নিদ্রিত শিশুপুত্রদের শিরশ্ছেদ করে তাদের মাথা দুর্যোধনকে উপহার দেন। সকলেই এই ঘৃণিত কাজের নিন্দা করলেন এবং তা দুর্যোধনেরও অপ্রিয় হল। দ্রৌপদী শোকার্ত হয়ে কাঁদছেন দেখে অর্জুন বললেন, আমি তোমার শোক নিবারণের জন্য অশ্বত্থামার মাথা কেটে এনে দেব। বলে রথে চড়ে অশ্বত্থামার পিছনে ধাবিত হলেন। প্রাণের ভয়ে অশ্বত্থামাও রথে চড়ে পালাতে লাগলেন এবং যখন আর পারলেন না তখন আত্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র

প্রয়োগ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড তেজ দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, এ কিসের তেজ আমি তা বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণ বললেন, প্রাণের ভয়ে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন, তুমিও ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে একে বিনাশ কর।

সূত বললেন, অর্জুনও আচমন করে কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তারপর এই দুই অস্ত্রের তেজ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে প্রলয়কালের অগ্নির মতো হল। অর্জুন দুটি অস্ত্রকেই উপসংহার করলেন। তারপর অশ্বত্থামাকে ধরে যজ্ঞের পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাজবাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। তাই দেখে কৃষ্ণ বললেন, নিদ্রিত নিরপরাধ বালকদের যে বধ করেছে তাকে তুমি বধ কর, দ্রৌপদীর কাছে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা পালন কর। কিন্তু অর্জুন গুরুপুত্রকে বধ না করে দ্রৌপদীর কাছে তাঁকে টেনে আনলেন। অশ্বত্থামা লজ্জায় অধোবদন হয়েছেন দেখে দ্রৌপদী তাঁকে প্রণাম করে বললেন, ইনি পূজনীয় ব্রাহ্মণ, এঁকে বন্ধন মুক্ত কর। আমি তো পুত্রহীন হয়েছি, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে এঁর মাকে যেন কাঁদতে না হয়।

সুত বললেন, সকলে দ্রৌপদীকে সমর্থন করলেন। কিন্তু ভীম বললেন, না, এঁকে বধ করাই উচিত। কৃষ্ণ বললেন, আততায়ীকে বধ করা উচিত, কিন্তু ব্রাহ্মণকে নয়! তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, আবার আমাদের অপ্রীতির কাজও কোরো না। কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে অর্জুন অশ্বত্থামার শিখার সঙ্গে মাথার মণি ছেদন করলেন, তারপর বন্ধন মুক্ত করে শিবির থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মাথা মুড়িয়ে বাসস্থান থেকে নির্বাসনই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের সমান।

এর পর সকলে গঙ্গায় গিয়ে মৃত জ্ঞাতিদের তর্পণ করলেন। মুনিদের সঙ্গে কৃষ্ণও গান্ধারী কুন্তী দ্রৌপদী ও শোকার্ত সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর অপহৃত রাজ্য ফিরে পেলেন এবং

তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তারপর কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাবার জন্য সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে রথে আরোহণ করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে ছুটে আসছেন এবং বলছেন, হে দেবদেব, যে অস্ত্র আমাকে তাড়া করে আসছে সে আমার গর্ভের শিশুকে যেন নষ্ট না করে।

সূত বললেন, এ কথা শুনেই কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করবার জন্য অশ্বত্থামাই এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। পাণ্ডবরা পাঁচটি বাণ দেখতে পেয়ে তা প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র ধারণ করলেন। কৃষ্ণ তাঁর নিজের অস্ত্র সুদর্শন দিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষা করলেন এবং উত্তরার দেহে প্রবেশ করে নিজের মায়ায় তাঁর গর্ভ আবৃত করে রাখলেন। তাঁর প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হল। কুন্তী কৃষ্ণের স্তব করে বললেন, আমি তোমাকে প্রণাম করছি।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আরও কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও সৈন্য বধের জন্য নিজেকেই দায়ী ভেবে পাপের ভয়ে ধর্মের কথা জানবার জন্য কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকটে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতারা, ব্যাস ধৌম প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা এবং অর্জুনের রথে কৃষ্ণও গেলেন। শরশয্যায় ভীষ্মকে তাঁরা সকলে প্রণাম করলেন। ভীষ্মকে দেখবার জন্য সমস্ত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও রাজর্ষিরাও এসে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম সকলকে সম্মান করে পাণ্ডবদের বললেন, তোমরা কৃষ্ণের আশ্রিত, তবু তোমাদের যে এত কষ্ট হল, এ দুঃখেরই কথা। কৃষ্ণই আদি পুরুষ, সাক্ষাৎ নারায়ণ।

সূত বললেন, শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির নানাবিধ ধর্ম জিজ্ঞাসা করলেন। এই সময়েই ইচ্ছামৃত্যু যোগীর কাম্য উত্তরায়ণ কাল এল। ভীষ্ম কথা বলা বন্ধ করে চোখ বুঁজে কৃষ্ণে তাঁর মন সংযোগ করলেন। তাঁর স্তব করে বললেন, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন ও তপস্যা করে আমি যে অমূল্য সম্পদটি অর্জন করে রেখেছি, সেই নির্মল মন আজ আমি আমার ভগবান কৃষ্ণকে উপহার দিলাম।

তাঁর দেহ স্থির হয়ে গেল, নিঃশ্বাস দেহের মধ্যেই শেষ হল। ভীষ্ম নির্বিকার ব্রহ্মকে পেলেন বুঝে সকলে নির্বাক হয়ে রইলেন। দেবতারা দুন্দুভি বাজালেন এবং আকাশ থেকে হল পুষ্পবৃষ্টি। ভীষ্মের দাহ কার্য করে সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণ কুরু রাজ্যের বংশ রক্ষা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভীষ্ম ও কৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির বুঝতে পেরেছিলেন যে এ জগৎ ঈশ্বরের অধীন এবং কেউই স্বাধীন নয়। এই নূতন ধারণা নিয়েই তিনি সমুদ্র পর্বত পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ভগিনী সুভদ্রার নিকটে কয়েক মাস কাটিয়ে সকলকে বিষণ্ণ করে দ্বারকা যাত্রা করলেন। তিনি কুরু, জাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, সযামুনা ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত ও মরুধন্ব অতিক্রম করে সৌবীর ও আভীরের পর আনর্তে উপস্থিত হলেন। সূর্য তখন অস্তমিত হচ্ছিল।

সূত বললেন, সমৃদ্ধ দ্বারকায় পৌঁছে কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। এই শব্দ শুনে দ্বারকাবাসী তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য নানা উপহার নিয়ে ছুটে এলেন। কৃষ্ণ সবার সঙ্গে দেখা করলেন। আত্মীয়-স্বজন পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পর গেলেন নিজের গৃহে।

পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান

শৌণক বললেন, আমরা পরীক্ষিতের জন্ম কর্ম ও মৃত্যুর কথা শুনতে চাই।

সূত বললেন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ নষ্ট হয় নি। শুভলগ্নে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয়। [অভিমন্যু অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র] যুধিষ্ঠির প্রীত মনে ধৌম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের দ্বারা জাতকর্ম করালেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করলে তাঁরা বললেন যে বিষ্ণু এই বালককে মাতৃগর্ভে রক্ষা করার জন্য এর নাম হবে বিষ্ণুরাত এবং ইনি

মহাভাগবত হবেন। ইনি ইক্ষাকুর মতো প্রজা রক্ষা করবেন, রামের মতো ব্রাহ্মণের হিতকারী ও সত্যনিষ্ঠ হবেন, শিবির মতো দাতা ও শরণাগতের রক্ষক হবেন এবং ভরতের মতো কীর্তিবর্ধক হবেন। ইনি পাণ্ডব অর্জুন ও কার্তবীর্য অর্জুনের মতো বীর হবেন, অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ ও সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন। ইনি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতো সুখসেব্য, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল ও পিতামাতার মতো সহিষ্ণু হবেন। সবার সঙ্গে ব্যবহারে ব্রহ্মার মতো, প্রসন্নতায় শিবের মতো এবং আশ্রয় দানে বিষ্ণুর মতো হবেন। কৃষ্ণের মতো হবেন মহিমায়, উদারতায় রন্তিদেবের মতো ও ধার্মিক হবেন যযাতির মতো। ধৈর্যে বলির মতো ও প্রহ্লাদের মতো কৃষ্ণভক্ত হবেন। এই বালক অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন এবং কলিকে দমন করবেন পৃথিবীতে ধর্ম রক্ষার জন্য। ব্রাহ্মণের শাপে সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে জেনে বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করবেন। শুকদেবের নিকটে আত্মতত্ত্ব জেনে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করে ইনি ব্রহ্মলোকে যাবেন।

জাতক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে বিদায় নিলেন। এই বালকই পরে পরীক্ষিৎ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মাতৃগর্ভে তিনি যে পুরুষকে দেখেছিলেন তাঁকে রক্ষা করতে, তাঁকে স্মরণ করেই তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতেন বলে তাঁর নাম হয় পরীক্ষিৎ। তিনি চন্দ্রকলার মতো বর্ধিত হতে লাগলেন।

জ্ঞাতিবধের পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু প্রজাদের নিকটে তিনি কর ও দণ্ড ছাড়া অর্থ নিতেন না বলে তাঁর রাজকোষে অর্থাভাব ছিল। আহূত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জেনে তাঁর ভ্রাতাদের উত্তরে পাঠালেন। তাঁরা মরুত্ত রাজার পরিত্যক্ত স্বর্ণ পাত্রাদি সংগ্রহ করে আনলেন। তাই দিয়ে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের প্রীতির জন্য কয়েক মাস হস্তিনাপুরে বাস করে অর্জুনকে নিয়ে যাদবদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

এ দিকে বিদুর তীর্থ যাত্রায় মৈত্রেয়র নিকটে নিজের গতির কথা জেনে হস্তিনাপুরে ফিরলেন। বিদুরের বিরহে সকলেই এতদিন নিষ্প্রাণ ছিলেন। তাঁকে সবাই সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর আহার ও বিশ্রামের পর যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি নিজেই তীর্থের মতো, আপনার তীর্থ যাত্রার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি সকলের কুশল দেখে এসেছেন তো?

বিদুর একে একে সব কথাই বললেন। কিন্তু আত্মীয়রা দুঃখ পাবেন বলে যদু বংশ ধ্বংস হবার সংবাদ দিলেন না। তিনি কিছুকাল ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বাস করবার পর কালের আক্রমণ হচ্ছে বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, আপনার সবাই তো নিহত হয়েছে, আপনিও জরাগ্রস্ত, অন্ধ ও দন্তহীন। এখন আবার বধির ও বুদ্ধিহীন। অগ্নিমান্দ্য হয়েছে, কফ বমন করছেন। অথচ যাদের একদিন বিষ দিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন এবং ভূসম্পত্তি ও ধন হরণ করেছিলেন, এমন কি যাদের পত্নীরও অবমাননা করেছিলেন, তাদেরই দেওয়া পিণ্ড গিলে গৃহপালিত পশুর মতো জীবন ধারণ করছেন। জীবের জীবিত থাকবার আশা এমন প্রবল কেন! এখন সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করে আপনার এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করাই উচিত।

ছোট ভাইএর এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করে উত্তরে হিমালয়ের দিকে চললেন। গান্ধারীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর অভ্যাস মতো সন্ধ্যা বন্দনার পর গুরুজনদের প্রণাম করতে এসে দেখলেন যে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুর নেই। সঞ্জয়কে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোন অপরাধের জন্যই কি আমার পিতৃব্যরা দুঃখ পেয়ে চলে গেছেন? সঞ্জয় বললেন, তাঁরা আমাকেও বঞ্চনা করে গেছেন।

এর পর নারদ এলেন তুম্বুরুর সঙ্গে। যুধিষ্ঠির তাঁদের এই কথা জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন, সমস্তই ঈশ্বরের অধীন, তাই কারও জন্য শোক কোরো না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে নিয়ে হিমালয়ের

দক্ষিণে ঋষিদের আশ্রমে গেছেন। সাতজন ঋষির প্রীতির জন্য গঙ্গা নিজেকে সাতটি প্রবাহে বিভক্ত করেছেন, ঋষিরা সেই তীর্থকে সপ্তস্রোত বলেন। তাঁরা সেই তীর্থে স্নান করে কেবল জলপান করে শান্ত আছেন। আজ থেকে পঞ্চম দিনে ধৃতরাষ্ট্র দেহত্যাগ করবেন এবং গান্ধারী পতির সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করবেন। বিদুর আবার তীর্থ সেবায় বেরোবেন। এই বলে নারদ তুম্বুরুর সঙ্গে স্বর্গে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁর শোক ত্যাগ করলেন।

সূত বললেন, অর্জুন দ্বারকায় যাবার পর সাত মাস কেটে গেল। কিন্তু ফিরে এলেন না এবং যুধিষ্ঠির নানা দুর্লক্ষণ দেখতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, দেবর্ষি নারদ যে কথা বলেছিলেন সেই সময় কি এসেছে? কৃষ্ণ কি দেহত্যাগ করছেন?

এমন সময়ে অর্জুন এসে তাঁকে প্রণাম করে অধোবদনে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে জল। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল ভাবে দ্বারকার সকল আত্মীয়ের কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন। অর্জুন বহু কষ্টে শোক দমন করে চোখ মুছে বললেন, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করেছেন। আমার যে তেজ দেখে দেবতারাও বিস্মিত হতেন, তিনি তা অপহরণ করেছেন। কৃষ্ণের বিরহে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছি। তাঁর ষোল হাজার পত্নীকে আনবার সময় পথে আমি দুর্বৃত্ত গোপদের হাতে স্ত্রীলোকের মতো পরাজিত হয়েছি। আপনি যে আশঙ্কা করেছেন তা সত্য। ব্রাহ্মণের অভিশাপে মদিরা পান করে পরস্পর যুদ্ধ করে চার পাঁচ জন ছাড়া যদু বংশের আর সবাই নিহত হয়েছেন।

কৃষ্ণের গতি ও যদুবংশ নাশের কথা শুনে কুন্তী ভগবানে মনোনিবেশ করে সংসার থেকে নিবৃত্ত হলেন। যুধিষ্ঠিরও স্থির চিত্তে স্বর্গের পথে যাবার জন্য নিশ্চয় করলেন। তিনি পৌত্র পরীক্ষিৎকে সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি করে হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করলেন এবং অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেন দেশের অধিপতি করে

মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর রাজবেশ ত্যাগ করে কৌপীন পরলেন, আহার ত্যাগ করে মৌনী হলেন এবং কেশ মুক্ত করে জড় উন্মত্ত ও পিশাচের মতো দেহে বধিরের মতো কারও কথা না শুনে গৃহত্যাগ করলেন। পরমব্রহ্মকে ধ্যান করতে করতে তিনি উত্তর দিকে চললেন। অধর্মের বন্ধু কলি পৃথিবীর প্রজাদের অধিকার করেছে দেখে তাঁর ভাইরাও অগ্রজের অনুসরণ করলেন। নির্মল ভক্তিতে তাঁরা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠে গতি লাভ করলেন। বিদুরও প্রভাস তীর্থে দেহত্যাগ করলেন। পাণ্ডবরা কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করলেন না দেখে দ্রৌপদীও বাসুদেবে একান্ত চিত্ত হয়ে তাঁকে পেলেন।

পরীক্ষিতের কথা

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর জনমেজয় প্রভৃতি চারটি পুত্র জন্মে। কৃপাচার্যকে গুরু করে তিনি গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তারপর দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি দেখেন যে শূদ্রমূর্তি কলি রাজবেশে একটি বৃষ ও একটি গাভীকে পদাঘাত করছে। রাজা তাঁকে শাসন করলেন।

শৌণক বললেন, কলিকে হত্যা না করে রাজা তাকে শাসন করে ছেড়ে দিলেন কেন? এর সঙ্গে যদি হরির কথার সম্পর্ক থাকে তাহলেই বলুন। তা না হলে অসৎ আলাপে আয়ু ক্ষয় করে লাভ কী? অলস ও নির্বোধরাই রাত নিদ্রায় ও দিন বৃথা কাজে নষ্ট করে।—

মন্দস্য মন্দ প্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থ কর্মভিঃ। ১।১৬।৯

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গল প্রদেশে বাস করছিলেন তখন কলি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেছেন শুনেই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে

ছিলেন। এই সময়ে একদিন তাঁর সামনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ধর্ম বৃষরূপ ধারণ করে এক পায়ে চলতে চলতে গাভী রূপিণী পৃথিবীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দুঃখে তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে? পৃথিবী বললেন, তুমি তো সবই জানো। কৃষ্ণ সকলকে পরিত্যাগ করেছেন ও তাদের উপর পাপ কলির দৃষ্টি পড়েছে বলেই আমি সবার জন্যে শোক করছি। ধর্ম ও পৃথিবী যখন এই কথোপকথন করছিলেন, তখনই পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে রাজবেশ ধারী একজন শূদ্র দণ্ড হাতে সেই গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে। রাজা বললেন, নটের মতো রাজা সেজে কে তুমি শূদ্রের মতো আমার আশ্রিতকে প্রহার করছ? আর তোমরাই বা কে? আমি থাকতে তোমাদের কোন ভয় নেই।

ধর্ম বললেন, কৃষ্ণ যাঁদের দূতের কাজ করেছেন তাঁদের বংশধরের এই অভয় দান উপযুক্ত। পণ্ডিতদের কথায় মুগ্ধ হয়ে পরমেশ্বরকে আমরা জানতে পারি না। যোগীরা বলেন, আত্মাই আত্মার সুখ দুঃখের হেতু, দৈবজ্ঞরা বলেন হেতু গ্রহাদি দেবতা। কিন্তু কর্মীরা বলে যে কর্মই সুখ দুঃখ দেয় এবং নাস্তিকরা নিজের স্বভাবকেই সমস্ত সুখদুঃখের হেতু বলে। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা বলেন যে মন ও বাক্যের অগোচর পরমেশ্বরই সুখ দুঃখ দেন। মহারাজ, নিজের বুদ্ধি দিয়ে আপনি এর বিচার করে নিন।

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ একাগ্র চিত্তে ভেবে ধর্মকে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি ধর্ম, তপস্যা পবিত্রতা দয়া ও সত্য এই চার পায়ের তিনটি গর্ব বিষয়াসক্তি ও মদ্যপান জনিত মত্ততায় নষ্ট হয়েছে এবং কলি মিথ্যা দিয়ে আপনার শেষ পাদ সত্যকেও গ্রহণ করতে চায়। আর ইনি পৃথিবী। ব্রাহ্মণ-ভক্তিহীন শূদ্ররা রাজার ছলে এঁকে ভোগ করবে বলে ইনি কাঁদছেন। এই বলে পরীক্ষিৎ কলিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কলি ভয়ে রাজবেশ ত্যাগ করে রাজার পদানত হল। রাজা বললেন, তুমি অধর্মের বন্ধু, তুমি এই

রাজ্যে থাকতে পারবে না। কলি বলল, তাহলে আমি কোথায় থাকব বলুন।

কলির এই প্রার্থনা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, যেখানে জুয়া মদ্যপান পরস্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণী হিংসা হয় সেখানে তুমি থাকতে পার। কলির প্রার্থনায় তিনি তাঁকে সোনা রূপা প্রভৃতিও তার বাসস্থান রূপে দান করলেন। সেই জন্য মিথ্যা, গর্ব, আসক্তি, হিংসা ও শত্রুতা দান করলেন। কলি এই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। পরীক্ষিৎ ধর্মের তপস্যা পবিত্রতা ও দয়া এই তিন পাদ সংযুক্ত করে দিলেন এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন।

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ ভ্রমরের মতো সারগ্রাহী ছিলেন বলেই কলিকে বধ করেন নি। কারণ কলিতে পুণ্য কর্মের সংকল্প করলেই ফল লাভ হয়; কিন্তু পাপ কাজ করলে তার ফল পেতে হয়। বিবেকী লোককে কলি ভয় পায়, সে বীরত্ব প্রকাশ করে অবিবেকী লোকের উপর।

ঋষিরা বললেন, শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবতের যে উপাখ্যান বলে ছিলেন, এইবারে তা বলুন।

সূত বললেন, আমার যা জানা আছে আমি তা বলছি। পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে মৃগের পিছনে ছুটে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে এক আশ্রমে প্রবেশ করলেন। দেখলেন যে শমীক মুনি চোখ বুঁজে শান্তভাবে বসে আছেন। ঋষির কাছে তিনি জল চাইলেন। কিন্তু সমাধিস্থ ঋষির কাছে কিছু না পেয়ে নিজেকে অবজ্ঞাত ভেবে ক্রুদ্ধ হলেন এবং ধনুকের প্রান্ত দিয়ে একটি মৃত সর্প তুলে ঋষির কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। শৃঙ্গী নামে ঋষির এক পুত্র বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পিতার অপমানের কথা শুনে শাপ দিল, যে কুলাঙ্গার আমার পিতাকে অপমান করেছে, আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক তাকে দংশন করবে। তারপর সেই বালক আশ্রমে ফিরে পিতার গলায় সাপ দেখে কাঁদতে লাগল। অঙ্গিরার বংশধর শমীক পুত্রের

কান্নায় চোখ মেলে কাঁধে সাপ দেখে তা ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? বালক সমস্ত ঘটনা বলল। এই শাপের কথা শুনে পিতা পুত্রকে বললেন, অল্প অপরাধে গুরু দণ্ড দিয়ে তুমি পাপ করেছ। রাজার অপমানের কথা ঋষি ভাবলেন না, পুত্রের অপরাধের জন্যই তিনি অনুতপ্ত হলেন।

সূত বললেন, পরীক্ষিৎও নিজের অন্যায় কাজের জন্য ভাবলেন যে নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে অনার্যের মতো অপমান করে তিনি ভগবানকেই অবজ্ঞা করেছেন। এই সময়ে শমীকের প্রেরিত এক শিষ্যের মুখে তিনি শৃঙ্গীর শাপের কথা শুনলেন এবং ভাবলেন যে এই অভিশাপই তাঁর বৈরাগ্যের হেতু হবে। তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে প্রায়োপবেশন করা মনস্থ করলেন। প্রভাবশালী ঋষিরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের অনুমোদন লাভ করলেন। এই কথা স্থির হলে রাজা পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের উপরে রাজ্যের ভার অর্পণ করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উত্তর মুখ হয়ে কুশাসনে উপবেশন করলেন। তিনি এই ভাবে প্রায়োপবেশন করলেদেবতারা তাঁর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ঋষিরা বললেন যে রাজা দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁরা সকলেই সেখানে থাকবেন। রাজা বললেন, এখন আমার যা কর্তব্য তা আপনারা বলুন।

এই সময়ে ব্যাসের পুত্র শুকদেব বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। বালকেরা তাঁকে পাগল মনে করে তাঁকে ঘিরে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করছিল। তাঁর বয়স ষোল বছর। দেহ সুগঠিত ও সুন্দর। বর্ণ শ্যাম, কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন। ঋষিরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং রাজা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তার কী করা উচিত তাই বলুন।

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত

দ্বিতীয় স্কন্ধ

পরীক্ষিৎ শুকদেব সংবাদ।

শুক বললেন, যিনি মোক্ষলাভ করতে চান তাঁর আত্মা ও হরির কথা শোনা, স্মরণ ও কীর্তন করা উচিত। আত্মজ্ঞান যোগ ও স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেই নারায়ণকে স্মরণ করতে হয়। মুনিরা প্রায়ই বিধি নিষেধ অতিক্রম করে নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েও হরির গুণ কীর্তনে আনন্দ লাভ করেন। দ্বাপর যুগের শেষে পিতা বেদব্যাসের নিকটে আমি ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করেছি। এটি সমস্ত বেদের সমকক্ষ। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে আবিষ্ট হলেও ভগবানের লীলায় আকৃষ্ট হয়ে এই পুরাণ অধ্যয়ন করেছি। আমি আপনাকে এই ভাগবতের কথাই বলব। পুরাকালে খট্বাঙ্গ নামে এক রাজা দেবতাদের নিকটে নিজের আয়ুর স্বল্পতা জেনে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে হরির শরণ নিয়েছিলেন। আপনার আয়ু এখনও সাত দিন বাকি। এই সময়ে নির্ভয়ে বৈরাগ্যের অস্ত্র দিয়ে দেহের স্পৃহা ছেদ করা যায়।

রাজা বললেন, মনের দোষ যাতে নষ্ট হয়, তাই আমাকে বলুন।

শুক বললেন, বিষয় আসক্তি ও ইন্দ্রিয় জয় করে বুদ্ধি দিয়ে মনকে ভগবানের স্থুল রূপে ধারণ করতে হয়। ভগবানের বিরাট দেহে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে। যোগীরা ভগবানের এই দেহেই বুদ্ধি দিয়ে নিজের মনকে ধারণ করে থাকেন। এই ধারণার বলেই ব্রহ্মা প্রলয়ের অবসানে পূর্ব কল্পের স্মৃতির অনুসারে পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। সংসারের বিবিধ ভোগে সুখলাভ হয় না। তাই শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, অনাসক্ত হয়ে ততটুকুর জন্যই চেষ্টা করা উচিত। বিনা চেষ্টাতেও এই প্রয়োজন মেটে। ভূমিশয্যায় বাহুই উপাধান, অঞ্জলিতে অন্ন জল আহার,

দিগম্বর হয়ে বা বল্কল পরিধান করেই জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যায়। বৃক্ষে ফল আছে, নদীতে জল আছে, গিরি গুহাও রুদ্ধ হয়ে যায় নি। তাই নিজের চিত্তে যে ভগবান নিত্য বিরাজ করছেন, তাঁরই ধারণা করা উচিত। সংসার সুখ বর্জন করে তাঁর পায়ে মন অর্পণ করলেই অবিদ্যার উপশম হয়।

শুক বলতে লাগলেন, ব্রহ্মতেজকামী ব্রহ্মার উপাসনা করবেন, ইন্দ্রিয়ের শক্তির জন্য ইন্দ্রের ও পুত্র লাভের জন্য কশ্যপাদি প্রজাপতির উপাসনা করবেন। দেহের সৌন্দর্যের জন্য দুর্গার, তেজস্বী হবার জন্য অগ্নির, অর্থের জন্য অষ্টবসুর ও প্রভুত্ব লাভের জন্য রুদ্রের উপাসনা করতে হয়। অন্নাদি খাদ্যের জন্য আদিত্যকে, স্বর্গলাভের জন্য দেবগণকে ও রাজ্যলাভের জন্য সাধ্যগণের উপাসনার বিধান। দীর্ঘায়ুর জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, শরীর পোষণের জন্য পৃথিবীকে এবং স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য লোকমাতা স্বর্গ ও পৃথিবীর উপাসনা করতে হয়। মানুষ লাবণ্যের জন্য গন্ধর্বকে, স্ত্রীর জন্য অপ্সরা উর্বশীকে ও সবার উপরে আধিপত্যের জন্য ব্রহ্মার উপাসনা করবেন। যশের জন্য বিষ্ণুকে, অর্থের জন্য বরুণকে, শাস্ত্রে বিদ্যার জন্য শিবকে এবং দাম্পত্য সুখের জন্য দুর্গাকে উপাসনা করতে হবে। ধর্ম কামনায় বিষ্ণুকে, বংশবৃদ্ধির কামনায় পিতৃপুরুষকে, বাধা নিবৃত্তির কামনায় যক্ষগণকে এবং বলের কামনায় বায়ুর উপাসনা করতে হয়। রাজ্য লাভের জন্য মনুগণের, শত্রুবধের জন্য রাক্ষসগণের, ভোগের জন্য চন্দ্রের এবং বৈরাগ্যের জন্য ভগবানের উপাসনার বিধান। যিনি সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত ও শুধু মোক্ষ কামনা করেন, তিনি পরমপুরুষ ভগবানের উপাসনা করবেন। হরি কথায় বৈরাগ্য হয় এবং বৈরাগ্যই মোক্ষ লাভের উপায়।

ভাগবত কথারম্ভ

শৌণক বললেন, পরীক্ষিৎ শুকদেবকে আর কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ ভগবানের গুণাবলী শোনাবার জন্য অনুরোধ করলে শুকদেব ভগবানকে স্মরণ করে বললেন, দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা যা বলেছিলেন, আমি আপনাকে সেই সনাতন তত্ত্ব কথা বলব। ব্রহ্মা বলেছিলেন, নারায়ণের শক্তিতে শক্তিশালী হয়েই আমি জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু লোকে তাঁরই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমাকেই সৃষ্টিকর্তা বলে। নির্বোধেরাই 'আমি' ও 'আমার' বলে অহংকার করে। দেবতারা তাঁর অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, স্বর্গাদি তাঁর আনন্দাংশ থেকে উৎপন্ন, তাঁর থেকেই বেদের উৎপত্তি এবং যজ্ঞ তাঁরই মূর্তি। যোগ ও তপস্যা তাঁকে পাবার জন্য, তাঁর সাক্ষাতের জন্য জ্ঞান, এ সবেরই ফল হল তাঁকে পাওয়া। তাঁর সত্ত্বঃ রজঃ ও তমো গুণ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য। তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও চরণ থেকে শূদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর চরণ থেকে কটি পর্যন্ত অবয়বে পাতাল থেকে ভূলোক পর্যন্ত সপ্তলোক, নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষে মহর্লোক ও তপোলোকের কল্পনা করা হয়। গ্রীবায় জনলোক, মস্তকে সত্যলোক এবং ব্রহ্মলোক তারও উপরে। সেই বিরাট পুরুষের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি বিশ্বসৃষ্টি করি, হর সংহার করেন এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিশক্তিধারী ভগবানই বিষ্ণুরূপে বিশ্ব পালন করেন। বেদজ্ঞ তপনিরত জ্ঞানময় ও যোগনিপুণ হয়েও যে নারায়ণ থেকে আমার জন্ম তাঁকে জানতে পারলাম না। আকাশ যেমন নিজের সীমা পায় না, তেমনি তিনিও বোধহয় নিজের মায়া-বৈভবের সীমা পান না। এই জগৎ যে মায়ায় রচিত তা বুঝি, আর তাঁরই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারেই বুঝি।

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন, এইবারে আমি তোমাকে ভগবানের

লীলাবতারের কথা বলছি। নারায়ণ সমুদ্রে নিমগ্ন পৃথিবীকে তুলবার জন্য বরাহ মূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি প্রলয়-সমুদ্রে আগত প্রথম দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তের আঘাতে চূর্ণ করেন। তিনি রুচি নামের প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করে ইন্দ্র হয়ে ত্রিভুবনের দুঃখ নষ্ট করেন। তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুষম নামে দেবতাদের জন্ম হয়। তাঁর মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর হরি নাম দেন। তিনি কর্দম প্রজাপতির গর্ভে নয় ভগিনীর সঙ্গে কপিল নামে জন্ম গ্রহণ করে নিজের জননীকেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। পুত্রাভিলাষী অত্রি মুনির পুত্র দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করে যদু হৈহয় প্রভৃতি রাজাকে যোগের ঐশ্বর্য দান করেছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে আমার তপের প্রভাবে তিনি সনৎকুমার সনক সনন্দন ও সনাতন নামে অবতীর্ণ হয়ে ঋষিদের আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন। তিনি যখন দক্ষ কন্যা মূর্তির গর্ভে ধর্মের পুত্র নর ও নারায়ণ হয়ে জন্মেছিলেন তখন অপ্সরাগণ তাঁদের তপোভঙ্গ করতে পারে নি। পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে ধ্রুব লোক দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে বেণ রাজা নরকগামী হলে ঋষিদের প্রার্থনায় তিনি পৃথু নামে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবী থেকে নানা খাদ্য ও রত্ন দোহন করেছিলেন। নাভি রাজার পত্নী সুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে জন্ম গ্রহণ করে তিনি যোগচর্যায় পরমহংস তুল্য হয়েছিলেন। তারপর তিনি আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষ অবতার হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রলয়কালে তিনি মৎস্য অবতার হয়ে প্রলয় সাগরে নৌকায় ভ্রমণ করেছিলেন। অমৃতের জন্য দেবাসুর যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন তখন তিনি কচ্ছপ রূপে মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। দেবতাদের ভয় নিবারণের জন্য তিনি নরসিংহ মূর্তি ধারণ করে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুতে রেখে নখ দিয়ে বিদীর্ণ করেছিলেন। তিনি কুমীরের কবল থেকে হাতীকে রক্ষা করেছিলেন। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে কনিষ্ঠ বিষ্ণু বামন মূর্তিতে ত্রিপাদ

তুমি ভিক্ষার ছলে বলির সমস্ত রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে হংসাবতারে তিনি তোমাকে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়েছিলেন। চতুর্দশ মন্বন্তরে তিনি মনুবংশে জন্ম গ্রহণ করে দুর্বৃত্ত রাজাদের দণ্ড দান করেন। তিনি ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হয়ে রোগের উপশম অনন্ত আয়ুদান ও আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। ক্ষাত্রয়রা যখন উদ্ধত হয়ে ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি পরশুরাম নামে অবতীর্ণ হয়ে একুশবার ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করেন। তিনি রাম নামে অবতীর্ণ হয়ে রাবণ বধ করেন। দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তিনি বলরামের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে নানা কাজ করবেন। তিনিই পরাশরের পুত্র বেদব্যাস নামে জন্ম গ্রহণ করে বেদ বিভাগ করবেন। তারপর বুদ্ধ নামে লোভনীয় পাষণ্ড বেশ ধারণ করে বহু উপধর্ম প্রচার করবেন। কলি যুগের শেষে তিনি কল্কি নামে আবির্ভূত হয়ে কলির শাসনকারী হবেন। ভগবান আমাকে যা বলেছেন তারই নাম ভাগবত। হে নারদ, তুমি এই শাস্ত্র সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং ভগবানে যাতে লোকের ভক্তি হয় তার জন্য প্রচার কর।

রাজা বললেন, ব্রহ্মার নির্দেশে নারদ যা কীর্তন করেছিলেন, লীলাময় ভগবানের সেই লীলার কথা আমাকে বলুন।

সূত বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এই অনুরোধ করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ বলতে আরম্ভ করলেন। শুকদেব বললেন, স্বপ্নের বিষয় যেমন মায়া, তেমনি নিজের দেহ ও পুত্রাদিতে জীবের 'আমি' ও 'আমার' এই ধারণাও ভগবানের মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। অনাদি কালের মোহ থেকে মুক্ত হলেই জীব তার ভ্রম ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ও উদাসীন হতে পারে। ব্রহ্মার তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান ব্রহ্মাকে নিজের দিব্য মূর্তি দেখাবার জন্য জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বলে দিয়েছিলেন। একাগ্র চিত্তে ব্রহ্মা সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। ভগবান তাঁর তপস্যায়

তুষ্ট হয়ে নিজের লোক দেখালেন। সেখানেই তিনি জগৎপতি ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন। আনন্দে তাঁর রোমাঞ্চ হল। ভগবান বললেন, নানাবিধ কামনা বাসনার কপটতায় যারা আচ্ছন্ন, তাদের কাছে আমি দুর্লভ। তুমি নিষ্কাম ভাবে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ বলেই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

ব্রহ্মা বললেন, আপনি তো অন্তর্যামী, আপনি সবই জানেন। তথাপি আমি এই প্রার্থনা করছি যে আমি যেন আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই রূপই জানতে পারি। মাকড়শার মতো আপনি তো নিজের সূত্র দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। আপনি আমার মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করবার মতো বুদ্ধির সঞ্চার করুন। ভগবান বললেন, আমি তোমাকে গোপন তত্ত্বজ্ঞান ও তার সাধন প্রণালী বলছি, শোন। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল এই জগতের অতীত আর কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, আমিই এই জগৎ। বিশ্বে প্রলয় হয়ে গেলে যা থাকবে তাও আমি। অতএব অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান আমাকেই একমাত্র তত্ত্ব বলে জানবে। যেমন আকাশে দ্বিতীয় চন্দ্র না থাকলেও তার জ্ঞান হয় এবং গৃহে কোন বস্তু থাকলে অন্ধকারে তা দেখা যায় না, তাকেই আত্মার মায়া বলে জানবে। পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানতে হলে এই কথাই জানতে হবে।

শুক বললেন, ভগবান ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে প্রণাম করে ঠিক পূর্ব কল্পের মতো করে জগৎ সৃষ্টি করলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে প্রিয় ও অনুগত নারদ ভগবানের মায়ার স্বরূপ জানবার জন্য পিতার সেবা করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন। তারপর আপনি আমার কাছে যা জানতে চাইছেন, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভগবান শ্রীমদ্‌ভাগবত নামে দশ লক্ষণ যুক্ত যে মহাপুরাণ ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তা পুত্র নারদকে বললেন। নারদ সরস্বতী নদীর তীরে ধ্যান পরায়ণ

বেদব্যাসকে এই ভাগবত শুনিয়েছিলেন। এর থেকেই আমি আপনাকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব।

শুক বলতে লাগলেন, ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় নামে দশটি লক্ষণ। পরমেশ্বর থেকে প্রকৃতির গুণ বৈষম্যে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদির জন্মকে সর্গ এবং ব্রহ্মার বিশ্ব সৃষ্টিকে বিসর্গ বলে। সৃষ্টি পদার্থের শৃঙ্খলা রক্ষার নাম স্থান বা স্থিতি, পোষণের অর্থ ভক্তের জন্য ভগবানের অনুগ্রহ। মনুর ধর্ম মন্বন্তর ও উতি শব্দে কর্মের বাসনা বোঝায়। ঈশানুকথায় ভগবানের অবতার ও ভক্তদের উপাখ্যান। ভগবানের যোগনিদ্রার সময় জীবের অন্তর্ধানের নাম নিরোধ বা প্রলয়। মুক্তির অর্থ সর্বস্ব ত্যাগ করে বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা পরমেশ্বরকেই আশ্রয় বলা হয়। সেই স্বাধীন পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথক করে যখন বহির্গত হন, তখন জল সৃষ্টি করে তাতে সহস্র বৎসর শয়ন করে থাকেন। নার শব্দে জল বোঝায় বলে সেই পুরুষের নাম নারায়ণ। তিনি যখন বহু হবার ইচ্ছা করেন, তখন যোগ শয্যা থেকে উঠে নিজের জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম শরীরকে মায়া দ্বারা অধিদৈব অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন ভাবে বিভক্ত করেন। এই ভাবেই তাঁর সূক্ষ্ম রূপ থেকে স্থূল রূপ হয়েছে। এই দুই রূপই মায়ার সৃষ্টি। তিনি ব্রহ্মার মূর্তি ধারণ করে বাচক রূপে নাম রূপ ও বাচ্য রূপে ক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি স্থাবর জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ, জলচর ভূচর ও খেচর ভেদে ত্রিবিধ এবং জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ। সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ অনুসারে দেবতা মানুষ ও পশুপাখি প্রভৃতির উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী। তাদের কর্মফলও শুভ অশুভ ও মিশ্রিত এই তিন প্রকার। ভগবান বিষ্ণু রূপে অবতার মূর্তি নিয়ে জগৎ পালন করেন এবং ধর্ম রূপে নানাবিধ ভোগ করে জগৎ পোষণ করেন। প্রলয় কালে তিনিই রুদ্র রূপ ধারণ করে নিজের সৃষ্টিকেই

সংহার করেন। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কাজে তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই, অথচ তা বলা হয়ে থাকে। কর্তৃত্ব নিষেধ করবার জন্যই বলা হয়, কারণ মায়া দ্বারাই কর্তৃত্ব ঈশ্বরে কল্পনা করা হয়

শৌণক বললেন, সূত, তুমি বলেছিলে যে বিদুর আত্মীয়দের পরিত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে তাঁর পরমাত্ম বিষয়ে আলাপ হয়েছিল। এইবারে তুমি তাঁর আত্মীয় পরিত্যাগের কারণ ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে পুনরাগমনের কথা বল।

সূত বললেন, পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যা বলেছিলেন, তাই আমি আপনাদের বলছি। শুনুন।

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

তৃতীয় স্কন্ধ

বিদুর-উদ্ধব সংবাদ

শুক বললেন, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন তাঁর অসাধু পুত্রদের নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পিতৃহীন পুত্রদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন, তখনই বিদুর গৃহত্যাগ করা উচিত মনে করেন। তারপর সভার মধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দেখেও যখন তিনি পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করলেন না, তখনও তিনি গৃহত্যাগ করা উচিত মনে করেন। তারপর পাশা খেলায় অধর্মে পরাজিত যুধিষ্ঠির বনবাস থেকে ফিরে এসেও যখন তাঁর রাজ্যের ভাগ পেলেন না, তখনও বিদুর গৃহত্যাগ করা উচিত মনে করেছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শেও ধৃতরাষ্ট্র রাজী না হওয়াতেও বিদুর এই কথা ভেবেছিলেন। অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে সভায় ডেকেছিলেন। বিদুর মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, মহারাজ, আপনার অপরাধ দুর্বিষহ হলেও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তা সহ্য করছেন, কিন্তু ভীম তাঁর ভাইদের সঙ্গে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছেন। কৃষ্ণ এঁদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছেন। কাজেই আপনি এঁদের রাজ্যের ভাগ দিন। দুর্যোধন রাজী নয় বলে আপনি অসম্মত হবেন না। সে মূর্তিমান দোষের মতো আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। বিদুরের এই কথা শুনে দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে এক বাক্যে বললেন, এই কুটিল স্বভাব দাসীপুত্র বিদুরকে কে এখানে ডেকেছে! এ যার অন্নে পুষ্ট, তারই বিরোধী হয়ে শত্রুর কাজে নিযুক্ত। এর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পুরী থেকে একে দূর করে দাও। ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এই কঠিন তিরস্কার শুনে দ্বারদেশে ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় তিনি গৃহত্যাগ করলেন। তারপর তিনি তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। দেহের কোন

সংস্কার করতেন না, বল্কল পরিধান করতেন এবং ভূতলে শয়ন করতেন। এই ভাবে তিনি প্রভাস তীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন, শুনলেন যে পরস্পর স্পর্ধার জন্য কুরু পাণ্ডবেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কৃষ্ণের সাহায্যে যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করছেন। শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি সরস্বতী নদীর তীর ধরে অগ্রসর হয়ে সুরাষ্ট্র সৌবীর মৎস্য কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করে যমুনার তীরে উপনীত হলেন। সেখানে তাঁর বাসুদেবের অনুচর উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বিদুর তাঁকে আলিঙ্গন করে যাদব ও পাণ্ডবদের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

শুক বললেন, পরম বৈষ্ণব উদ্ধব উৎকণ্ঠায় উত্তর দিতে পারলেন না। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণের কল্পিত মূর্তিতে উপহার দিয়ে পূজা করতেন এবং মাতা প্রাতরাশের জন্য ডাকলেও যেতেন না। সেই উদ্ধব এখন কৃষ্ণ সেবা করে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই বিদুরের প্রশ্নে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ায় পুলকিত হয়ে উঠলেন, নিমীলিত নেত্র থেকে শোকাশ্রু পড়ল এবং কিছুক্ষণ নীরবে থাকবার পর বললেন, কৃষ্ণ অস্তমিত হয়েছেন। আমাদের গৃহ বিগত শ্রী হয়েছে। যাদবদের দুর্ভাগ্য যে কৃষ্ণের সঙ্গে বাস করেও তারা তাঁকে চিনতে পারে নি। তারা মায়ায় মোহিত হয়ে তাঁকে বন্ধু ভাবতেন এবং শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুভাবাপন্ন রাজারা তাঁর নিন্দা করত। কৃষ্ণ অজ হয়েও বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, অনন্তবীর্য হয়েও কংসের ভয়ে ব্রজে গুপ্ত-ভাবে বাস করেন এবং কাল যবন প্রভৃতির ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেন ভাবলে আমারও হৃদয় ব্যথিত হয়। তাঁর এই চরিত্রের কথা মনে পড়লে আমার দুঃখ হয়। তিনি পিতা মাতাকে উদ্ধার করে তাদের প্রণাম করে বলেছিলেন, মা, কংসের ভয়ে আমি তোমাদের সেবা করতে পারি নি। তাঁর এই চরিত্র দেখে কি তাঁকে ঈশ্বর বলতে পারি! আপনারাও স্বচক্ষে দেখেছেন যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল তাঁর প্রতি কী রকম বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিল। ত্রিলোকের

অধীশ্বর হয়েও কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, মহারাজ, শুনুন। দুষ্ট পুতনা তাঁকে বিষ মাখানো স্তন্য দান করেও ধাত্রীর গতি পেয়েছিল। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তিনি ব্রহ্মার অনুরোধে কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভয়ে তাঁর পিতা বসুদেব তাঁকে নন্দের ব্রজে রেখে আসেন। তিনি সেখানে কংসের অলক্ষিতে এগার বছর বলদেবের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তিনি গোপ বালকদের সঙ্গে গোচারণ করতেন ও তাদের সঙ্গেই খেলা করতেন। কংস সে সময়ে তাঁর প্রাণ নাশের জন্য যে সব মায়াবী অসুরদের পাঠিয়েছিল, তাদের তিনি খেলার ছলেই বিনাশ করেছিলেন। তিনি যমুনার জলে বিষাক্ত সর্প কালিয়কে দমন করেন। ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করবার জন্য তিনি যখন গোপূজার প্রবর্তন করেন, তখন ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হয়ে ঘোর বর্ষণ আরম্ভ করেন। এর জন্য তিনি গোবর্ধন পর্বতকে আঙুলের উপরে ধারণ করে ব্রজ ধাম রক্ষা করেন। শরতের সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় তিনি গান গেয়ে স্ত্রী মণ্ডলীর মধ্যমণি হয়ে বিহার করেছিলেন।

উদ্ধব বলতে লাগলেন, হে বিদুর, কৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে মধুপুরীতে এসে পিতামাতার সুখের জন্য কংসকে উঁচু রাজমঞ্চ থেকে নিক্ষেপ করে বধ করেন। সান্দীপণি মুনির নিকটে তিনি ষড়ঙ্গাদির সঙ্গে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং পঞ্চজন নামক দৈত্যের পেট থেকে গুরুর মৃত পুত্রকে বার করে জীবন্ত অবস্থায় গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজারা যখন তাঁর পাণিগ্রহণে এসেছিলেন, তখন কৃষ্ণ গন্ধর্ব মতে বিবাহের জন্য রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ম্বরে দুর্দান্ত বৃষসমূহ দমন করে নাগ্নজিতীর পাণি গ্রহণ করেন। রাজারা অস্ত্র ধারণ করলে তিনি তাঁদের বিনাশ করেন। অদিতির কুণ্ডল দেবার জন্য তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সেখান থেকে পারিজাতের গাছ আনেন। শচীর কথায় ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিফল হয়েছিলেন।

পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর যখন নিজের শরীর দিয়ে আকাশ গ্রাস করতে গিয়েছিল, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধে তাকে সুদর্শন চক্র দিয়ে বিনাশ করেন। তার মাতা পৃথিবীর অনুরোধে তিনি নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তকে রাজ্য দিয়ে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে অপহৃত রাজ-কন্যারা তাঁকে পতি রূপে স্বীকার করেন। কালযবন, জরাসন্ধ শাল্ব প্রভৃতি রাজার সৈন্যে মথুরা পুরী অবরুদ্ধ হলে তিনি মুচুকুন্দ ভীম প্রভৃতিকে নিমিত্ত করে একাই তাদের বধ করেন। সম্বর দ্বিবিদ বাণ মুর বল্কল দন্তবক্র প্রভৃতি অসুরদের কাউকে নিজে বধ করেন, কেউ বা বলদেব বা প্রদ্যুম্নের হাতে নিহত হয়। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের উভয় পক্ষে যে সব রাজা নিহত হয়েছেন, তিনিই তাঁদের বধ করিয়ে-ছেন। কিন্তু দুর্যোধন যখন কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনের কুমন্ত্রণায় পড়ে ভগ্নোরু হয়ে অনুচরদের সঙ্গে ভূতলশায়ী হন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। বরং ভেবেছিলেন যে যাদব সেনার ভার এখনও আছে। যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অভিমন্যুর পুত্রকে অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞও করিয়েছেন। তারপর তিনি দ্বারকায় ফিরে সাংখ্য মতে স্থিত হয়ে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদ বিচার করে অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করেছিলেন। বহু বৎসর ক্রীড়ার পরে গৃহধর্মে ও কাম ভোগে তাঁর ঔদাসীন্য জন্মেছিল। এই সময়ে একদিন যদু ও ভোজ বংশের কুমাররা মুনিদের কোপ উৎপাদন করল এবং দেব মায়ায় বিমোহিত হয়ে সকলে রথারোহণে প্রভাস তীর্থে গিয়ে সেখানে স্নান তর্পণ করে প্রচুর দান ধ্যান করল।

উদ্ধব বললেন, তারপর আহারের পর তারা পৈষ্টী মদিরা পান করে জ্ঞানভ্রষ্ট হয়ে কটূক্তি করে পরস্পরের মর্মে আঘাত করতে লাগল। সূর্যাস্তের সময়ে সংঘর্ষে তাদের বিনাশ হল। এক সময়ে তিনি আমাকে বদরিকাশ্রমে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি

তাঁর অনুগামী হয়ে দেখতে পেলাম যে তিনি সরস্বতীর তীরে একাকী একটি অশ্বত্থ গাছে পিঠ দিয়ে বসে আছেন। এই সময়ে পরাশরের শিষ্য মৈত্রেয় মুনি ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সামনেই কৃষ্ণ আমাকে বললেন, উদ্ধব, পূর্ব জন্মে তুমি বসু ছিলে, এই জন্ম তোমার সার্থক হয়েছে। এ কথায় রোমাঞ্চিত হয়ে আমি বললাম, আপনার কাছে আমি কিছু চাই না, তবে যে পরম জ্ঞান আপনি ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন, তা শুনতে পেলে সংসারের দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাব। তিনি আমাকে সেই কথা উপদেশ দিলে আমি তাঁকে প্রণাম করে বদরিকাশ্রমের পথে এখানে চলে এসেছি।

শুক বললেন, উদ্ধবের মুখে বন্ধুদের বিনাশের কথা শুনে বিদুর তাঁকে বললেন, কৃষ্ণ তোমাকে যে পরম জ্ঞান দিয়েছেন তা আমাকে বল। উদ্ধব বললেন, আপনাকে উপদেশ দেবার জন্য তিনি মৈত্রেয় মুনিকে আমার সামনেই আদেশ দিয়েছেন। তাই আমার কাছে আপনার উপদেশ নেওয়া উচিত হবে না। তার পর যমুনার তীরে রাত্রি যাপন করে তিনি প্রস্থান করলেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, ব্রহ্ম শাপে যদু বংশ ধ্বংস হলেও উদ্ধব কেমন করে অবশিষ্ট রইলেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে শুক বললেন, ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্য, মূলে ভগবানের ইচ্ছা। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর কথা বলবার জন্য উদ্ধব বেঁচে থাকুন। এই কথা বলে উদ্ধব চলে গেলেন। কৃষ্ণ তাঁর কথাও ভেবেছিলেন শুনে বিদুর কাঁদলেন। তারপর দিন কয়েক ভ্রমণ করে ভাগীরথীর তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকটে উপস্থিত হলেন।

বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

শুক বললেন, বিদুর গঙ্গাদ্বারে এসে অগাধ জ্ঞানী মৈত্রেয় মুনির সারল্যে তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সংসারে সুখের জন্য মানুষ যা করেন তাতে সুখ হয় না, দুঃখেরও উপশম হয় না। অতএব

আমাদের কী কর্তব্য তাই আপনি বলুন। যারা ভগবানে বিমুখ, তারাই তো দুঃখভোগ করে। আপনি তাই ভগবানের সার কথা আমাদের বলুন। মৈত্রেয় এই কথা শুনে বললেন, পূর্ব জন্মে আপনি যম ছিলেন। মাণ্ডব্য মুনির শাপেই আপনি মানুষ হয়ে জন্মেছেন। বেদব্যাস আপনার জনক। কাজেই কৃষ্ণকে আপনি যে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনিও আপনাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেবার জন্য আমাকে আদেশ করে গেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ভগবানের লীলা, এই লীলার কথা আমি আপনাকে বলব। বলে তিনি সেই কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। বললেন, ভগবানের গুণের কথা শুনলেও অশেষ ক্লেশের উপশম হয়। সামান্য বিষয়-সুখের জন্য যারা মহা দুঃখে পতিত হয়েছে, তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য আমি ভাগবত পুরাণ বলছি। ভগবান স্বয়ং এই পুরাণ ঋষিদের বলেছিলেন। কোন সময় সনৎকুমার প্রভৃতি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিরা পাতালে আদিপুরুষ সঙ্কর্ষণকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা ভাগবত শোনবার জন্য সত্য লোক থেকে গঙ্গার পথে পাতালে এসেছিলেন। সেখানে নাগকন্যারা তাঁকে পতিরূপে পাবার জন্য পূজা করত। ভগবান সঙ্কর্ষণ সনৎকুমারের নিকটে এই ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করেন। পরমহংসের ধর্মে সাংখ্যায়ন মুনিই প্রধান ছিলেন। সনৎকুমার তাঁকে এই কথা বলেন। সাংখ্যায়ন বলেন পরাশরকে। দেবগুরু বৃহস্পতিও এই পুরাণ তাঁর নিকটে শুনেছিলেন। পরাশর পুলস্ত্য মুনির কথায় আমাকে বলেন। আমি আজ আপনাকে বলছি।

বিশ্ব যখন প্রলয় জলধি জলে নিমগ্ন ছিল তখন ভগবান নারায়ণ একাকী অনন্ত নাগকে শয্যা করে তার উপরে শয়ন করে ছিলেন। প্রলয়ের অবসানে পুনরায় সৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে যাবতীয় ক্রিয়া স্মরণ পথে আনবার জন্য তিনি কাল শক্তিকেই নিযুক্ত করেন। তাতে তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্মকোষ উৎপন্ন হল। তার

মধ্য থেকেই আবির্ভাব হল ব্রহ্মার। তিনি যখন চারি দিক দেখবার জন্য মুখ ফেরালেন তখন তাঁর চারটি মুখ হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমি কে এবং কোথা থেকে এই পদ্ম জন্মাল। এর নিচে নিশ্চয়ই কিছু আছে, এই ভেবে অন্বেষণ করেও পদ্ম নালের আধার দেখতে পেলেন না। এর পর তিনি অন্তর্মুখী হয়ে শত বৎসর অতিবাহিত করলে তাঁর জ্ঞান উৎপন্ন হল। আগে অন্বেষণ করেও যাঁর দর্শন পান নি, এইবারে বুঝতে পারলেন যে তিনি তাঁর হৃদয়েই বিরাজমান। অনন্ত শয্যায় শায়িত সেই বিরাট পুরুষকে তিনি দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর স্তব করে বললেন, বহুকাল অর্চনা করে আজ তোমাকে জানতে পারলাম। তোমার যোগ নিদ্রার শেষ হয়েছে, এই বারে উঠে আমার বিষাদ দূর কর। ভগবান গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি দুঃখ কোরো না, পুনরায় তপস্যা করলে সবই স্পষ্ট দেখতে পাবে। আমি সর্বত্র আছি এবং সবই আমার মধ্যে আছে। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে আমি সর্বত্র বিদ্যমান, তখনই তার মোহ দূর হয়।

বিদুর বললেন, নারায়ণ অন্তর্হিত হলে ব্রহ্মা কী সৃষ্টি করলেন? উত্তরে মৈত্রেয় বললেন, প্রথমে ব্রহ্মা এক শত দিব্য বৎসর তপস্যা করলেন। তারপর পদ্মকে বিভক্ত করে ত্রিলোক সৃষ্টি করলেন। বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার। প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি দশম। প্রলয় নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক এই ত্রিবিধ। মহত্তের সৃষ্টি প্রথম, এতে ভগবানের গুণসমূহের বৈষম্য হয়। অহঙ্কার সৃষ্টি দ্বিতীয়, এতে দ্রব্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। পঞ্চভূতের উদ্ভব তৃতীয়। চতুর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। দেবগণ ও মনের সৃষ্টি পঞ্চম। ষষ্ঠ অবিদ্যার সৃষ্টি। স্থাবর সৃষ্টি সপ্তম এবং একে মুখ্য সৃষ্টি বলে। বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক সার বা বাঁশ, বীরুধ ও বৃক্ষ—স্থাবর এই ষড়বিধ। এরা আহারের জন্য ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল এবং এদের সকলেরই অব্যক্ত চৈতন্য আছে। এদের কেবল অন্তরে স্পর্শ-জ্ঞান আছে এবং জাতি ভেদে

এদের বিভিন্ন ভেদ হয়ে থাকে। তির্যগ্ যোনির সৃষ্টি অষ্টম। এরা ভবিষৎ জ্ঞান শূন্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়ে অভিলষিত বস্তু জানতে পারে এবং কেবল আহারাদি কাজেই তৎপর। তির্যগ্ যোনি আটাশ প্রকার। মানুষ নবম সৃষ্টি, এরা সুখ দুঃখ অনুভব করে। এই নয় প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলে। বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট প্রকার। এরা দেব, পিতৃগণ, অসুর, গন্ধর্ব ও অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষস, সিদ্ধ চারণ ও বিদ্যাধর, ভূত প্রেত ও পিশাচ এবং কিন্নর কিম্পুরুষ প্রভৃতি।

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন, যে অংশের আর অংশ হতে পারে না এবং অন্যের সঙ্গে অসংযুক্ত থাকে, তার নাম পরমাণু। এই পরমাণুর সমষ্টি থেকেই মানুষের অবয়বের জ্ঞান হয়। পরমাণুর অবস্থান্তর না হয়ে একা থাকলে তাকে পরম মহৎ বলে। পরমাণু ও পরম মহান্ অবস্থা দ্বারা ব্যাপ্ত এই কাল সূক্ষ্ম স্থূল ও মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কাল ভগবানের শক্তি। অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত পদার্থে ব্যাপ্ত আছে এবং উৎপত্তির কাজে দক্ষ। যে সময়ে সূর্য এক পরমাণু পরিমিত স্থান অতিক্রম করে, তাকে পরমাণু কাল বলে এবং সম্বৎসর কালকেই স্থূল কাল বলে। দুই পরমাণুতে এক অণু, তিন অণুতে এক ত্র্যসরেণু, তিন ত্র্যসরেণুর নাম ত্রুটি, শত ত্রুটি পরিমিত কাল বেধ, তিন বেধে এক লব এবং তিন লবে এক নিমেষ। তিন নিমেষে এক ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পনের কাষ্ঠায় এক লঘু, পনের লঘুতে এক নাড়ী বা দণ্ড, দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত এবং ছয় বা সাত দণ্ডে এক প্রহর বা যাম হয়। এই প্রহর মানুষের দিন বা রাত্রির এক-চতুর্থাংশ। চারি যামে মানুষের এক দিবারাত্র হয়, পনের অহোরাত্রে এক পক্ষ হয়। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে এক মাস পিতৃলোকের এক অহোরাত্র। দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় মাসে এক অয়ন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে দেবতাদের এক অহোরাত্র। মানুষের পরমায়ু শত বৎসর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ তাঁর পরিমাণ বারো হাজার বৎসর। এদের পরিমাণ যথাক্রমে চার তিন দুই ও এক হাজার বৎসর এবং দ্বিগুণ দুই শত

বৎসর। এর থেকেই বুঝতে হবে যে সত্য যুগের পরিমাণ চার হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চার শত বৎসর করে আট শত বৎসর। ত্রেতা যুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর এবং তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর করে ছয় শত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর করে চার শত বৎসর। এই হিসেবে কলি যুগের পরিমাণ এক হাজার বৎসর এবং তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর করে দুই শত বৎসর। যুগের আগে সন্ধ্যা ও পরে সন্ধ্যাংশ এবং তার পরিমাণ যুগের সমান শত বৎসর। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তী কালকে যুগ বলে। ত্রিলোকের বাহিরে চতুর্যুগ সহস্র বৎসরে এক এক দিন। রাত্রির পরিমাণও দিনের সমান। রাত্রিতে ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন এবং রাত্রি শেষে সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়। চতুর্দশ মনুর কালে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মারও পরমায়ু শত বর্ষ। তার অর্ধেক পরার্ধ। পূর্ব পরার্ধ গত হয়েছে। এখন অপর পরার্ধ চলছে। পূর্ব পরার্ধের প্রথমে ব্রাহ্ম কল্পে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়েছিলেন। তারপর পাদ্ম কল্প। দ্বিতীয় পরার্ধের আদিতে বারাহ কল্প। এই কল্পে হরি শূকর মূর্তি ধারণ করেছিলেন।

সৃষ্টির কথা—বরাহ অবতার—জয়-বিজয়—হিরণ্যাক্ষ বধ

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মা যে ভাবে সৃষ্টি করেন তা আবার শোন। প্রথমে তিনি যা সৃষ্টি করেন তা তমোময়ী দেখে সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন মুনিকে সৃষ্টি করে প্রজা সৃজন করতে বললেন। কিন্তু মোক্ষই পরম ধর্ম মনে করে তাঁরা নিষ্ক্রিয় ও উর্ধ্বরেতা হলেন। তাই দেখে তাঁর ক্রোধ থেকে নীললোহিত বর্ণ কুমার উৎপন্ন হল। জন্মেই তিনি রোদন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল রুদ্র। ব্রহ্মা তাঁর একাদশ নাম ও স্ত্রীর একাদশ নাম দিয়ে প্রজা সৃষ্টি করতে বললেন। সেই রুদ্র জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা তাঁকে তপস্যা করতে বললেন। তারপর তাঁর চিন্তা থেকে

মরীচী অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ভৃগু বশিষ্ঠ দক্ষ ও নারদ এই দশ পুত্র উৎপন্ন হল। তাঁর দেহের নানা অঙ্গ থেকে ধর্ম অধর্ম কাম ক্রোধ লোভ বাগ্দেবী সিন্ধু নির্ঋতি উৎপন্ন হল। কর্দম মুনি তাঁর ছায়া থেকে জন্ম নিলেন। বাক্ নামে একটি কন্যারও জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে কামনা করেছিলেন বলে মরীচী প্রভৃতি মুনিরা তাঁর নিন্দা করেছিলেন। লজ্জায় ব্রহ্মা সেই দেহ ত্যাগ করলে দিক্‌রা তা গ্রহণ করল। তারপর তাঁর চিন্তায় চার মুখ থেকে চার বেদ আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ প্রভৃতি উপবেদ ও পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদিও উৎপন্ন হল। তারপর তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি মিথুন বা স্ত্রী-পুরুষ হল। এঁরা মনু ও তাঁর মহিষী শতরূপা। তাঁদের মিথুন ধর্মে প্রজা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁদের প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুটি পুত্র ও আকুতি দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মাল। মনু রুচির সঙ্গে আকুতির, কর্দমের সঙ্গে দেবহূতির ও দক্ষের সঙ্গে প্রসূতির বিবাহ দেন। এদের বাসের জন্য মনু ব্রহ্মাকে জলমগ্ন পৃথিবী উদ্ধার করতে বলেন। এই সময়ে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে একটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ বহির্গত হল। দেখতে দেখতে তা বর্ধিত হয়ে গর্জন করে জলে প্রবেশ করল। দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তাঁর পথ রোধ করায় তিনি সুদর্শন চক্র দিয়ে তাকে বধ করেন। তারপর দন্তাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করে জলের উপরে রেখে অদৃশ্য হলেন।

হিরণ্যাক্ষের কথা এমন সংক্ষেপে বলায় বিদুর সন্তুষ্ট হলেন না দেখে মৈত্রেয় বললেন, একদিন সন্ধ্যাবেলায় দক্ষের কন্যা দিতি তাঁর পতি মরীচির পুত্র কশ্যপের নিকটে এসে অপত্য কামনা করেছিলেন। এই নিষিদ্ধ সময়ে গর্ভ ধারণের জন্য যে দিতির দুই অধার্মিক পুত্র হবে, পতির মুখে এই কথা শুনে তিনি দুঃখিত হলেন। তাতে কশ্যপ বলেন যে ভগবানের হাতে এই পুত্রদের মৃত্যু হবে এবং একটি পৌত্র পরম ভাগবত হবে। এঁদের পূর্ব জন্মের কথা দেবতারা ব্রহ্মার কাছে শুনে-

ছিলেন। একদা সনকাদি ঋষিরা হরিকে দর্শন করবার জন্য বৈকুণ্ঠ-ধামে যান। সেখানে ছটি দ্বার পার হয়ে যখন সপ্তম দ্বারে পৌছলেন, তখন দুজন দ্বারপাল তাঁদের পাঁচ বছর বয়সের বালকের মতো উলঙ্গ দেখে উপহাস করে বেত দিয়ে নিবারণ করে। ঋষিরা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, বৈকুণ্ঠে বাস করেও কি তোমরা ভাবছ যে কোন কপট এখানে এসেছে! এতেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমরাই কপট, ভেদ জ্ঞানই তোমাদের ভয়ের কারণ অথচ ভগবানে তো কারও ভেদ বুদ্ধি নেই! তোমাদের এই ভেদ বুদ্ধি আছে বলে তোমরা এই পবিত্র ধাম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে পাপযোনিতে কাম ক্রোধ ও লোভ আছে তাতে জন্মগ্রহণ কর। এ কথা শুনেই দ্বারপালরা বুঝতে পারল যে এ অতি ঘোর ব্রহ্মশাপ। তাই তারা সভয়ে মুনিদের পায়ে পড়ল। দুজন ভৃত্য অপরাধ করেছে বুঝতে পেরে ভগবান লক্ষ্মীকে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঋষিরা তাঁদের দেখে স্তব করতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠপতি বললেন, এই শাপগ্রস্ত জয় ও বিজয় আমার পারিষদ। কিন্তু তোমাদের প্রতি এরা অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করেছে। এতে তোমরা এদের যে দণ্ড দিয়েছ, তা আমি মেনে নিলাম। আমার অভিপ্রায় না জেনেই এরা তোমাদের কাছে অপরাধ করেছে। এদের অন্যত্র বাস অচিরে সমাপ্ত করলে এদের উপরে যথেষ্ট দয়া করেছ বলে আমি মনে করব। ঋষিরা এ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললেন, প্রভু, অন্যে তোমাকে অনুগ্রহ করবে, এ কেমন কথা হল আমরা বুঝতে পারছি না। ভগবান বললেন, এখনই এদের অসুর যোনিতে জন্ম হোক। আমার প্রতি ক্রোধের আবেশে এদের চিত্তের একাগ্রতা দৃঢ় হবে। তাতে এরা উভয়েই খুব শীঘ্র আমার কাছে আসতে পারবে। তোমরা যে এদের শাপ দিয়েছ, এতে তোমাদের কোন দোষ নেই। এ শাপ পূর্ব বিহিত। এ কথা শুনে ঋষিরা প্রস্থান করলেন। তাঁরা চলে যাবার পর ভগবান সেই দুই পারিষদকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় পেও না, তোমাদের

এতে মঙ্গল হবে। পূর্বে আমি যখন যোগ নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম, তখন লক্ষ্মী আমার আলয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় প্রবেশ করতে এলে তোমরা তাঁকে বাধা দিয়েছিলে। সেই সময়েই লক্ষ্মী তোমাদের পতন নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাই এখন তোমরা যাও। অল্পকাল পরেই তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে। এই আদেশ দিয়ে তিনি লক্ষ্মীকে নিয়ে নিজের গৃহে ফিরলেন এবং জয় ও বিজয় বিগত শ্রী হয়ে দিতির গর্ভে জন্ম নিয়েছে। আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। যিনি আদি পুরুষ, তিনিই সবার মঙ্গল বিধান করবেন।

শত বর্ষ পূর্ণ হলে দিতি দুটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন। এই সময়ে নানা অমঙ্গলসূচক উৎপাত দেখে সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হল। কশ্যপ পুত্রদের নামকরণ করলেন। যে আগে জন্মাল তার নাম হল হিরণ্যাক্ষ এবং যে পরে জন্মাল তার নাম হিরণ্যকশিপু হল। হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠ। সে নিজের বাহুবলে উদ্ধত ও ব্রহ্মার বরে অমর হয়ে ত্রিলোক নিজের বশে আনল। অনুজ হিরণ্যাক্ষ তার খুব প্রিয়পাত্র ছিল। হিরণ্যাক্ষ একদিন যুদ্ধ করবার জন্য গদা হাতে নিয়ে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হল। তার দুই পায়ে সোনার নূপুর, গলায় বৈজয়ন্তী মালা। দেবতারা তাকে দেখে ভয়ে লুকোলেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে সে গর্জন করে জল ক্রীড়ার জন্য জলে প্রবেশ করল। সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে সে বরুণের বিভাবরী পুরীতে পৌঁছে গেল। তারপর বরুণকে দেখতে পেয়ে উপহাস করবার জন্য তাকে প্রণাম করে বলল, আপনি দানবদের জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন, এখন আমার সঙ্গে একবার যুদ্ধ করুন দেখি। হিরণ্যাক্ষের এই ব্যঙ্গ শুনে বরুণ ক্রুদ্ধ হলেন; কিন্তু বলে সমর্থ হবেন না বলে ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, সম্প্রতি আমরা যুদ্ধাদি কৌতুকে ক্ষান্ত হয়েছি। আপনার মতো রণকৌশলে পণ্ডিতের একমাত্র বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্তোষ হতে পারে। বরুণের কথায় দৈত্য খুশীই হল এবং নারদের মুখে হরির গতি জেনে রসাতলে প্রবিষ্ট হল। সেখানে একটি বরাহ

দেখে বলল, কী আশ্চর্য! এ যে জলচর বরাহ! তারপর নানা কটূক্তি বর্ষণ করল। হরি পৃথিবীকে নিয়ে জল থেকে নিঃসৃত হয়ে তাঁকে জলের উপরে স্থাপন করলেন। তারপর হিরণ্যাক্ষের উপহাসের উত্তর দিলেন। দুজনের গদা যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধ দেখবার জন্য ব্রহ্মা ঋষি-পরিবৃত হয়ে এসে বললেন, এর সঙ্গে আপনি খেলা করবেন না, আসুরী বেলায় এই দুর্ধর্ষ দৈত্য বিষম বর্ধিত হবে। দৈত্যকে বধ করুন। এই কথা শুনে হরি লাফিয়ে তার উপরে পড়লেন এবং কপোলের নিচে গদার আঘাত করলেন। কিন্তু দৈত্যের গদার আঘাতে তাঁর গদা হস্তচ্যুত হল। তাই দেখে দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন। হিরণ্যাক্ষ এই সময়ে প্রহারের উপযুক্ত সময় পেয়েও যুদ্ধের ধর্ম রক্ষার জন্য গদাঘাত করল না। হরি সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন। দৈত্যের নিক্ষিপ্ত গদা ভগবান ধরে ফেললেন। তারপর সে ত্রিশূল নিক্ষেপ করলে তা সুদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন। হিরণ্যাক্ষ এগিয়ে এসে ভগবানের বুকে মুষ্টির আঘাত করেই অন্তর্হিত হল এবং নানা প্রকার মায়া বিস্তার করল। তাই দেখে সবাই ভাবল যে প্রলয় কাল উপস্থিত হয়েছে। আদি বরাহ রূপী ভগবান তাঁর সামনের পা দিয়ে হিরণ্যাক্ষর কর্ণমূলে আঘাত করলেন। এক পদাঘাতেই সে ভূতলে পড়ে নিহত হল। দেবতারা বললেন, এর কী সৌভাগ্য! ভগবানের চরণের আঘাতে এর মৃত্যু হল! এই ভাবে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে আদি বরাহ বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন।

কর্দম ও দেবহূতি

নৈমিষারণ্যবাসী মুনিদের আগ্রহ দেখে সূত বললেন, মৈত্রেয় বিদুরকে ব্রহ্মার প্রজা সৃষ্টির কথা বলতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁর তমোময় দেহ পরিত্যাগ করলে তা রাত্রি হয়। ঐ তামস সৃষ্টি থেকে যে সব যক্ষ ও রাক্ষস জন্মেছিল, তারা তা গ্রহণ করল। তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে ধাবিত হল। কেউ বলল,

পিতা বলে ওকে রক্ষা কোরো না। কেউ বলল, ওকে ভক্ষণ কর। যারা ভক্ষণ কর বলল তারা যক্ষ হল, আর যারা রক্ষা কোরো না বলল তারা হল রাক্ষস। ব্রহ্মা তাঁর সত্ত্বময় তনুতে যাঁদের সৃষ্টি করলেন, তাঁরা দেবতা হলেন। তাঁরা সেই তনু গ্রহণ করলেন।

তিনি তাঁর জঘন থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দেহ সন্ধ্যাকে তারা স্ত্রী বলে গ্রহণ করল। তাঁর আত্মাণের সৌন্দর্যে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সৃষ্টি হল। সেই দেহ পরিত্যাগ করলে তা জ্যোৎস্না হল, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা তা গ্রহণ করল। নিজের আলস্য দিয়ে তিনি ভূত ও পিশাচ সৃষ্টি করলেন। তিনি তাঁর অদৃশ্য রূপ দিয়ে সাধ্য ও পিতৃগণের সৃষ্টি করলেন। তিনি তাঁর অন্তর্ধান হবার শক্তি দিয়ে সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কিন্নর ও কিম্পুরুষদের সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার কেশ থেকে নাগ বা সর্পের জন্ম।

বিদুর বললেন, আপনি মনুর বংশের কথা বলুন। তাঁর দেবহূতি নামে যে কন্যা ছিলেন, তিনি তো কর্দমের পত্নী হন। মৈত্রেয় বললেন, হ্যাঁ, ব্রহ্মা কর্দমকে প্রজা সৃষ্টি করতে বলেছিলেন। তিনি সরস্বতীর তীরে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করলেন। তাতে প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণু তাঁকে দেখা দিলে কর্দম তাঁর স্তব করলেন। বিষ্ণু বললেন, তুমি কী জন্য এই তপস্যা করছ তা আমি জানি। ব্রহ্মাবর্তের সম্রাট মনু তাঁর মহিষী শতরূপা ও কন্যা দেবহূতিকে নিয়ে পরশু এখানে আসবেন। সেই কন্যা তাঁর অনুরূপ পতি অন্বেষণ করছেন এবং তিনি তোমাকে ভজনা করবেন। রাজা তোমাকে কন্যা দান করবেন। তোমার নটি কন্যা জন্মাবে এবং আমি আমার অংশে তোমার পুত্র হয়ে জন্মে তত্ত্ব-সংহিতা প্রণয়ন করব। এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন এবং যথাসময়ে রাজা মনু রথারোহণে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কর্দম তাঁকে আসন দিয়ে বললেন, কী জন্য আপনার এখানে আগমন তা বলুন। মনু বললেন, ইনি

আমার কন্যা। নারদের মুখে আপনার রূপ ও গুণের কথা শুনে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবেন বলে স্থির করেছেন। আমি শ্রদ্ধা সহকারে এঁকে সম্প্রদান করছি, আপনি গ্রহণ করুন। কর্দম বললেন, আমি এঁর প্রতি অনুরাগী। বিবাহ বিধিসম্মত মন্ত্র আপনার এই কন্যার প্রতি প্রযোজিত হোক। যতদিন এই কন্যার সন্তান না হয় ততদিন আমি গৃহধর্ম পালন করব। রাজা মনু তাঁর মহিষী ও কন্যার স্পষ্ট অভিপ্রায় অবগত হয়ে হৃষ্ট মনে কর্দমকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন। তারপর তাঁরা ব্রহ্মাবর্তে তাঁদের বহিষ্মতী পুরীতে ফিরে গেলেন। দেবহূতি কর্দমের পরিচর্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে গত হলে তিনি আরও শীর্ণ হলেন এবং তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে কর্দমের করুণা হল। তিনি বললেন, আমি তপস্যা করে যা পেয়েছি, আমার সেবা করে তোমার তা আয়ত্ত হল। দেবহূতি ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে সহাস্যে বললেন, আপনি আমার পাণিগ্রহণের সময় যে অঙ্গীকার করেছেন, তা রক্ষা করুন। যাতে আমার গর্ভাধান হতে পারে, এমন অঙ্গসঙ্গ একবার হোক এবং কামশাস্ত্র অনুসারে সাধনের উপায় কল্পনা করুন। কর্দমের যোগবলে তখনই একটি কামচারী বিমান এসে উপস্থিত হল। দেবহূতি পতির আদেশে সরস্বতীর আধার বিন্দু সরোবরে গিয়ে অবগাহন করলেন। সেখানে সহস্র তরুণী কন্যা তাঁকে তেল মাখিয়ে স্নান করাল। বসনে ভূষণে সজ্জিত পত্নীকে নিয়ে ঋষি বিমানে আরোহণ করলেন। সেখানে তিনি অনেক দিন ক্রীড়া করলেন। দেবহূতি কয়েকটি সুন্দরী কন্যা প্রসব করলেন। তারপর দেখলেন যে স্বামী প্রব্রজ্যাশ্রম গমনে উদ্যত। তিনি বললেন, আপনি বনে গেলে এই কন্যাদের নিজেদের পতি অন্বেষণ করতে হবে, আর আমাকেই বা কে জ্ঞান শিক্ষা দেবে! কর্দম বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না। অচিরে ভগবান তোমার পুত্র হয়ে জন্মাবেন এবং তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দেবেন। ভগবান যখন জন্ম নিলেন, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। মরীচি

প্রভৃতি ঋষিদের নিয়ে ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে এসে বললেন, এই ঋষিদের হাতে তোমার সুন্দরী কন্যাদের সম্প্রদান কর। আর তোমার এই পুত্র ঈশ্বর, তিনি কপিল রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই বলে তিনি নারদকে নিয়ে চলে গেলেন। কর্দম মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্বকে শান্তি নামের কন্যাকে সম্প্রদান করলেন। তাঁরা সেই কন্যাদের নিয়ে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। কর্দম তাঁর পুত্রকে নির্জনে বললেন, তুমি যখন আমার পুত্র রূপে জন্মেছ, তখন আমার দেব ঋণ ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ শোধ হয়েছে। এবারে আমি পরিব্রাজক পথাবলম্বী হতে চাই। ভগবান বললেন, আত্মজ্ঞানের সূক্ষ্ম মার্গ কাল বশে বিনষ্ট হয়েছে। আমি তা পুনরায় প্রবর্তন করব। আপনি যেখানে ইচ্ছা যান, মাকে আমি আত্ম বিদ্যা বিতরণ করব। এই কথা শুনে কর্দম অরণ্য যাত্রা করলেন এবং সমদর্শী হয়ে ভক্তি যোগে ভগবৎ গতি লাভ করলেন।

কপিল ও সাংখ্য যোগ

শৌণক বললেন, সূত, কপিলের কথা আমি অনেকবার শুনেছি, তুমি আর একবার বল।

সূত বললেন, বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় যা বলেছিলেন আমি তাই বলছি। পিতা অরণ্য যাত্রা করলে কপিল তাঁর মাতার প্রিয় সাধনের জন্য বিন্দু সরোবরের তীরস্থ আশ্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবহূতি পুত্রের নিকটে এসে বললেন, আমি বিষয় অভিলাষে শ্রান্ত হয়েছি, তুমি আমার এই মোহ দূর কর। এই কথা শুনে কপিল আনন্দিত হয়ে বললেন, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলেই জীবের বন্ধন এবং পুরুষোত্তমে সংযত হলে তার মোচন হয়।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ৩।২৫।১৫

আমি ও আমার প্রভৃতি অভিমান থেকে উৎপন্ন কাম লোভ মোহাদি যখন মন থেকে দূর হয়, তখন জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত চিন্তায় আত্মার স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিই যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির পথ, এ ছাড়া মঙ্গলজনক দ্বিতীয় পথ আর নেই। যাঁরা সর্বসঙ্গবর্জিত তাঁরাই সাধু, সাধুরা সঙ্গজনিত দোষ হরণ করেন বলে সাধুজনের সঙ্গ কামনা করতে হয়। দেবহূতি বললেন, যে ভক্তিতে অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়, সেই ভক্তির তত্ত্ব আমাকে বল। কপিল বললেন, ভগবানের প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিই নিষ্কাম ভগবৎ ভক্তি। বেদ বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি জন্মালেই মানুষের ইন্দ্রিয়ে ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। এই ভাবে ভগবানে ভক্তি মানুষের পক্ষে মুক্তির চেয়েও বড়। পণ্ডিতরা তত্ত্বজ্ঞান থেকে উদ্ভূত আত্মদর্শনকে মুক্তির কারণ বলেন। মা, জীবের অন্তর্জ্যোতি যে আত্মা তিনিই পুরুষ। তিনি অনাদি ও স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েই বিশ্ব প্রকাশ পায়। বিষ্ণুর শক্তিরূপ অব্যক্ত গুণময় প্রকৃতি লীলার জন্য সেই পুরুষের নিকট উপগত হলে তিনি তাঁকে ইচ্ছামতো গ্রহণ করেন। তারপর সেই প্রকৃতি নিজের গুণে বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করতে থাকলে পুরুষ অবিদ্যায় মুগ্ধ হন এবং নিজেকেই তার কর্তা বলে অভিমান করেন। কিন্তু পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কোন কর্মেরই কর্তা নন। পুরুষের এই কর্তৃত্বের অভিমান হলেই জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়। পণ্ডিতরা বলেন যে কার্য কারণ ও কর্তৃত্ব এ সবের কারণ প্রকৃতি, সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে পুরুষকে কারণ বলা যায়।

দেবহূতি বললেন, প্রকৃতি ও পুরুষ তো এই বিশ্বের কারণ, তাদের লক্ষণ কী তা বল। কপিল বললেন, যিনি প্রধান, তাঁর নাম প্রকৃতি। সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কাজের তিনি আশ্রয়। তিনি ত্রিগুণ, অব্যক্ত ও

নিত্য। তাঁর কাজের চব্বিশটি গণ আছে—পাঁচ পাঁচ দশ ও চার—এই রকম সংখ্যা। ভূমি জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ মহাভূত, গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ এই পাঁচ তন্মাত্র, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ ও বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই চার অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণকেই বৃত্তি ভেদে চার ধরা হয়েছে। এই চব্বিশ তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এর উপর কালকে নিয়ে এই তত্ত্বের সংখ্যা পঁচিশ। যোগযুক্ত বুদ্ধি ভক্তি বৈরাগ্য ও জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় পরমেশ্বরের চিন্তা করতে হয়। বিষয় চিন্তাই অনর্থের মূল। যে জ্ঞানে প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব জানতে পারা যায়, যোগী পুরুষেরা সেই জ্ঞানেই সমাহিত হন।

দেবহূতি বললেন, পুরুষ ও প্রকৃতির তো পরস্পর আশ্রয় ও আশ্রিত ভাবে নিত্য সংযোগ, তাই প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করেন না। এ কথা যদি সত্য হয় তবে মুক্তি হবে কেমন করে? কপিল বললেন, ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য যোগ ও সমাধি দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের নিকট থেকে তিরোহিত হতে পারে। প্রকৃতিকে ভোগ করা হয়েছে, এই মনে করে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করলেই সেই স্বাধীন পুরুষের আর মোহ থাকে না। যোগের অনুষ্ঠানে মন প্রসন্ন হয়ে সৎ পথে যায়। নির্মল মন যোগে সমাহিত করে ভগবানের মূর্তি ধ্যান করতে হয়। তিনি সর্বভূতে বিদ্যমান এবং সকল প্রাণীরই আত্মা ও ঈশ্বর। মূঢ়তার বশে যে তাঁকে ত্যাগ করে প্রতিমার অর্চনা করে, তার কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়া হয়।—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ৩।২৯। ২২

ভক্তি যোগ ও যোগ এই দুয়ের যে কোন একটি দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। মা, পণ্ডিতরা বলেন যে এখানেই স্বর্গ ও নরক। নরকে যে যাতনা ভোগ করতে হয় তা এখানেও আছে।—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥ ৩।৩০।২৯

পুরুষের রেতঃ কণা স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করলে এক রাত্রে রক্তের সঙ্গে মিলে যায় এবং পাঁচ রাত্রে বুদবুদের আকার পায়। দশ দিনে তা কুলের মতো কঠিন হয়। তারপর মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এক মাসে মাথা, দু মাসে দেহের অঙ্গ অস্থি চর্ম নখ ও লোমের সঞ্চার হয়। তিন মাসে লিঙ্গ ও ছিদ্র উৎপন্ন হয়। চার মাসে সপ্ত ধাতু ও পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। ছয় মাসে জরায়ু আবৃত হয়ে মায়ের ডান কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। সেই সময় থেকেই মায়ের খাদ্যে তার বৃদ্ধি হতে থাকে। মায়ের গর্ভে জীবের যন্ত্রণার শেষ নেই। পূর্ব জন্মের পাপের কথাও স্মরণ হয়। দশ মাসে তার জন্মের পর এই স্মৃতি শক্তি লোপ পায়। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাকে শৈশব দুঃখ ভোগ করতে হয়। তারপর অধ্যয়নাদি দুঃখ ভোগ, যৌবনে অর্থের জন্য দুঃখ। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এই স্থূল দেহের জন্য তার নানা দুঃখ। নারীর জন্য তার মোহ ও বন্ধন। যোগীরা বলেন, সৎ সঙ্গে যার আত্মরূপ লাভ হয় তার পক্ষে নারী নরকের দ্বার। মা, আমি তোমাকে ব্রহ্ম দর্শন জ্ঞানের কথা বললাম। এই জ্ঞানেই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জানা যায়। জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগ এই দুয়ের একই প্রয়োজন। যে কোন একটিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

কপিলের এই কথায় তাঁর মা দেবহূতির মোহ দূর হল। কপিল তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। দেবহূতি সেই আশ্রমে থেকে যোগযুক্তা হলেন এবং অচিরে পরম ব্রহ্ম ভগবানকে লাভ করলেন।

মায়ের আশ্রম থেকে বেরিয়ে কপিল প্রথমে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ ও বাসস্থান দিয়েছিলেন। এখনও তিনি যোগ অবলম্বন করে সমাহিত হয়ে আছেন।

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

চতুর্থ স্কন্ধ

মনুর কন্যা বংশ

মৈত্রেয় বললেন, স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা আকুতি দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। আকুতির ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও মনু শতরূপার সম্মতি নিয়ে আকুতিকে পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে রুচির হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। [এতে কন্যার পুত্র পিতার বলে গণ্য হবে] তাঁদের যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যজ্ঞকে মনু নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। বিষ্ণুই যজ্ঞ মূর্তি ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের বারোটি পুত্র হয়েছিল। তাদের নাম তোষ প্রতোষ সন্তোষ ভদ্র শান্তি ইড়স্পতি ইধ্ম কবি বিভু স্বাহ্ন সুদেব ও রোচন। এঁরা তুষিত নামে দেবতা হয়েছিলেন।

মনু কর্দমের সঙ্গে দেবহূতির বিবাহ দিয়েছিলেন। কর্দম ঋষিদের সঙ্গে তাঁর নয়টি কন্যার বিবাহ দেন। মরীচির পত্নী কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে পুত্র কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র ও দেবকুল্যা নামে এক কন্যা জন্মে। দেবকুল্যাই জন্মান্তরে হরির পদ প্রক্ষালনে গঙ্গা হয়েছিলেন। অত্রির পত্নী অনসূয়া বিষ্ণু শিব ও ব্রহ্মার অংশে দত্ত দুর্বাসা ও সোমের জন্ম দিয়েছিলেন।

বিদুর বললেন, অত্রির গৃহে এই দেবতারা কেন জন্ম গ্রহণ করলেন? মৈত্রেয় বললেন, অত্রি তাঁর পত্নী অনসূয়ার সঙ্গে ঋক্ষ পর্বতে গিয়ে নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে একশো বৎসর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নিকটে তাঁর মতো পুত্র চেয়েছিলেন। তাঁর তপস্যায় ত্রিভুবন সন্তপ্ত দেখে অপ্সরা গন্ধর্ব নাগ বিদ্যাধরদের সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন। অত্রি তাঁদের প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তো ভগবানের চিন্তা করেছি, আপনারা তিনজন

এসেছেন কেন? তাঁরা বললেন, তুমি জগদীশ্বর বলে যে তত্ত্বের চিন্তা করেছ, আমরা তিনজনেই তাই। তোমার সংকল্প ব্যর্থ হবে না, আমাদের অংশে তোমার তিনটি পুত্র হবে। তাই হয়েছিল।

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার সিনীবালী কুহূ রাকা ও অনুমতি নামে চার কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মে। পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ অগস্ত্য নামে পুত্রের জন্ম দেন। বিশ্রবাও পুলস্ত্যের পুত্র। বিশ্রবার পত্নী ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম এবং অন্য পত্নীর গর্ভে জন্ম রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের। পুলহের পত্নী গতি কর্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া বালখিল্য নামে ষাট হাজার ঋষির জন্ম দেন। বশিষ্ঠের পত্নী উর্জার গর্ভে চিত্রকেতু সুরোচি বিরজা মিত্র উল্বণ বসুভৃদ-যান ও দ্যুমন্ নামে সপ্তর্ষি এবং অন্য পত্নীর গর্ভে শক্তি প্রভৃতি পুত্র জন্মেছিল। অথর্বার পত্নী চিত্তির দধীচি নামে এক পুত্র জন্মে। ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। ধাতা ও বিধাতাকে মেরু তাঁর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যাকে দান করেছিলেন। তাঁদের গর্ভে ধাতা ও বিধাতার মৃকণ্ডু ও প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মায়। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় ও প্রাণের পুত্র বেদশিরা। ভৃগুর কবি নামে আর এক পুত্র ছিল, উশনা বা শুক্র তাঁর পুত্র।

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন, তাঁদের ষোলটি কন্যা জন্মে। তাদের মধ্যে তেরোটি তিনি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি পিতৃগণকে এবং অপর কন্যাটি শিবকে সম্প্রদান করেন। মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া উন্নতি বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা হ্রী ও মূর্তি এই তেরটি কন্যা ধর্মের পত্নী হয়েছিলেন। শ্রদ্ধা শুভকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা মঙ্গলকে, লজ্জা বিনয়কে এবং মূর্তি নর ও নারায়ণ ঋষিকে প্রসব করে-

ছিলেন। এই ঋষিদের জন্মকালে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল এবং দেবতারা তাঁদের স্তব করেছিলেন। ঋষিরা গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন। হরির অংশে তাঁদের জন্ম এবং দ্বাপরের শেষ ভাগে তাঁরাই অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

অগ্নির পত্নী স্বাহা পাবক পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। এঁদের থেকে পঁয়তাল্লিশটি অগ্নি উৎপন্ন হয়। সব মিলিয়ে তাঁরা উনপঞ্চাশ। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ সোমপ ও আজ্যপ পিতৃগণ, দক্ষের কন্যা স্বধা এদের পত্নী। স্বধার বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা জন্মে, তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী ও জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

মহাদেবের পত্নী সতী পুত্র লাভ করতে পারেন নি। তাঁর পিতা দক্ষ বিনা অপরাধে মহাদেবের প্রতিকূল আচরণ. করলে তিনি রোষ বশে যৌবনেই দেহত্যাগ করেন।

দক্ষের যজ্ঞ

বিদুর বললেন, দক্ষ কেন সতীর অনাদর করে মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ করেছিলেন?

মৈত্রেয় বললেন, পুরাকালে বিশ্বসৃষ্টিকারী প্রজাপতিদের যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিরা অনুচরবর্গ নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। দক্ষ যখন সেই সভায় আসেন তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব ছাড়া আর সকলেই আসন থেকে উঠে দক্ষকে অভিনন্দন জানান। ব্রহ্মাকে প্রণাম করে দক্ষ উপবেশন করে বললেন, এই শিব নির্লজ্জ অবিনয়ী ও কর্তব্য আচরণে বিমুখ হয়ে সাধুদের পথ দূষিত করল। এ আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু গাত্রোত্থান তো করলই না, কথা বলেও আমার সম্মান রক্ষা করল না। শূদ্রকে বেদ বিদ্যা প্রদানের মতো আমি একে কন্যাদান করেছি। এই ব্যক্তি ভূত প্রেতের সঙ্গে উলঙ্গ: দেহে উন্মত্তের মতো শ্মশানে বিচরণ করে। মাদকে মত্ত, এ শুধু নামেই শিব।' বলে

দক্ষ জলস্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন, দেবতাদের যজ্ঞে এ যজ্ঞ ভাগ পাবে না। তারপর সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর এই কথা শুনে দক্ষ ও তাঁর সমর্থক ব্রাহ্মণদের বললেন অহংকারে দক্ষ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছে, অতএব সে পশুর তুল্য। আমি প্রতিশাপ দিচ্ছি যে সে স্ত্রীকামী ছাগ মুখ হোক, আর এই শিব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা জীবিকার জন্য বিদ্যার্জন ও ব্রতাচরণ করুক ও যাচকের বেশে বিচরণ করুক। এর পর ভৃগুও অভিশাপ দিলেন, যারা শিবের ব্রত অবলম্বন করে ও তার ভক্তদের অনুসরণ করে, তারা পাষণ্ড হোক। ভৃগুর কথায় শিব কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে নিজের অনুচরদের নিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন, অন্যান্য সকলে সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞে হরির পূজা দেখে প্রয়াগে যজ্ঞান্ত স্নান সেরে গৃহে ফিরলেন।

এরপর বহুকাল অতিবাহিত হলে ব্রহ্মা যখন দক্ষকে প্রজাপতিদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করলেন, তখন দক্ষ সগর্বে বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত করে বৃহস্পতি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তাতে দেবর্ষি ঋষি প্রভৃতি সকলেই পত্নীদের সঙ্গে পূজা পেলেন। সতী আকাশের খেচরদের কাছে এই কথা শুনলেন এবং বিমানে গন্ধর্ব দম্পতিদের সেই উৎসব ক্ষেত্রে যেতে দেখে শিবকে বললেন, আমারও সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে, গেলে সবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। শিব এ কথা শুনে ঈষৎ হেসে বললেন, মেয়েরা অনিমন্ত্রিত হয়েও আত্মীয় স্বজনের গৃহে যেতে পারে। কিন্তু কুটিল প্রকৃতির আত্মীয়দের দুর্বাক্যে বড় পরিতাপ ভোগ করতে হয়। আমি জানি যে তুমি পিতার স্নেহের পাত্রী, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে বলে তুমি তাঁর কাছে সমাদর পাবে না। আমার কথা উপেক্ষা করে যদি যাও তো তোমার মঙ্গল হবে না। এতে সতী একবার গৃহ থেকে বার হন, তার পরই শিবের ভয়ে গৃহে ফিরে আসেন। তার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। তিনি বৃষে আরোহণ করলেন এবং শিবের

অনুচররা তাঁর সঙ্গে চলল। সতী পিতার যজ্ঞ স্থলে প্রবেশ করলে দক্ষের অনাদর দেখে তাঁর মা ও বোনেরা ছাড়া আর কেউ সমাদর করলেন না। তিনি দেখলেন যে এই যজ্ঞে শিবের কোন ভাগ নেই। তিনিও অনাদৃতা। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে গর্বিত দক্ষকে নিন্দা করে বললেন, কারও সঙ্গে যার বিরোধ নেই তাঁর সঙ্গে আপনি প্রতিকূল আচরণ করছেন। কেউ স্বামীর নিন্দা করলে তার জিব কেটে নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করাই ধর্ম। আপনি শিবের নিন্দা করেছেন, তাই আপনা থেকে উৎপন্ন এই দেহ আমি আর ধারণ করব না। বলে সতী মৌনাবলম্বন করে উত্তরমুখী হয়ে বসে যোগ অবলম্বন করলেন। তাঁর দেহের কলুষ বিনষ্ট হয়ে সমাধি সমুৎপন্ন সদ্য প্রজ্বলিত হল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বলতে লাগল, দক্ষ কী কঠিন হৃদয়, কন্যাকে মরতে দেখেও তাকে নিবারণ করলেন না। পরলোকে তাঁর নরক প্রাপ্তি হবে। সতীর অনুচররা দক্ষকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে ভৃগু মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দিলেন। তাতে ঋভু নামের দেবতারা উত্থিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

নারদের মুখে অপমানিত সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে মহাদেবের অতিশয় ক্রোধ হল। তিনি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাঁর জটা ছিঁড়ে নিক্ষেপ করতেই মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হলেন। বললেন, আজ্ঞা করুন, কী করতে হবে। ভূতনাথ বললেন, আমার অনুচরদের অধিনায়ক হয়ে যজ্ঞ সহ দক্ষকে বিনাশ কর। এই আদেশ পেয়েই বীরভদ্র অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞ স্থলের দিকে ধাবিত হলেন। তারা যজ্ঞ স্থল অবরোধ করে সব কিছু ভেঙে ফেলতে লাগল। পলায়নপর দেবতাদের তারা ধরতে লাগল। মণিমান ভৃগুকে বন্ধন করলেন, বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্যকে এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করলেন। অন্যান্য সকলে যে যে ভাবে পারলেন পলায়ন করলেন। প্রজাপতিদের যজ্ঞ সভায় ভৃগু তাঁর শ্মশ্রু দেখিয়ে শিবকে উপহাস

করেছিলেন বলে বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু উপড়ালেন। ভগ সেখানে চোখের ইশারায় দক্ষকে শিবের নিন্দায় উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে তাঁর চোখ উপড়ে দিলেন। পূষা সেখানে দাঁত বার করে হেসেছিলেন বলে বীরভদ্র তাঁর দাঁত উপড়ে ফেললেন। তারপর দক্ষকে হাড় কাঠে ফেলে পশুর মতো তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। দক্ষের লোকেরা তাঁর নিন্দা করছে দেখে কুপিত বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ড আগুনে আহুতি দিয়ে যজ্ঞশালা দগ্ধ করে কৈলাসে ফিরে গেলেন।

ব্রহ্মা ও নারায়ণ পূর্বেই বুঝতে পেরে দক্ষের যজ্ঞে যান নি। দেবতারা ব্রহ্মার নিকটে এসে সব কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, শিব যজ্ঞের অংশভাগী, তাঁকে তোমরা বঞ্চনা করেছ। এই বারে তাঁর পা ধরে তাঁকে প্রসন্ন কর। এই বলে তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও কৈলাসে এলেন। এই পর্বতে যোগ বিষয়ে সিদ্ধ দেবতাদের বাস এবং কিন্নর গন্ধর্ব ও অপ্সরায় পরিবৃত। এর সৌন্দর্য দেখে দেবতারা বিস্মিত হলেন। তাঁরা অলকা নামে একটি মনোরম পুরী ও সৌগন্ধিক নামে একটি বন দেখতে পেলেন। নন্দা ও অলকানন্দা নামে দুটি নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁরা যক্ষেশ্বরের পুরী অতিক্রম করে সৌগন্ধিক বন দেখলেন এবং তারই নিকটে একটি বট গাছের নিচে মহাদেবকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। অত্যন্ত প্রশান্ত তাঁর মূর্তি. কুবের ও ঋষিরা তাঁর সেবা করছিলেন। ব্রহ্মাকে সমাগত দেখে মহাদেব আসন থেকে উঠে আনত মস্তকে তাঁর বন্দনা করলেন। ব্রহ্মা সবার কাছে অভিনন্দিত হয়ে বললেন, আমি জানি আপনিই বিশ্বের ঈশ্বর। জগতের যোনি ও বীজ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, যাকে শিব ও শক্তি বলে, এই দুইয়ের কারণ নির্বিকার ব্রহ্ম আপনারই স্বরূপ। আপনিই অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়া করে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করছেন। ধর্ম ও অর্থপ্রদ বৈদিক কর্ম পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আপনিই যজ্ঞের অবতারণা করেছিলেন। আপনি সর্বজ্ঞ, তাই

যারা জড় কর্মে আসক্ত তাদের আপনি অনুগ্রহ করুন। দক্ষের যজ্ঞ আপনি উদ্ধার করুন। যজ্ঞকর্তা দক্ষ আবার জীবিত হোক, ভগদেব তাঁর চোখ ফিরে পাক, ভৃগু তাঁর শ্মশ্রু এবং পূষা তাঁর দন্ত। প্রহারে যারাই আহত হয়েছে তারা সবাই আরোগ্য হয়ে উঠুক। আপনার ভাগ নিয়ে আপনি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন। মহাদেব বললেন, ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ অজ্ঞ লোকের আমি কোন অপরাধ নিই না। তবে লোকের হিতের জন্যই দণ্ড বিধান করেছি। দক্ষের মাথা তো দগ্ধ হয়েছে, তার ছাগ মুণ্ড হোক, ভগদেব মিত্রের চোখ দিয়ে নিজের যজ্ঞ ভাগ দেখুক, পূষা যজমানের দাঁত দিয়ে ভক্ষণ করুক আর অন্যান্য সকলেই সুস্থ হয়ে উঠুক।

মহাদেবের এই কথায় সকলে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ও ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করে যজ্ঞস্থলে আনলেন। দক্ষের দেহে যজ্ঞের ছাগ মুণ্ড সংযোজিত হল এবং মহাদেবের দৃষ্টিপাতে তাঁর প্রাণ সঞ্চার হলে দক্ষ তাঁর স্তব করতে লাগলেন। পুনরায় যজ্ঞ প্রবর্তন হলে গরুড়ে আরোহণ করে হরি এসে উপস্থিত হলেন। সমবেত সকলেই তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তারপর হরি দক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই শিব। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের জন্য আমিই উপযুক্ত নাম ধারণ করি। আমাদের তিনজনের একই স্বরূপ এবং আমরা সকল প্রাণীর আত্মা। আমাদের তিনজনের মধ্যে যারা ভেদ না দেখে তারাই শান্তি লাভ করে। এর পর দক্ষ যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন এবং দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন।

মৈত্রেয় বললেন, দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পুনর্বার তাঁর প্রিয় পতি লাভ করেছিলেন। আমি এই কথা উদ্ধবের নিকটে শুনেছি।

ধ্রুবের উপাখ্যান

মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন, অধর্মের পত্নীর নাম মিথ্যা। তাঁদের দম্ভ নামে এক পুত্র ও মায়া নামে এক কন্যা জন্মে। অপুত্রক নিঋর্তি তাঁদের অপত্য রূপে গ্রহণ করেন। দম্ভ ও মায়ার লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নামে এক কন্যা জন্মে। তাদের পুত্রকন্যার নাম ক্রোধ ও হিংসা। কলি এঁদের পুত্র এবং দুরুক্তি তাঁর ভগিনী। দুরুক্তির গর্ভে কলির মৃত্যু নামে এক পুত্র ও ভীতি নামে এক কন্যার জন্ম হয়। তাদের পুত্র কন্যার নাম নরক ও যাতনা। এই হল অধর্মের বংশ।

এর পর আমি মনুর পুত্রদের বংশের কথা বলছি। শতরূপার গর্ভে তাঁর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। উত্তানপাদের দুই পত্নী স্থনীতি ও সুরুচি। সুনীতি সুরুচির মতো প্রিয় হতে পারেন নি। ধ্রুব সুনীতির পুত্র। রাজা একদিন সুরুচির পুত্র উত্তমকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। এমন সময় ধ্রুব তাঁর কোলে উঠতে চাইলেও তিনি তাকে আদর করলেন না। সুরুচি সগর্বে বললেন, তুমি রাজার পুত্র হয়েও রাজার আসনে আরোহণের যোগ্য নও। তার জন্যে আমার পেটে তোমাকে জন্মাতে হবে। ধ্রুব এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে নিজের মায়ের কাছে গেলেন। সুনীতি অন্তঃপুরে সুরুচির দুর্বাক্যের কথা শুনেছিলেন। চোখের জল ফেলে তিনি বললেন, পরকে দুঃখ দিলে নিজেকেই দুঃখ পেতে হয়। তোমার বিমাতা ঠিকই বলেছেন, রাজার আসনে বসবার ইচ্ছা থাকলে ভগবানের আরাধনা কর।

ধ্রুব এই কথা শুনে পিতৃগৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। নারদ এসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, ধ্রুব, এখন তুমি বালক, এ তোমার খেলার বয়স। তোমার পক্ষে ভগবানকে পাওয়া এখন সম্ভব নয়। ধ্রুব বললেন, আমার মনে যে দুঃখ তাতে আমি আপনার উপদেশ মানতে পারব না। আমার পিতা বা পিতামহর চেয়েও বড়

পদ আমি চাই, পাবার পথ আমাকে বলে দিন। নারদ বললেন, তবে তুমি যমুনার তীরে মধুবনে যাও, হরি সেখানে আছেন।

ধ্রুব সেই দিকে চলে গেলে নারদ রাজা উত্তানপাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং রাজার অর্ঘ নিয়ে বসে বললেন, ম্লান মুখে আপনি কী ভাবছেন? রাজা বললেন, স্ত্রীর বশীভূত হয়ে আমি আমার পাঁচ বছরের ছেলে ও তার মাকে নির্বাসিত করেছি। সেই বালক এখন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে কী করছে জানি না। হয়তো কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে। নারদ বললেন, তার জন্যে শোক করবেন না। দেবতারা তাকে রক্ষা করছেন। তার যশে একদিন জগৎ ব্যাপ্ত হবে।

এ দিকে ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হয়ে হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথম মাসে তিন দিন পর পর কুল ও কয়েত বেল খেয়ে অতিবাহিত করলেন। দ্বিতীয় মাসে ছয় দিন পর পর জীর্ণ তৃণ পত্রাদি আহার করলেন। প্রতি নবম দিনে শুধু জল পান করে কাটালেন তৃতীয় মাস। চতুর্থ মাসে শ্বাস জয় করে বারো দিনের দিন শুধু বায়ু ভক্ষণ করে কাটালেন। পঞ্চম মাসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে হরির ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন। শ্বাস কষ্ট পেয়ে দেবতারা হরির শরণাপন্ন হলেন। হরি বললেন, ধ্রুব এখন ধ্যানযোগে আমার সঙ্গে ঐক্য লাভ করে আছে। তোমাদের কোন ভয় নেই। দেবতারা ফিরে গেলেন এবং হরি ধ্রুবকে দর্শন দেবার জন্য গরুড়ের পিঠে চড়ে মধুবনে এলেন। ধ্রুব যে রূপে তাঁকে মনের মধ্যে দেখছিলেন, চোখ মেলে তাঁকে সেই রূপেই দেখলেন। হরি বেদময় শঙ্খ দিয়ে ধ্রুবের কপোল স্পর্শ করতেই তাঁর বাক্‌শক্তি উৎপন্ন হল এবং তিনি পরমাত্মা ও জীবের তত্ত্ব নির্ণয় করে তাঁর স্তব করলেন। ভগবান বললেন, তোমাকে আমি দুষ্প্রাপ্য স্থান দিচ্ছি। তাতে গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত আছে, সপ্তর্ষি ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করছেন। এই স্থানের বিনাশ নেই। এখন তোমার পিতা তোমার হাতেই পৃথিবীর ভার দিয়ে বনে যাবেন, তুমি ছত্রিশ হাজার বছর রাজ্য পালন করবে। তোমার ভাই উত্তম

মৃগয়া করতে গিয়ে বিনষ্ট হলে তোমার বিমাতা সুরুচি তাকে বনে বনান্তরে অন্বেষণ করে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করবেন। এই বলে হরি ফিরে গেলেন।

ধ্রুব পিতৃগৃহে ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু ভগবানের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেন নি বলে তাঁর মনস্তাপ উপস্থিত হল। ভাবলেন যে বহু জন্মের সাধনায় ঋষিরা যা জানতে পারেন, ছয় মাসে তিনি তা জেনেও ভেদ দৃষ্টির বশে অধঃপতিত রয়ে গেলেন।

এদিকে ধ্রুব ফিরে আসছেন শুনে রাজা উত্তানপাদ তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেলেন। সুনীতি ও উত্তমকে নিয়ে সুরুচি শিবিকারোহণে চললেন। ধ্রুব উপবনের নিকটে এলে রাজা রথ থেকে নেমে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুবও পিতা মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করলেন। সুরুচিও ধ্রুবকে আলিঙ্গন করে বললেন, দীর্ঘজীবী হও। উত্তম ও ধ্রুবও পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

ধ্রুব যৌবনে পদার্পণ করলে উত্তানপাদ দেখলেন যে প্রজারা ধ্রুবের অনুরক্ত, অমাত্যগণও সম্মত। তাই ধ্রুবকেই রাজ্যের ভার দিয়ে বনে গেলেন।

ধ্রুব প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। তিনি বায়ুর কন্যা ইলাকেও বিবাহ করেন। ইলার গর্ভে উৎকল নামে এক পুত্র ও একটি কন্যাও জন্মে। অকৃতদার উত্তম একদা মৃগয়ার জন্য হিমাচলে গেলে এক যক্ষ তাঁকে বধ করে। তাঁর মাতাও পুত্রের দশা প্রাপ্ত হন। ধ্রুব ভাইএর নিধন বার্তায় ক্রোধে ক্ষোভে ও শোকে অভিভূত হয়ে রথারোহণে যক্ষালয়ের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি অলকা-পুরী দেখতে পেয়ে শঙ্খধ্বনি করতেই যক্ষ বীররা তাঁকে আক্রমণ করল। কিন্তু ধ্রুবের বাণে তাদের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। তারপর তারা মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করলে ধ্রুব নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করলেন। তাতে সমস্ত মায়া বিনষ্ট হল। ধ্রুব

নিরপরাধ যক্ষদের বধ করছেন শুনে তাঁর পিতামহ মনু ঋষিদের সঙ্গে এসে বললেন, ক্রোধ পাপে পূর্ণ ও নরকের দ্বার স্বরূপ। তাই নিন্দিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হও। দেহকে আত্মা মনে করে পশুরা যেমন পরস্পরকে বধ করে, তুমিও তেমনি একজন যক্ষের অপরাধে বহু যক্ষ বধ করেছ। কুবেরের কোন অনুচর তোমার ভাইকে বধ করে নি, পরমেশ্বরই জীবের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ। তুমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ কর, আত্মদর্শী হয়ে নির্গুণ আত্মার অন্বেষণ কর। তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে সর্বদাই আছেন। ভেদ জ্ঞানের জন্যই তাঁকে এই অসৎ বিশ্ব প্রতীয়মান হয়। মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়ে ঋষিদের নিয়ে ফিরে গেলেন। কুবের যখন শুনলেন যে ধ্রুব ক্রোধ ত্যাগ করে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছেন, তখন তিনি ধ্রুবের নিকটে এসে বললেন, পিতামহর কথায় তুমি শত্রু ভাব ত্যাগ করেছ বলে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যক্ষ তোমার ভাইকে বধ করে নি, তুমিও যক্ষ বিনাশ কর নি। আসলে কালই জীবের জন্ম-মৃত্যুর বিধাতা। তুমি অসঙ্কোচে আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। ধ্রুব প্রার্থনা করলেন, হরির প্রতি আমার যেন অচল স্মৃতি থাকে। কুবের ধ্রুবকে সেই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুবও তাঁর পুরীতে ফিরে এলেন।

এর পর তিনি বহু যজ্ঞ করে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন। ছত্রিশ বৎসর পৃথিবী শাসন করবার পর পুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে বদরিকাশ্রমে গেলেন। তিনি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন যে সুনন্দ ও নন্দ নামে হরির দুই পার্ষদ আকাশ থেকে রথ নিয়ে নামলেন। বললেন আমরা তোমাকে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যে স্থান প্রদক্ষিণ করে সেই স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি। ধ্রুব বললেন, দুঃখিনী মাকে ছেড়ে আমি কেমন করে যাব! তাঁরা ধ্রুবকে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর মা বিমানে আরোহণ করে তাঁর আগে যাচ্ছেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। ধ্রুব বিমানে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষি মণ্ডল অতিক্রম করে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হলেন।

বেণের উপাখ্যান

মৈত্রেয় বললেন, বিদুর, ধ্রুব বনে যাবার পর রাজ্যের অমাত্যরা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎকলকে জড় ও উন্মত্ত মনে করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আসলে উৎকল জন্মাবধি অনাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন এবং নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করতেন। বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুষ্পার্ণ, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ব্যুষ্ট, ব্যুষ্টের এক পুত্রের নাম সর্বতেজা। সর্বতেজার পত্নী আকূতির গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম। মনুর দ্বাদশটি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ উল্মুক। উল্মুকের পুত্র অঙ্গ ধর্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন দেবতারা আহূত হয়েও সেই যজ্ঞে আসেন নি। ঋত্বিকরা বিস্ময়ান্বিত হয়ে রাজাকে বললেন, এ জন্মে আপনার পাপ না থাকলেও পূর্ব জন্মের পাপের ফলে আপনি পুত্রহীন হয়েছেন। হরির আরাধনায় আপনার পুত্রলাভ হবে। এই স্থির করে তাঁরা শিপিবিষ্ট বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ আহুতি দিলেন। তাতে যজ্ঞের আগুন থেকে এক পুরুষ এক পাত্র পায়স নিয়ে উত্থিত হল। অঙ্গ সেই পায়স নিয়ে তাঁর পত্নী সুনীথাকে দিলেন। তিনি তা খেয়ে যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করলেন। অধর্মের অংশে জন্ম এই পুত্রের নাম বেণ। মৃত্যু তাঁর মাতামহ। বাল্যকাল থেকে বেণ ধর্মহীন হলেন। ব্যাধের মতো ধনুর্বাণ নিয়ে বনে পশুবধ করে বিচরণ করতেন। খেলার সময়েও তিনি সঙ্গীদের নির্দয় ভাবে আক্রমণ করে পশুর মতো বধ করতেন। অঙ্গ এই পুত্রকে নানাভাবে শাসন করেও সংযত করতে পারেন নি। একদিন গভীর রাত্রে অঙ্গ সুনীথাকে পরিত্যাগ করে সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করলেন। তাঁর অমাত্য পুরোহিত আত্মীয় ও প্রজারা শোকগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র খুঁজে বেড়ালেন। ব্যর্থ হয়ে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

অতি উগ্র স্বভাব বেণ সিংহাসনে বসেছেন শুনেই দস্যুরা মূষিকের মতো আত্মগোপন করল। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত অবিনয়ী ও আত্ম-

শ্লাঘাকারী হয়ে পূজনীয় ব্যক্তিদের অবমাননা করতে লাগলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ও গর্বিত হয়ে রথারোহণে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে দ্বিজরা যজ্ঞাদি ধর্মাচরণ করতে পারবে না। মুনিরা সত্র নামে এক যজ্ঞে সমবেত হয়ে স্থির করলেন যে সৎপরামর্শ দিয়ে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। বেণ যদি কথা না শোনেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের তেজে তাঁকে দগ্ধ করবেন। এই স্থির করে তাঁরা নিজেদের মনের ভাব গোপন করে বেণের নিকটে গিয়ে বললেন, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা নিজেদের ধর্ম পালন করে যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা করেন, ভগবান সেই রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণেরা আপনার রাজ্যে নানা রকম যজ্ঞ করে হরির অংশ স্বরূপ দেবতাদের অর্চনা করেন, তাঁদের আপনি অবহেলা করবেন না। বেণ বললেন, আপনারা মূর্খ, তাই অধর্মকে ধর্ম মনে করছেন। আমাকে ছেড়ে আপনারা কুলটা নারীর উপপতি সেবার মতো হরির সেবা কেন করছেন। যজ্ঞ পুরুষ কে? সমস্ত দেবতাই তো রাজার দেহে বর্তমান। আপনারা আমারই অর্চনা করুন। ঋষিদের কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না দেখে তাঁরা অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বেণকে বধ কর। এ জীবিত থাকলে এর পাপের আগুনে পৃথিবী দগ্ধ হবে। এই বলে ঋষিরা বেণকে বধ করলেন এবং পুত্র শোকাতুরা সুনীথা মন্ত্র শক্তিতে তাঁর দেহ রক্ষা করতে লাগলেন।

এর পর ঋষিরা দেখলেন যে তস্করেরা গৃহস্থের ধন অপহরণ করছে এবং রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছে। অঙ্গের বংশ বিলুপ্ত হওয়া উচিত নয় ভেবে তাঁরা মৃত বেণের ঊরুদেশ মন্থন করে এক খর্বকায় পুরুষ পেলেন। তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ, নাসিকা নিম্ন ও কেশ তাম্র বর্ণ। তিনি সবিনয়ে বললেন, আমাকে কী করতে হবে বলুন। ঋষিরা বললেন, তুমি নিষাদ, অর্থাৎ উপবেশন কর। এই জন্য তিনি নিষাদ নামে পরিচিত হলেন এবং তাঁর বংশধর নিষাদ জাতি বলে বনে জঙ্গলে বাস করতে লাগল।

পৃথুর উপাখ্যান

ঋষিরা পুনরায় অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করলে এক পুরুষ ও এক নারী উৎপন্ন হল। ঋষিরা বললেন, এই পুরুষ পৃথু নামে বিখ্যাত রাজা হবেন এবং সেই নারী অর্চি নামে তাঁর পত্নী হবেন। এঁরা হরি ও লক্ষ্মীর অংশে জন্মেছেন। তাঁর অভিষেকের সময় দেবতা ও প্রজারা এসে নানা দ্রব্য উপহার দিলেন। তারপর পৃথু সূত মাগধ ও বন্দীদের স্তবপাঠে উদ্যত দেখে বললেন, আমার তো কোন গুণই জগতে প্রকাশ পায় নি, কী নিয়ে আমার গুণগান করবে! তবুও গায়করা ঋষিদের উৎসাহে স্তব করলেন, আমরা হরির অংশাবতার পৃথুর উদার কীর্তি বর্ণনা করব। তিনি সকলকে ধর্মপথে পরিচালিত করবেন এবং ধর্মদ্বেষীদের শায়স্তা করবেন। তিনি একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। ইত্যাদি।

পৃথিবীতে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ প্রজারা পৃথুর কাছে এসে বলল, অন্নাভাবে যাতে আমরা বিনষ্ট না হই, তার ব্যবস্থা করুন। পৃথু কিছুক্ষণ চিন্তা করেই বুঝতে পারলেন যে পৃথিবী ওষধি বীজ গ্রাস করেছেন বলেই শস্য উৎপন্ন হচ্ছে না। তিনি পৃথিবীকে বিনাশ করবার জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করলেন। তাই দেখে পৃথিবী সভয়ে বললেন, সৃষ্টিকর্তা ধান প্রভৃতি যে সব ওষধি সৃষ্টি করেছিলেন, দুষ্টরা তা ভোগ করেছিল। চোরের ভয়ে আমি সে সব গ্রাস করেছি। আমি যাতে আবার তা দিতে পারি, তার জন্য আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার পর যাতে আমার সর্বত্র বৃষ্টির জল থাকতে পারে, তার জন্য আমাকে সমতল করুন। এই কথা শুনে পৃথু পৃথিবী থেকে ধান্যাদি ওষধি দোহনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি পর্বতের শৃঙ্গ চূর্ণ করে পৃথিবীকে সমতল করেছিলেন এবং সস্নেহে তাকে কন্যা রূপে গ্রহণ করেন। নানা স্থানে তিনি পুর ও গ্রাম স্থাপন করেন।

এর পর পৃথু ব্রহ্মাবর্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন।

সেই যজ্ঞে দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পেরে বিঘ্ন উৎপাদন করলেন। পৃথুকে হতমান করবার জন্য ইন্দ্র যজ্ঞের শেষ অশ্বটি অলক্ষ্যে অপহরণ করে পলায়ন করলেন। তিনি পাষণ্ড বেশ ধারণ করে যখন শূন্যমার্গে পলায়ন করছিলেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। পৃথুর পুত্রকে তা দেখাতেই তিনি ইন্দ্রের পিছনে ধাবিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্রকে জটাজুটধারী দেখে ধর্মের মূর্তি মনে করে বাণ নিক্ষেপ করলেন না। তাই দেখে অত্রি বললেন, যজ্ঞবিনাশকারী দেবাধম ইন্দ্রকে তুমি বধ কর। ভয়ে ইন্দ্র সেই পাষণ্ড বেশ ত্যাগ করে যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনায় ঋষিরা পৃথুর পুত্রের নাম দিলেন বিজিতাশ্ব। এর পরেও ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করে পুনরায় সেই অশ্বটি অপহরণ করলেন। অত্রির প্ররোচনায় বিজিতাশ্ব এবারে বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হতেই ইন্দ্র অশ্বটি ফিরিয়ে দিয়ে ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন। অশ্ব নিয়ে বিজিতাশ্ব যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে অজ্ঞ লোকেরা ইন্দ্রের পাষণ্ড বেশ গ্রহণ করেছে। বুদ্ধির বিভ্রমে তারা সেই উপধর্মকেই ধর্ম মনে করে তাতে আসক্ত হয়েছে। পৃথু এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রু বধের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করলেন। ঋষিরা বললেন, যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের পশু ছাড়া আর কাউকে বধ করা বিধেয় নয়। ইন্দ্রকে আমরা মন্ত্রবলে এখানে এনে যজ্ঞে আহুতি দেব। এই বলে ঋত্বিকরা হোম করতে প্রবৃত্ত হতেই ব্রহ্মা এসে বললেন, আপনারা যাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন তিনি আপনাদের বধ্য নন। ইন্দ্র ভগবানের অবতার এবং যজ্ঞ নামে অভিহিত। দেবতারা তাঁরই দেহ স্বরূপ। পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য তিনি যে সব পাষণ্ড পথ প্রবর্তন করেছেন তা দেখতেই পাচ্ছেন। এতে ধর্মের গ্লানি হবে। ব্রহ্মার এই কথায় পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ইচ্ছা ত্যাগ করে ইন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রী করলেন। যজ্ঞ সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু এসে বললেন, ইন্দ্র তোমার যজ্ঞে বিঘ্ন করেছেন ঠিকই। কিন্তু এখন তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। প্রজা

পালন রাজার ধর্ম, তিনি তাঁদের পরলোকে অর্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। কিন্তু যে রাজা প্রজাকে রক্ষা না করে শুধু কর গ্রহণ করেন, প্রজারা তাঁর পুণ্য হরণ করেন এবং রাজাই প্রজাদের পাপের ভাগী হন। তুমি রাজধর্ম পালন করছ, অচিরে সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিরা তোমার কাছে আসবেন। তোমার গুণে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি যে কোন বর নিতে পার। পৃথু বললেন, আমি আপনার কাছে কোন ভোগ্য বস্তু চাইব না। আপনার কীর্তি শোনবার জন্ম আমাকে অযুত কান দিন। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্ম পৃথুর চরণ স্পর্শ করলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

মহারাজা পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। কালক্রমে একদিন একটি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিরা সমাগত হয়ে সভ্য হলেন। তিনি তাঁদের অর্চনা করে বললেন, আপনাদের স্বধর্মে স্থাপন করাই আমার কর্তব্য। তাই বলছি, হরিতে মতি রেখেই ধর্মের অনুষ্ঠান করবেন। এই কথা শুনে সমবেত সকলেই সাধুবাদ দিলেন। বললেন, হিরণ্যকশিপুর মতো বেণও পুত্রের প্রভাবে নরক থেকে নিস্তার পেলেন। এই সময়ে সনকাদি চার জন ঋষি আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। পৃথু তাঁদের অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে যথাবিধি পূজা করে বললেন, এই সংসারে, কী ভাবে অনায়াসে কল্যাণ লাভ হয় তাই আমাদের বলুন। সনক সহাস্তে বললেন, পরম জ্ঞানী হয়েও আপনি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। সমস্ত শাস্ত্রের বিচার করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে আত্ম ভিন্ন অন্য পদার্থে আসক্তি ত্যাগ ও নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মার দৃঢ় রতিই মানুষের মঙ্গলের কারণ। শ্রদ্ধা, ধর্মচর্চা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, জ্ঞানযোগ পরায়ণতা, যোগেশ্বরদের উপাসনা ও হরির পবিত্র কথার আলোচনায় এই রতি হয়। যাঁরা এই ঘোর সংসার পার হতে চান, তাঁরা ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক

কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবেন না। আপনারা বাসুদেবের ভজনা করুন। সনৎকুমারের নিকটে এই আত্মতত্ত্ব শুনে পৃথু বললেন, আমি আমার সর্বস্ব আপনাদের অর্পণ করছি। এর পরই আত্মজ্ঞানী ঋষিরা সকলের সামনে আকাশ মার্গে চলে গেলেন।

পৃথুর পত্নী অর্চির গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাদের নাম বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। প্রজার মনোরঞ্জন করে তিনি রাজা নাম সার্থক করেছিলেন। একদিন নিজেকে বয়োবৃদ্ধ মনে করে পুত্রের হাতে পৃথিবীর ভার দিয়ে সস্ত্রীক তপোবনে গেলেন এবং বাণপ্রস্থে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। কখনও কন্দমূল ও ফলমাত্র আহার করতেন, কখনও শুধু শুষ্ক পত্র। কয়েক পক্ষ জল পানেই যাপিত হত। শেষে শুধু বায়ু ভক্ষণ করেই থাকতেন। গ্রীষ্মে তিনি পঞ্চতপা হয়ে থাকতেন, বর্ষায় প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে মুনিব্রত পালন করতেন এবং শীতে জলে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি যোগে আত্মায় আত্মযোজন করে কাল উপস্থিত হলে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর পত্নী অর্চি তাঁকে অনুগমন করে চলে এসেছিলেন, তিনি স্বামীকে চিতায় তুলে কালোচিত কৃত্য সম্পন্ন করলেন। তারপর নিজেও আগুনে প্রবেশ করলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। উভয়েই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হলেন।

প্রাচীন বর্হি ও প্রচেতাদের উপাখ্যান

পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব রাজা হয়ে ভ্রাতা হর্যক্ষকে পূর্বদিকের, ধূম্রকেশকে দক্ষিণদিকের, বৃককে পশ্চিমদিকের ও দ্রবিণকে উত্তর-দিকের আধিপত্য দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের নিকট তিনি অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করায় তাঁর নাম অন্তর্ধান হয়। পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে তাঁর তিন পুত্র জন্মে। বশিষ্ঠের শাপে পাবক পবমান ও শুচি এই তিনজন অগ্নিই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। নভস্বতী নামে আর এক পত্নীর গর্ভে তাঁর হবির্ধান নামে আর এক পুত্রের জন্ম হয়। কর আদায়

দণ্ড বিধান ও শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতি রাজার বৃত্তি পীড়াদায়ক মনে করে অন্তর্ধান যজ্ঞের ছলে রাজবৃত্তি ত্যাগ করেন। হরির অর্চনা করে তিনি বিষ্ণুলোক লাভ করেন।

হবির্ধানের পত্নী হবির্ধানীর গর্ভে বর্হিষদ গয় শুক্ল কৃষ্ণ সত্য ও জিতব্রত নামে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। বর্হিষদ ক্রিয়াকাণ্ড ও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। লোকে তাঁকে প্রাচীন বর্হিও বলে। ব্রহ্মার আদেশে তিনি সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেছিলেন। এঁর গর্ভে প্রাচীন বর্হির দশটি পুত্র জন্মে। তাঁদের নাম প্রচেতা। পিতা তাঁদের প্রজা সৃষ্টি করতে বললে তাঁরা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন। সমুদ্রের নিকটে এক সরোবর থেকে অনুচর সহ রুদ্র উঠে তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি যে স্তোত্র বললাম তাতে হরির আরাধনা কর। তিনি তুষ্ট হলে তোমরা সবই লাভ করবে। বলে রুদ্র অন্তর্হিত হলেন এবং প্রচেতারা জলের মধ্যে সেই স্তোত্র জপ করতে করতে দশ হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন।

এই সময়ে নারদ কর্মে আসক্ত প্রাচীন বর্হির নিকটে এসে বললেন, এই কর্মের দ্বারা তুমি কী রকম মঙ্গল চাইছ? তোমার এই কর্মে তো দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ লাভ হবে না। রাজা বললেন, কর্মে বিভ্রান্ত হয়ে আমি পরম মঙ্গলকে জানতে পারি নি। আমি যাতে কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারি, আপনি সেই উপদেশ দিন। নারদ বললেন, যজ্ঞে তুমি যে হাজার হাজার জীবের প্রাণ সংহার করেছ, তোমার মৃত্যুর পর তারা শৃঙ্গ দিয়ে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করবে। আমি তোমাকে পুরঞ্জনের প্রাচীন ইতিহাস বলছি।

পুরঞ্জন নামে এক যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর সখার নাম ও কর্ম জানতেন না। রাজা তাঁর উপযুক্ত বাসস্থান অন্বেষণে পৃথিবী পর্যটন করলেন। যে সব পুরী দেখলেন তা তাঁর পছন্দ হল না। একদিন হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে নটি দ্বারে শোভিত এক পুরী

দেখলেন। তার উপবনে তিনি দশজন ভৃত্যের সঙ্গে এক নারীকে দেখতে পেলেন। ঐ যুবতীকে একটি পঞ্চশির-বিশিষ্ট সর্প রক্ষা করছিল। রাজা তাঁর কটাক্ষে বিদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে এখানে এসেছ? তোমাকে দেখে আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর। সেই নারী সহাস্যে পুরঞ্জনকে বললেন, আমরা আমাদের পরিচয় জানি না। এই পুরুষেরা আমার সখা ও নারীরা সখী। আর এই নাগ এই পুরী রক্ষা করে। আমার সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন, এই পুরীতে শত বৎসর অধিষ্ঠান করে, আপনি সব ভোগ করুন। এরপর তাঁরা সেই পুরীতে প্রবেশ করে শত বৎসর আমোদ-প্রমোদ করতে লাগলেন। রাণী যা ইচ্ছা করেন, তিনি তাই করে থাকেন। ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় তিনি তাঁর পত্নীর অনুসরণ করতে থাকেন। একদিন রাজা রথে আরোহণ করে বনে গেলেন। সেখানে মৃগয়ায় বহু পশু বধ করে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন করে স্নানাহার করে শয্যায় শয়ন করলেন। রাণীকে তিনি ভূমিতে শায়িত দেখে তাঁর সঙ্গলাভের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি তোমাকে না বলে মৃগয়ায় গিয়েছিলাম, আমি তোমার নিকটে অপরাধী।

দুর্জয় কাল যে তাঁর আয়ু হরণ করছে তা তিনি বুঝতেও পারছিলেন না। এই রাণীর গর্ভে তাঁর এগারো শো পুত্র ও একশো দশটি কন্যার জন্ম হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তাদেরও শত শত পুত্র জন্মেছিল। পুরঞ্জনের বংশ পাঞ্চাল দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এরপর চণ্ডবেগ নামে এক গন্ধর্ব তার অনুচরদের নিয়ে পুরঞ্জনপুরী হরণ করতে আরম্ভ করল। এদিকে কালের এক কন্যা পতিলাভের জন্য ত্রিলোক ভ্রমণ করেছিল। কিন্তু কেউ তাকে বিবাহ করতে চায় নি। এইজন্য তার দুর্ভগা নাম হয়। রাজর্ষি পুরু তাকে বিবাহ করতে রাজী হলে সে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর পাইয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আমাকে সে শাপ দিয়েছিল। আমি ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যে আসছিলাম। আমি ব্রহ্মচারী জেনেও সে কামাহত হয়ে আমাকে বরণ করেছিল। আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সে শাপ দেয় যে আমি কখনও এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারব না। সেই কন্যা আমার উপদেশে যবনেশ্বর ভয়কে পতিত্বে বরণ করে। বলে, আমাকে দয়া করে গ্রহণ করুন, বিপন্ন ব্যক্তিতে দয়া করাই পুরুষের ধর্ম। কাল-কন্যার এই কথা শুনে যবনেশ্বর জীবের মরণ ঘটাতে ইচ্ছুক হয়ে বলল, তুমি অভদ্র ও অপ্রিয় বলে কেউ তোমার পতি হতে চায় না। আমি তোমার পতি নির্বাচন করে রেখেছি। তুমি অদৃশ্য ভাবে গিয়ে কর্মফল-লব্ধ লোকদের ভোগ কর। আমার যবন সেনার সাহায্যে তুমি লোকক্ষয় করতে সমর্থ হবে। এই প্রজ্বার আমার ভাই, তুমি আমার ভগিনী হও। আমি আমার ভয়ঙ্কর সেনা নিয়ে অলক্ষ্য ভাবে তোমাদের সঙ্গে মর্ত্যে বিচরণ করব।

এরাই একদিন পুরঞ্জন রাজার পুরী আক্রমণ করল। বিষয়াসক্ত পুরঞ্জন হতবুদ্ধি শ্রীহীন ও দীন দশাগ্রস্ত হলেন। প্রজ্বার পুরী দগ্ধ করল। তবু পুরঞ্জন সব কিছুর জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময়ে ভয় নামে মৃত্যু এসে উপস্থিত হল। যবনেরা সবলে পুরঞ্জনকে যখন আকর্ষণ করছিল, তখনও তাঁর পরমেশ্বরের কথা স্মরণ হল না। পুরঞ্জন যজ্ঞে যেসব পশু বধ করেছিলেন, তারা তাঁকে কুঠারে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। তাঁর পূর্ব স্মৃতি নষ্ট হল এবং তিনি অনেক বৎসর যাতনা ভোগ করলেন। পুরঞ্জন স্ত্রীর চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে যম-যাতনা ভোগের পর বিদর্ভের রাজকন্যা হয়ে জন্মালেন। পণ্ড দেশের রাজা মলয়ধ্বজ সমবেত রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে এই বীর্যশুল্কা রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের একটি কন্যা সাতটি পুত্র জন্মে। পুত্ররা সাতটি দ্রাবিড় রাজ্যের রাজা হয়। মলয়ধ্বজের প্রথম কন্যাকে অগস্ত্য বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র ইধ্মবাহর পিতা দৃঢ়চ্যুত। মলয়ধ্বজ পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ

করে দিয়ে কৃষ্ণের আরাধনার জন্য কুলাচলে গমন করেন। পত্নীও তাঁর অনুগমন করেন। সেখানে চন্দ্ররসা তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নদীর তীরে তপস্যা করে পরব্রহ্মে নিজেকে ও নিজের মধ্যে পরব্রহ্মকে দেখে সংসার থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর পত্নী বৈদর্ভী পতির দেহ চিতায় তুলে আগুন জ্বেলে সহমৃতা হবার সংকল্প করলেন। সেই সময়ে তাঁর পুরনো সখা এক আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে এসে রোদনরতা বৈদর্ভীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি যে তোমার সখা তা কি জানো? নিজেকে কি তোমার মনে পড়ে? আমাকে পরিত্যাগ করে তুমি যে সংসার ভোগে রত হয়েছিলে তা কি ভুলে গেছ? তুমি ও আমি এই দুই হংস একত্র মানস সরোবরে বাস করতাম। গ্রাম্য সুখভোগের জন্য তুমি আমাকে ভুলে কোন স্ত্রীর নির্মিত একটি পুরী দেখেছিলে। মানুষের দেহ ঐ বাসস্থান, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় তার উপবন, নয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বার, প্রাণ একমাত্র রক্ষক এবং বুদ্ধি তার অধিশ্বরী। বুদ্ধির বশীভূত পুরুষ ঐ দেহে প্রবেশ করে নিজেকে ও আমাকে ভুলে যায়। পূর্বজন্মে তুমি নিজেকে পুরুষ মনে করেছিলে ও এ জন্মে নিজেকে স্ত্রী ভাবছ, তা আমারই মায়ার বিলাস। জীবে পুরুষ বা স্ত্রী ভাব নেই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা আমরা উভয়েই শুদ্ধ। তুমি আমারই স্বরূপ, আমিও তোমারই স্বরূপ। পণ্ডিতেরা আমাদের কোন প্রভেদ দেখতে পান না। রাজা, আমি পুরঞ্জনের কাহিনী দিয়ে তোমাকে এই অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ দিলাম।

রাজা প্রাচীন বর্হি এই কাহিনীর তাৎপর্য বুঝতে চাইলে দেবর্ষি নারদ তার ব্যাখ্যা করে বলেন, সর্বান্তঃকরণে হরির ভজনা কর। বলে সিদ্ধলোকে প্রস্থান করলেন।

প্রাচীন বর্হি তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, আমার পুত্রদের প্রজা সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ করতে বোলো। বলে তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে গেলেন। সেখানে অচিরে তাঁর ভগবৎ-সাম্য লাভ হল।

বিদুর প্রশ্ন করলেন, রুদ্রগীতে হরিকে তুষ্ট করে প্রচেতারা কী ভাবে সিদ্ধিলাভ করলেন ?

মৈত্রেয় বললেন, দশ হাজার বৎসর তপস্যার পর বিষ্ণু তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমরা বর নাও। তোমাদের এক পুত্র হবে ব্রহ্মার মতো। ইন্দ্রের প্রেরিত অপ্সরা প্রম্লোচা কণ্ডু মুনির ঔরসে এক কন্যার জন্ম দিয়ে যখন তাকে ত্যাগ করে চলে যায়, তখন বৃক্ষরা তাকে গ্রহণ করে এবং চন্দ্র সদয় হয়ে তার মুখে অমৃতবর্ষী অঙ্গুলি প্রদান করেন। তোমরা এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর। তোমরা সমধর্মা ও সমচরিত্র, এই কন্যাও অভিন্ন হৃদয়ে তোমাদের পত্নী হবেন। এরপর প্রচেতারা ভগবানের স্তব করলে তিনি প্রস্থান করলেন।

তারপর তাঁরা সমুদ্রের জল থেকে উঠে দেখলেন যে বৃক্ষরাজি উন্নত হয়ে স্বর্গ রোধ করতে উদ্যত। বৃক্ষেই সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন দেখে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে তরুলতা শূন্য করবার জন্য মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ু পরিত্যাগ করলেন। বৃক্ষ ভস্মীভূত হচ্ছে দেখে ব্রহ্মা এসে তাঁদের শান্ত করলেন। যে সব বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে সেই কন্যাটি প্রচেতাদের সম্প্রদান করল। প্রচেতারা বৃক্ষের পালিতা মারিষা নামের এই কন্যাকে বিবাহ করলেন। ব্রহ্মার পুত্র হয়েও মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য দক্ষ এই কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই দক্ষই প্রজা সৃষ্টি করেন। কর্মের অনুষ্ঠানে দক্ষতার জন্যই এঁর দক্ষ নাম হয়।

বহু সহস্র বৎসর অতীত হবার পর প্রচেতাদের বিবেক জ্ঞান জাগ্রত হল। তাঁরা তখন সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্রের উপকূলে জাজলি ঋষির সিদ্ধাশ্রমে এসে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। একদিন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, শিব ও বিষ্ণু আমাদের যে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন, সংসারে আসক্ত হয়ে আমরা তা ভুলে গেছি। আমরা যাতে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপদেশ আপনি দিন।

নারদ বললেন, যার দ্বারা হরির আরাধনা হয়,' মানুষের সেই জন্ম কর্ম আয়ু মন ও বাক্যই সার্থক। হরিই সর্বভূতের আত্মা, আর জীবের হৃদয়স্থ আত্মা সবারই প্রিয়। হরির অর্চনাতেই সমস্ত দেবতার পূজা হয়। এই জগৎ হরি থেকে উদ্ভূত হয়ে হরিতেই লয় হয়। সর্বভূতে দয়া, যথা লাভে সন্তোষ এবং ইন্দ্রিয় সংযম করেই হরিকে অতি শীঘ্র প্রসন্ন করা যায়। হৃদয় থেকে সব রকম কামনা বাসনা দূর হলে হরি আর তা ত্যাগ করেন না। ভক্তির রসেই ভগবান তৃপ্ত হন। বিদ্যা ধন কুল ও যজ্ঞাদি কর্মের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যে অন্যের প্রতি অসৎ ব্যবহার করে, ভগবান তার পূজায় সন্তুষ্ট হন না। তিনি ভক্তের অধীন। এই উপদেশ দিয়ে নারদ ব্রহ্মলোকে গেলেন। প্রচেতারাও এই ভাবে ধ্যান করে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হলেন।

পরীক্ষিৎকে শুক বললেন, মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশাবলী আপনাকে বললাম, এইবারে প্রিয়ব্রতের কথা বলছি। তিনি নারদের নিকটে পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে কিছুকাল রাজ্যসুখ ভোগ করবার পর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য সম্পদ ভাগ করে দিয়ে ভগবৎ পদ লাভ করেন। এরপর বিদুর মৈত্রেয়কে প্রণাম করে হস্তিনাপুরে এলেন।

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রিয়ব্রত চরিত

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, রাজা প্রিয়ব্রত আত্মতত্ত্ববিদ হয়েও কেন গৃহে আসক্ত হয়েছিলেন ?

শুক বললেন, রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যখন নারদের নিকটে আত্মতত্ত্ব অবগত হয়ে অধ্যাত্ম চিন্তায় দীক্ষা গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন, তখন তাঁর পিতা মনু তাঁকে পৃথিবী পালনের ভার নেবার নির্দেশ দেন। রাজপদ গ্রহণ করলে মিথ্যা রাজ্য প্রপঞ্চ থেকে আত্মার পরাভব হবে বিচার করে তিনি পিতার আদেশ মানতে রাজী হন নি। ব্রহ্মা সকল প্রাণীর অভিপ্রায় অবগত ছিলেন বলে গন্ধমাদন পর্বতে অবতরণ করলেন। নারদ তাঁকে উপস্থিত দেখে মনু ও প্রিয়ব্রতকে নিয়ে তাঁকে স্বাগত বন্দনা জানালেন। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে বললেন, জগতের কোন দেহধারী জীব তপস্যা বিদ্যাযোগবল বুদ্ধি অর্থ বা ধর্ম দিয়ে নিজে বা অন্যের সাহায্য নিয়ে হরির কৃত কার্যের বিনাশে সক্ষম নয়। জীবরা তাঁরই বিধানে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য উপযুক্ত শরীর ধারণ করছে। গবাদি পশুর মতো আমরা নাকে দড়ি নিয়ে তাঁরই ইচ্ছামতো কর্ম করছি। সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে যদি কেউ চলে যায় তাহলেও তার নিস্তার নেই, ইন্দ্রিয়গুলি তার সঙ্গে থাকে। আবার জিতেন্দ্রিয় হয়ে সংসারে থাকলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। দুর্গে থেকে শত্রু জয় করেই যথেচ্ছ বিচরণ করা উচিত। এখন তুমি সংসার ভোগ কর, পরে তুমি সঙ্গ ত্যাগ করে আত্মনিষ্ঠ হয়ো। ব্রহ্মার এই উপদেশ প্রিয়ব্রত মেনে নিতেই তিনি অন্তর্ধান হলেন। মনু তাঁকে পৃথিবী পালনের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে গৃহের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

প্রিয়ব্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর পাণিগ্রহণ করেন। আগ্নীধ্র ইধ্মজিহ্ব যজ্ঞবাহু মহাবীর হিরণ্যরেতা ঘৃতপৃষ্ঠ সবন মেধাতিথি বীতহোত্র ও কবি এই নামে দশটি পুত্র ও উর্জস্বতী নামে একটি কন্যা লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে মহাবীর সবন ও কবি এই তিনজন বাল্যকালেই অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। প্রিয়ব্রতের অন্য পত্নীর গর্ভে উত্তম তামস ও রৈবত নামে তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত এগারো অর্বুদ বৎসর রাজত্ব ভোগ করেছিলেন। সূর্য সুমেরু পর্বত পরিক্রমার সময়ে পৃথিবীর অর্ধাংশ আলোকিত করেন ও অপর অর্ধাংশ অন্ধকারে রাখেন বলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে অলৌকিক প্রভাবে 'রাত্রিকেও দিন করব' এই সংকল্প নিয়ে বেগবান রথে সূর্যের পিছনে সাতবার পরিভ্রমণ করতেন। তাঁরই রথচক্রে সাতটি খাত হয়ে সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং তাতেই সাতটি দ্বীপ রচিত হয়েছে। এইসব দ্বীপের নাম জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর দ্বীপ। এদের একটির চেয়ে পরেরটির আয়তন দ্বিগুণ। সমুদ্রগুলি লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও শুদ্ধ জলে পূর্ণ। এঁদের আয়তনও দ্বীপেরই সমান। প্রিয়ব্রত তাঁর অনুগত পুত্রদের এক একটি দ্বীপের রাজা করেছিলেন। কন্যা উর্জস্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন শুক্রাচার্যের সঙ্গে, দেবযানী নামে তাঁর একটি কন্যা জন্মেছিল।

একদিন তিনি আত্মাকে অশান্ত মনে করে বিষয়-বৈরাগ্যগ্রস্ত চিত্তে ভাবলেন, আমি গুরুতর অন্যায় করেছি। নারীর হাতে বানর হয়ে আমি কাল যাপন করেছি। বিষয়ভোগে আর আমার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে তিনি পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে নারদের উপদিষ্ট পথের অনুসরণ করেছিলেন।

আগ্নীধ্র চরিত

শুক বললেন, প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র ধর্ম বিচার অনুসারেই জম্বু দ্বীপের প্রজাপালন করছিলেন। এক সময়ে তিনি পুত্র লাভের জন্য মন্দর পর্বতের গুহায় তপস্যারত হয়ে ব্রহ্মার আরাধনা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তা জানতে পেরে নিজের সভার গায়িকা পূর্বচিত্তি নামে অপ্সরাকে আগ্নীধ্রের নিকটে পাঠালেন। অপ্সরা এসে আগ্নীধ্রের আশ্রমের মনোরম উপবনে পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর পায়ের অলঙ্কারের শব্দে আগ্নীধ্র চোখ মেলে তাঁকে দেখতে পেলেন। অপ্সরা রাজার নিকটেই ভ্রমরীর মতো ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করে নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক ভঙ্গিতে কন্দর্পের প্রবেশদ্বার নির্মাণ করছিলেন। তাঁর নিঃশ্বাসের সৌরভে ভ্রমরেরা অবরোধ সৃষ্টি করলে পলায়নের জন্য পদক্ষেপ করতেই তাঁর কেশচন্দন কুচযুগল ও নিতম্বের চন্দ্রহার কেঁপে উঠল। আগ্নীধ্র তাঁকে এই অবস্থায় দেখতেই কামদেবের সুযোগ উপস্থিত হল। কামের বশীভূত হয়ে রাজা তাঁকে বশ করবার জন্য জড় ব্যক্তির মতো বললেন, হে মুনিবর, তুমি কে? এখানে তুমি কী করতে চাও? তুমি ভগবানের কোন মায়া নও তো!

রমণীদের অনুনয়ে নিপুণ রাজা গ্রাম্য রসিকতায় সেই অপ্সরাকে অভ্যর্থনা করে নিজের প্রতি প্রসন্ন করেছিলেন। অপ্সরা পূর্বচিত্তি রাজার বুদ্ধি চরিত্র রূপ বিদ্যা যৌবন সম্পদ ও উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে বহুকাল পার্থিব সুখ উপভোগ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে নাভি কিম্পুরুষ হরি ইলাবৃত রম্যক হিরণ্ময় কুরু ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। প্রতি বৎসর একটি করে পুত্র প্রসব করে তাদের রেখে পূর্বচিত্তি ব্রহ্মার কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সভায় সঙ্গীতের কাজে প্রবৃত্ত হন। যথাকালে আগ্নীধ্র জম্বু দ্বীপকে নয় ভাগে বিভক্ত করে তাঁর নয় পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্ররা নিজেদের নামে এই নয়টি বর্ষে রাজত্ব করেন। এঁরা মেরুর

নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের নাম মেরুদেবী প্রতিরূপা উগ্রদংষ্ট্রী লতা রম্যা শ্যামা নারী ভদ্রা ও দেবদীখিতি।

আগ্নীধ্র বিষয়ভোগ করেও তৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি নিরন্তর সেই অপ্সরার কথা চিন্তার জন্য দেহান্তে অপ্সরাদের লোকেই গিয়েছিলেন। পিতৃগণ সেখানে সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন।

ঋষভদেব চরিত

শুক বললেন, রাজা নাভি তাঁর নিঃসন্তান পত্নী মেরুদেবীর সহিত সন্তান লাভের জন্য যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তিনি যখন যজ্ঞ কর্মে রত তখন ভগবান নিজ মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁকে সমাদরে পূজা করলেন। ঋত্বিকরা তাঁর স্তব করে বললেন, রাজর্ষি নাভি আপনার তুল্য একটি সন্তান লাভের জন্য আপনার শরণাগত হয়েছেন। ভগবান বললেন, তোমরা আমার তুল্য পুত্রের বর চাইছ। কিন্তু আমি অদ্বিতীয় বলে জগতে আমার তুল্য এক 'আমিই আছি। কাজেই আমিই মহারাজ নাভির মধ্যে অংশত অবতীর্ণ হব। তিনি এই কথা মেরুদেবীর শ্রুতিগোচরে বলেই অন্তর্হিত হলেন। তিনিই নাভির অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নাভি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন ঋষভ। একবার ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে বৃষ্টিপাত না করলে ঋষভদেব তা জেনে সহাস্যে যোগবলে বৃষ্টিপাত করিয়েছিলেন। তাঁর এই পুত্রের প্রতি প্রজাদের অনুরাগ জানতে পেরে নাভি তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে মেরুদেবীর সঙ্গে বদরিকাশ্রমে গেলেন। সেখানে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে বাসুদেবের আরাধনা করে জীবন্মুক্তি লাভ করলেন।

ঋষভদেব নিজের রাজ্যকে কর্মক্ষেত্র জ্ঞান করে গুরুকুলে বাসের পর বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রদত্ত জয়ন্তী নামের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের একশোটি

পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রদের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ, তাঁরই নামে ভারতবর্ষ নাম হয়েছে। ভরতের পর কুশার্বত ইলার্বত ব্রহ্মার্বত মলয় কেতু ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃক বিদর্ভ ও কীকট নামে নয়জন পুত্র প্রধান হয়েছিলেন। এঁদের পরে কবি হরি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রুমিল চমন ও করভাজন এই নয়জন ভাগবত ধর্মের উপদেশক হয়েছিলেন। বাকি একাশীটি পুত্র কর্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

ঋষভদেব একবার দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ব্রহ্মাবর্তে পৌঁছে প্রজাদের সামনে নিজে পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তপস্যা করা সকলের উচিত, তাতে চিত্তশুদ্ধি ও অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। মনীষিরা মহতের সেবাকে মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গ নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করেন। যাঁরা সদাচার সম্পন্ন সর্বত্র সমচিত্ত প্রশান্ত স্বভাব ক্রোধবর্জিত ও সকল প্রাণীর সুহৃৎ, মহৎ তাঁরাই।

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৫।৫।২

পূর্বজন্মের যে পাপের জন্য এই অনিত্য দেহের উৎপত্তি হয়েছে, এ জন্মে পুনরায় তা করা সমীচীন নয়। জীব যতদিন আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু না হয়, ততদিন অজ্ঞানতার জন্য তার স্বরূপের পরাভব ঘটে। বাসুদেবের প্রতি প্রীতি না জন্মালে দেহবন্ধন থেকে মুক্তি নেই। স্ত্রী-পুরুষের যুগল ভাবকে পরস্পরের একটি স্থূল ও দুশ্ছেদ্য হৃদয়গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে। এই ভাব থেকে 'আমি ও আমার' এই মোহ জন্মায়। এই অহঙ্কার গ্রন্থিটি শিথিল হলেই জীব মুক্ত হয়ে পরম পদ লাভ করে। যিনি সংসারীকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়ে মুক্ত না করেন, তিনি গুরু নন, স্বজন নন, পিতামাতা পতিও নন, দেবতাও নন। তোমরা মাৎসর্য ত্যাগ করে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভরতের সেবা কর, তাতেই তোমাদের পিতৃসেবা ও প্রজাপালন সিদ্ধ হবে। এই বলে ঋষভ-দেব পৃথিবী পালনের জন্য ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করে ব্রহ্মাবর্ত

থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে উন্মত্তের মতো নগ্ন হয়ে বহির্গত হলেন। তিনি মৌনব্রত গ্রহণ করে প্রব্রজ্যার সময় দুর্জন কর্তৃক নানা ভাবে উৎপীড়িত হয়েও তা অগ্রাহ্য করে একাকী পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই অবস্থায় লোকেরা তাঁর যোগের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে দেখে তিনি অজগরব্রত অবলম্বন করলেন। নিজের দেহ ত্যাগের ইচ্ছায় যোগীদের দেহত্যাগের প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্য নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখে আত্মার অভিমান ত্যাগ করেছিলেন। এই ভাবে তিনি কোঙ্ক বেঙ্কট কুটক ও দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে উপস্থিত হয়ে কুটকাচলের উপবনে মুখে একটি পাথর নিয়ে উন্মাদের মতো মুক্ত কেশ ও নগ্ন বেশে বিচরণ করতে লাগলেন। বায়ুবেগে বাঁশ গাছের সংঘর্ষে দাবানল উৎপন্ন হয়ে সেই বনের সঙ্গে ঋষভদেবকেও ভস্মীভূত করল।

কলিযুগে অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে কোক বেঙ্কট ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ লোক পরম্পরায় ঋষভদেবের এই আশ্রমাতীত আচরণের কথা শুনবেন। পূর্বজন্মের পাপে মোহিত হয়ে তিনি ঐ আচরণ ধর্ম মনে করে শিক্ষা করবেন এবং লোকসমাজে একটি বেদ বিরোধী ও নিকৃষ্ট কুমার্গের প্রবর্তন করবেন।

ভরতের উপাখ্যান

শুক বললেন, ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাদের নাম সুমতি রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন আবরণ ও ধূম্রকেতু। তাঁর সময় থেকেই এই দেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়েছে। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে বাৎসল্য সহকারে প্রজা পালন করেছিলেন। বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে তাঁর চিত্ত বিশুদ্ধ হলে ভগবান বাসুদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রবল হয়েছিল। সহস্র অযুত বৎসর রাজত্ব ভোগের পর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে পুলহাশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গণ্ডকী নদী দুই ভাগে

এই স্থানকে পবিত্র করছে। আশ্রমের উপবনে একাকী বাস করে ভগবানের আরাধনায় তিনি শান্তিলাভ করেছিলেন।

একদিন তিনি গণ্ডকীতে স্নান করে প্রণব মন্ত্র জপের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। সেই সময়ে একটি হরিণী জলপানের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। যখন সে জলপান করতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই সময়ে একটি সিংহের গর্জন শোনা গেল। সিংহের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে সেই হরিণী যেই নদী উত্তীর্ণ হবার জন্য লাফ দিল, তখন তার গর্ভস্থ শাবক স্থানচ্যুত হয়ে স্রোতে পড়ল এবং হরিণী পর্বতের এক গুহায় পড়ে প্রাণত্যাগ করল। হরিণ-শিশুটি জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে রাজর্ষি ভরত দয়াপরবশ হয়ে বন্ধুর মতো তাকে জল থেকে তুলে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন। তার পরেই তার জন্য তাঁর অতিশয় মমতাবোধ জাগ্রত হল। তিনি তার পোষণের জন্য তৃণাদি সংগ্রহ করে, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং তার গা চুলকে তাকে চুমু খেয়ে তার লালনে এমনি আসক্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর নিজের স্নানাদি নিয়ম, ভগবানের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়া এক একটি করে বিচ্যুত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত লুপ্ত হল। ভাবলেন যে কালচক্রে এই হরিণ-শিশু সবাইকে হারিয়ে তাঁর কাছে এসেছে এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই চেনে না। কাজেই নিজের স্বার্থহানির কথা বিচার না করে এর লালন-পালন করাই কর্তব্য। এই ভাবে আসক্ত যুক্ত হলে তাঁর হৃদয় সেই মৃগশিশুর সঙ্গে নিবিড় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হল। ফলমূলাদি সংগ্রহে বনে যাবার সময় তিনি নেকড়ে বাঘ ও বুনো কুকুরের ভয়ের কথা ভেবে হরিণ-শিশুকে সঙ্গে নিয়েই বনে যেতেন। পথ চলতে তার অসুবিধা হলে তিনি তাকে কাঁধে বহন করতেন। কখনও তাকে দেখতে না পেলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হতেন। মুক্তির প্রতিকূল বলে যিনি নিজের সন্তানদের ত্যাগ করে এসেছিলেন, তিনিই এই হরিণ-শিশুর প্রতি নিজের পুত্রের মতো আসক্ত হয়ে উঠলেন। এই বিঘ্নে যোগানুষ্ঠানের বাধা ঘটলে

রাজর্ষি ভরত আত্মচিন্তায় বিমুখ হয়ে সেই হরিণ-শিশুরই লালন-পালনে মনোযোগী হলেন। তারপর সেই দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যুকাল তীব্রবেগে তাঁর নিকটে উপস্থিত হল। মৃত্যুকালেও তিনি দেখলেন যে হরিণ-শিশুটি পুত্রের মতো তাঁর পাশে থেকে শোক প্রকাশ করছে।

এই ভাবে দেহত্যাগ করে তিনি জন্মান্তরে মৃগদেহ লাভ করলেন এবং পূর্বের দেহ নষ্ট হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হল না। তিনি অনুতপ্ত চিত্তে ভাবলেন যে একটি মৃগশিশুর জন্য তিনি ভগবানের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। মনে এই খেদ উপস্থিত হতেই তিনি মাকে পরিত্যাগ করে কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় হরিক্ষেত্র শালগ্রামে অবস্থিত নিবৃত্তিপরায়ণ মুনিদের প্রিয় বাসস্থান পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করেছিলেন। সেখানেও তিনি সঙ্গের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং শুষ্কপত্র ও তৃণলতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। যথাকালে তীর্থের জলে অর্ধনিমগ্ন থেকে মৃগদেহ ত্যাগ করেছিলেন।

পরজন্মে ভরত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। পৌরাণিকদের মতে এটি তার শেষ জন্ম। আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁর জন্ম। এ জন্মেও তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকায় স্বজনের সঙ্গবশে পুনরায় আত্মার অধোগতির আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন এবং ভগবানের কথা স্মরণ শ্রবণ ও গুণকীর্তনে জীবের কর্মবন্ধন খণ্ডন হয় বলে হৃদয়ে তা ধ্যান করে লোকসমাজে জড় উন্মত্ত অন্ধ বা বধির রূপে নিজেকে প্রকাশ করতেন। পুত্রস্নেহে ব্রাহ্মণ তাঁরও সমাবর্তন পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কার শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করেছিলেন এবং উপনয়নের পর পালনীয় সমস্ত নিয়মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার শিক্ষাদানের আগ্রহ নিবৃত্ত করবার জন্য তাঁর নিকটেও তিনি অসমীচীনের ন্যায় আচরণ প্রকাশ করেন। বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতেও তিনি বেদ পড়াতে আরম্ভ করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী নিজের পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীকে অর্পণ করে সহমরণে পতিলোকে গমন করলেন।

ভরতের ভাইরা ভরতকে জড়বুদ্ধি মনে করে তাঁর শিক্ষাদান থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। কেউ তাকে উন্মত্ত জড় মূক বা বধির বলে সম্ভাষণ করলে তিনিও সেই ভাবে শব্দ করতেন। পরের ইচ্ছায় তিনি কাজ করতেন। সবেতন বা বিনা বেতনে কাজ করে, অথবা যাচ্ঞা বা দৈবক্রমে যে অন্ন পেতেন তা অল্প বা অধিক, উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট তা বিচার না করেই আহার করতেন। ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কিছু করতেন না। তাঁর দেহ পুষ্ট ও অঙ্গ দৃঢ় ছিল। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও ঝঞ্ঝাবাতের সময়েও তিনি বৃষের ন্যায় অনাবৃত থাকতেন, কটিদেশে থাকত ছিন্ন মলিন বস্ত্র। তিনি ভূতলে শয়ন করতেন, তৈল ও স্নানের অভাবে তাঁর দেহ ধূলিতে আচ্ছন্ন থাকত। শুধু গলায় মলিন উপবীত থাকায় লোকে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বুঝতে পারত। তাঁর ভাইরা আহারের লোভ দেখিয়ে তাঁকে শালিধানের ক্ষেতে কাজে নিযুক্ত করলে তিনি তাও করতেন। আহার্য রূপে তাঁকে যা দেওয়া হত তিনি তাই অমৃতের মতো মনে করে খেতেন।

এক সময়ে এক শূদ্র সামন্ত চৌর রাজা পুত্র কামনায় ভদ্রকালী দেবীর নিকটে নরপশু বলি দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আবদ্ধ নরপশুটি দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করলে তার অনুচর চোরেরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রির মধ্য ভাগে সেই পশুর অনুসন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু তাকে না পেয়ে এক স্থানে মৃগ শূকর প্রভৃতির হাত থেকে ক্ষেত্র রক্ষায় উপবিষ্ট ভরতকে দেখতে পায়। চোররা তাকেই সুলক্ষণ-যুক্ত দেখে রজ্জুতে বন্ধন করে চণ্ডিকার মন্দিরে নিয়ে আসে। নিজেদের নিয়ম অনুসারে তাকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্রে আচ্ছাদন করে অলঙ্কার মালা ও তিলকে ভূষিত করে ভোজন করাল এবং ধূপ দীপ লাজ ও ফল প্রভৃতি উপহার দিল। তারপর হিংসা কালের বিধান অনুসারে গীত স্তব ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের ধ্বনি সহকারে তাকে ভদ্রকালীর সামনে এনে বসিয়ে রাখল। এরপর সেই শূদ্র রাজের পুরোহিত একজন চোর নরপশুর রক্তে ভদ্রকালীর পূজার জন্য করাল অসি

উত্তোলন করল। এই সময়ে দেবী ভদ্রকালী স্বয়ং প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এসে পাপাত্মা শূদ্র চোরদের মধ্যে এসে খড়্গে তাদের মস্তক ছেদন করলেন। মহাপুরুষদের প্রতি এ জাতীয় মারণাত্মক অপরাধ করতে গেলে তার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরেই পড়ে।

একদিন সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ শিবিকায় আরোহণ করে কপিল মুনির আশ্রমে যাচ্ছিলেন। ইক্ষুমতী নদীর তীরে এসে বাহকদের নেতা বাহক অন্বেষণ করতে গিয়ে দৈবাৎ ভরতকে দেখে এই পুষ্ট দৃঢ়াঙ্গ যুবককে গর্দভের মতো ভারবহনে সমর্থ ভাবল। সে বলপূর্বক ভরতকে নিযুক্ত করলে তিনি শিবিকা বহন করতে লাগলেন। কিন্তু পায়ের আঘাতে যাতে কোন প্রাণী হিংসা না হয় সেজন্য চার হাত দৃষ্টি রেখে চলছিলেন বলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর গতির বৈষম্য ঘটছিল। এই অসমান গতি লক্ষ্য করে রাজা রহূগণ বাহকদের বললেন, ঠিক ভাবে চল। দণ্ডের ভয়ে বাহকরা বলল, নতুন লোকটি দ্রুতগামী নয়। রাজা তাঁকে ব্যঙ্গ করে বললেন, কী কষ্ট! তোমার শরীর পুষ্ট নয়, অঙ্গ দৃঢ় নয়, তার ওপর জরায় আক্রান্ত। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তুমি বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছ দেখছি! রাজার এই তিরস্কারেও ভরত মৌন হয়ে শিবিকা বহন করতে লাগলেন। কিন্তু পুনরায় গতির বৈষম্য ঘটলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি কি জীবন্মৃত? তোমার উপযুক্ত চিকিৎসার দরকার দেখছি। এর পরেও রাজা অনেক অসংলগ্ন কথা বললেন। সব শুনে হেসে বললেন, আপনি কাকে ভার বলছেন? আর এই ভার বহন করে কে শ্রান্ত হয়? দেহের আকার কারও দোষ না গুণ? জরাই বা কী? আর জীবন্মৃত্যু হয় কার? দণ্ডই বা কে কাকে দেয়? বলে তিনি আগের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

রাজা রহূগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করেছিলেন বলে তাঁর রাজার অভিমান দূর হল। তিনি শিবিকা থেকে নেমে ভরতকে প্রণাম করে বললেন, আপনার গলায় যজ্ঞ সূত্র, আপনি কে এমন

ভাবে বিচরণ করছেন ? আপনি দত্তাত্রেয় বা কপিল মুনি নন তো ? আমি ইন্দ্রের বজ্রের ভয় করি না, মহাদেবের শূলের ভয়ও না। তেমনি যমরাজের দণ্ডের ভয়ও আমার নেই। আমি ব্রাহ্মণকে অবমাননা করার অপরাধকে ভয় পাই। আপনি জড়ের মতো আচরণ করছেন, অথচ যোগতত্ত্ব মূলক যে সব কথা বললেন তার রহস্যভেদে আমি সমর্থ নই। এই সংসারে আশ্রয় কী, এই কথা জানবার জন্য আমি আমার গুরু কপিলের নিকটে যাচ্ছি। আপনিই কি ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছেন ? ব্যবহারিক জগতে আমরা দেখতে পাই যে কর্ম থেকে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহেরও স্থূল প্রভৃতি আকার আছে। আবার প্রজা শাসন রাজার স্বধর্ম এবং তাতেই তার ভগবানের আরাধনা। আপনার কথায় আমার চিত্তে গুরুতর সংশয় উপস্থিত হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনি কোন মহাপুরুষ, লোক শিক্ষার জন্য এই হীন বেশে বিচরণ করছেন।

ভরত বললেন, মহারাজ, স্বামী ভৃত্যের সম্বন্ধ ও দণ্ডাদি লৌকিক ব্যবহার নিত্য সত্য নয়। মানুষের মন গুণ-কর্মে বদ্ধ হয়েই তাপ-মোহাদির সৃষ্টি করে, তাকে প্রশ্রয় দিলে বা উপেক্ষা করলে আত্মা বিপন্ন হতে পারে। এই প্রপঞ্চ ভগবানেরই মায়া, তিনি ছাড়া আর সব কিছুই অবাস্তব। যতকাল মনের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক থাকে, ততকালই সর্বদা জাগ্রত ও স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশিত হয়ে জীবের প্রত্যক্ষ হয়। মায়ায় রচিত অবিশুদ্ধ মনই জীবের উপাধি স্বরূপ এবং সমস্ত ব্যাপারের কর্তা। মনের বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান। জীব মনের এই বৃত্তিকে জাগ্রত ও স্বপ্ন দশায় আবির্ভূত ও নিদ্রিত অবস্থায় তিরোহিত দেখে। জীব এ সবের সাক্ষীমাত্র। এই জীবই তত্ত্ব পদার্থ। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, অপরোক্ষ এবং তিনিই সমস্ত জীবের আশ্রয় ও সকলেরই নিয়ামকরূপে বিরাজ করছেন। যতদিন জীব আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততদিন সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। এক সময়ে আমি ভরত নামে রাজা ছিলাম। সমস্ত বিষয় বন্ধন থেকে

মুক্ত হয়ে আমি যখন ভগবানের আরাধনা করছিলাম, তখন একটি মৃগশিশুর সংস্পর্শে এসে পরজন্মে আমাকে মৃগ হতে হয়। এতেই আমার পরমার্থের ব্যাঘাত হয়েছে। মৃগজন্মেও আমার পূর্ব স্মৃতি ছিল বলে আমি জনসঙ্গে ভীত হয়ে আত্মগোপন করে ভ্রমণ করি। বণিক যেমন অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নানা স্থানে ভ্রমণ করতে বনের মধ্যে বিপত্তি ভোগ করে, তেমনি জীবও সুখের আশায় মায়ায় পরিচালিত হয়ে এই সংসারে অরণ্যে নানা দুর্ভোগ ভোগে। আপনি অনাসক্ত চিত্তে হরির সেবা করে সেই জ্ঞানেই এই অরণ্য অতিক্রম করুন। এই বলে ভরত পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন এবং তাঁর কথা শুনে রহূগণ আত্মতত্ত্বের উপদেশ লাভ করে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করলেন।

শুক বললেন, ভরতের সুমতি নামে এক পুত্র ছিলেন। কলিযুগে কিছু অনার্য পাষণ্ড লোক নিজেব পাপ বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে ঋষভ দেবের মার্গ অনুসারী অবৈদিক দেবতা ভাববে। এই বংশেই উদাব কীর্তি রাজর্ষি গয়ের জন্ম হয। তিনি বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি লক্ষণে মহাপুরুষত্ব লাভ করেছিলেন। প্রিয়ব্রত বংশের শেষ রাজা বিরজ।

ভূমণ্ডল স্বর্গ ও পাতালের বর্ণনা

পরীক্ষিৎ বললেন, আপনি এই ভূমণ্ডলের বর্ণনা করুন।

শুক বললেন, আমি আপনাকে প্রধান প্রধান স্থানের কথা বলছি। এই ভূমণ্ডল একটি পদ্মের মতো। সাতটি দ্বীপ যেন এর কোষ। জম্বু দ্বীপ এর অভ্যন্তরে। দৈর্ঘ্যে নিযুত যোজন এবং লক্ষ যোজন এর বিস্তার। আকার পদ্ম পত্রের মতো বর্তুল। এই দ্বীপে নয়টি বর্ষ আছে। এদের সীমানায় নয়টি পর্বত এবং মধ্য ভাগে ইলাবৃত বর্ষ। তার মধ্য ভাগে মেরু পর্বত পদ্মের বীজ কোষের

স্বরূপ। ইলাবৃত বর্ষের উত্তর দিকে নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান নামের তিনটি পর্বত যথাক্রমে রম্য হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষের সীমা রূপে বিদ্যমান। এরা পূর্ব দিকে দীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিম দুদিকেই লবণ সমুদ্র এদের সীমান্তে অবস্থিত। ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণ দিকে নিষধ হেমকূট ও হিমালয় এই তিনটি পর্বত নীল প্রভৃতি পর্বতের ন্যায় পূর্ব দিকেই দীর্ঘ। এরা যথাক্রমে হরিবর্ষ কিম্পুরুষ বর্ষ ও ভারতবর্ষের সীমা রক্ষা করছে। ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত, উত্তর দিকে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই পর্বত কেতুমাল বর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করছে। মেরু পর্বতের চতুর্দিকে মন্দর মেরু মন্দর সুপার্শ্ব ও কুমুদ পর্বত। পূর্ব দিকে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিমে পবন ও পারিযাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামে দুটি করে পর্বত আছে। মেরুর শৃঙ্গ দেশে ব্রহ্মার পুরী। তার চতুর্দিকে ও চতুষ্কোণে ইন্দ্রাদি অষ্টলোক পালের আটটি পুরী।

বলির যজ্ঞে বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর পাদপ্রক্ষালনের জল ধারা বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত হয়। এর দীর্ঘকাল পরে তিনি মূল স্থান থেকে স্বর্গের মস্তকে অবতীর্ণ হন। গঙ্গার সেই অবতরণ ক্ষেত্রের নাম বিষ্ণুপদ। এর পর তিনি মেরু পর্বতে ব্রহ্মার আবাসে পতিত হন। এখানেই তিনি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে সীতা অলকানন্দা বঙ্‌ক্ষু ও ভদ্রা এই চার নামে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন। সীতা ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকের সমুদ্রে, বঙ্‌ক্ষু কেতুমাল বর্ষের দিকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকের সমুদ্রে, ভদ্রা উত্তর কুরুবর্ষের নিকট দিয়ে উত্তর দিকের সমুদ্রে এবং অলকানন্দা দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দক্ষিণের সমুদ্রে পড়েছেন। ভারতবর্ষই কর্মক্ষেত্র, অপর আটটি বর্ষ স্বর্গত লোকের স্বর্গ ভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্য ভোগের স্থান। বিষয় সুখের উৎকর্ষের জন্য তাকে

পার্থিব স্বর্গ বলে। ইলাবৃত বর্ষে একমাত্র পুরুষ শিব। সেখানে পুরুষ গেলে স্ত্রী ভাব প্রাপ্ত হবে, ভবানীর এই সাপের তত্ত্ব জেনে কোন পুরুষ সেখানে যায় না। এই বর্ষে ভগবানের সঙ্কর্ষণ রূপের উপাসনা হয়। ভদ্রাশ্ববর্ষে ধর্মের পুত্র ভদ্রশ্রবা অধিপতি এবং তাঁরা ভগবানের প্রিয় মূর্তি হয়শীর্ষ দেবের উপাসনা করেন। হরিবর্ষে বিষ্ণু নৃসিংহ রূপে বিরাজ করছেন। কেতুমাল বর্ষে তিনি কামদেব রূপে বিরাজমান। যে মৎস্য মূর্তিতে তিনি মনুর দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন, রম্যকবর্ষে তিনি মনুর নিকটে সেই মূতিতেই আরাধিত। হিরণ্ময় বর্ষে তিনি কূর্ম মূর্তি ধারণ করে বিরাজমান আছেন। কুরুবর্ষে তিনি যজ্ঞপুরুষ বরাহ মূর্তিধারী। কিম্পুরুষবর্ষে হনুমান সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে রামের উপাসনা করেন। ভারতবর্ষে ভগবান নরনারায়ণ রূপে তপস্যায় নিরত আছেন। এখানেও অনেক নদী ও পর্বত আছে। কর্মানুসারে মানুষের গতি হয়। সগরের পুত্ররা যখন জম্বুদ্বীপ খনন করেছিলেন, তখন আটটি উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের নাম স্বর্ণপ্রস্থ চন্দ্রশুক্র আবর্তন রমনক মন্দহরিণ পাঞ্চজন্য সিংহল ও লঙ্কা।

জম্বুদ্বীপের লবণ সমুদ্র বেষ্টন করে আছে প্লক্ষ দ্বীপ। একটি প্লক্ষ বা পাকুড় গাছের জন্যই এই দ্বীপের নাম হয়েছে প্লক্ষ দ্বীপ। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। প্রজারা সূর্যের উপাসনা করেন। শাল্মল দ্বীপ সুরা সমুদ্রে বেষ্টিত। একটি শাল্মলী বৃক্ষের জন্য এই নাম হয়েছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু এই দ্বীপের অধিপতি। প্রজারা সোমদেবের আরাধনা করেন। সুরা সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশ দ্বীপ ঘৃতোদক সমুদ্রে বেষ্টিত। বিশাল কুশগুচ্ছের জন্যই এই নাম। প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। প্রজারা অগ্নিরূপী ভগবানের পূজা করেন। ঘৃতোদক সমুদ্রের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্বতের অবস্থানের জন্য এই নাম হয়েছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই

দ্বীপের অধিপতি। প্রজারা এখানে জলময় ভগবানের পূজা করেন। ক্ষীরোদ সমুদ্রের চতুর্দিকে শাক দ্বীপ দধি সমুদ্রে বেষ্টিত। শাক নামে এক বৃক্ষের জন্য এই দ্বীপের শাক দ্বীপ নাম হয়েছে। বৃক্ষের মনোরম সৌরভে সমগ্র দ্বীপ সুবাসিত। প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। প্রজারা এখানে বায়ুরূপী ভগবানের পূজা করেন। দধি সমুদ্রের চতুর্দিকে পুষ্কর দ্বীপ স্বাদু জলের সমুদ্রে বেষ্টিত। একটি বৃহৎ পদ্মফুলের জন্য এই নাম হয়েছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপে রাজত্ব করতেন। প্রজারা ব্রহ্মার রূপধারী ভগবানের আরাধনা করেন। শুদ্ধ জলের সমুদ্রের পরে সূর্যাদির আলোকবিশিষ্ট ও আলোকহীন দুটি দেশ লোক ও অলোক নামে পরিচিত। লোকালোক পর্বত এদের সীমানায়। এই পর্যন্ত লোকের বাস আছে। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য ভাগে অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত। ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডলও সম পরিমাণ। উভয়ের মাঝখানে আকাশ। সূর্য এই আকাশে থেকে রৌদ্রে তপ্ত ও দীপ্তিতে আলোকিত করছেন। তিনি উত্তরায়ণ দক্ষিনায়ন ও বিষুব নামে মন্দ দ্রুত ও সম গতিতে আরোহণ অবরোহণ ও সমান স্থান পেয়ে মকর প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিতে বিচরণ করে দিবা-রাত্রিকে দীর্ঘ হ্রস্ব ও সমান করে থাকেন। সূর্য মেষ ও তুলা রাশিতে থাকলে দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। তিনি যখন বৃষ প্রভৃতি পাঁচ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে রাত্রির পরিমাণ মাসে এক ঘণ্টা করে হ্রাস পায়। তারপর তিনি যখন বৃশ্চিক প্রভৃতি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন ঠিক এর বিপরীত হয়। চন্দ্র প্রভৃতি অন্য গ্রহ ও নক্ষত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে উদিত হয়ে একই সঙ্গে অস্তমিত হন। চন্দ্র সূর্যমণ্ডল থেকে লক্ষ যোজন উপরে অবস্থান করেন। তিনি দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসর, সওয়া দুই দিনে সূর্যের এক মাস এবং সওয়া এক দিনে সূর্যের এক পক্ষ ভোগ করেন। সূর্যের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্ররা কালচক্রে

যুক্ত আছে। তাদের সংখ্যা অভিজিতের সঙ্গে আটাশ। এর উপরে শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। তারপর সপ্তর্ষি ও ধ্রুবলোক। সূর্যমণ্ডল থেকে অযুত যোজন নিম্নে রাহু নামে গ্রহ নক্ষত্রের মতো ভ্রমণ করছে। সূর্য ও চন্দ্রের অভিমুখে তার মুহূর্তকাল অবস্থানকে উপরাগ বা গ্রহণ বলে।

পৃথিবীর নিম্ন ভাগেও সাতটি ভূবিবর রচিত হয়েছে। তাদের নাম অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল। ভূতল থেকে অযুত যোজন দূরে অতল। এই ভাবে অযুত যোজন দূরে দূরে এক একটি বিবর অবস্থিত। এই সব ভোগ স্থানে দৈত্য দানব ও নাগ জাতের গৃহস্থের বাস। স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্যশালী, অধিবাসীরা মায়াবলে বিলাস বিস্তার করে। ময় দানব এখানে পুরী নির্মাণ করেছেন। সূর্য ও চন্দ্রের উদয় হয় না বলে এখানে দিন ও রাত্রি নেই, কালের কোন ভয় নেই। অতলে ময় পুত্র বল নামে অসুরের বাস। সে ছিয়ানব্বইটি মায়া আবিষ্কার করেছে। বিতলে মহাদেব হাটকেশ্বর নামে ভবানীর সঙ্গে বিরাজ করছেন। সুতলে বিরোচনের পুত্র বলি এখনও বাস করছেন। তলাতলে ত্রিপুরাধিপতি দানবরাজ ময় বাস করছেন। মহাতলে কদ্রুর সন্তান নাগ জাতির বাস। রসাতলে নিবাত-কবচ প্রভৃতি দৈত্য, কালকেয় দানব, হিরণ্য-পুরবাসী পণি বা অসুররা বাস করে। পাতালে বাসুকি প্রভৃতি নাগ লোকের অধিপতিদের বাস। পাতালের মূলদেশে ত্রিশ হাজার যোজন ব্যবধানে বিষ্ণুর যে কলা অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ, চতুর্ব্যূহ উপাসনায় তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত। সহস্র মস্তক অনন্তের একটি মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধৃত হয়ে আছে। প্রলয়কালে অনন্ত বিশ্বের সংহারে ইচ্ছুক হলে সঙ্কর্ষণ নামে রুদ্র ত্রিশূল উদ্যত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নরকের বর্ণনা

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন, নরক কি কোন দেশ বিশেষ, অথবা তা ত্রিলোকের বাহিরে বা অন্তরালে অবস্থিত?

শুক বললেন, নরক এই ত্রিজগতের অন্তরালে দক্ষিণ দিকে ভূমির নিচে ও জলের উপরিভাগে অবস্থিত। ঐ দিকেই অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃপুরুষেরা সমাধি যোগে নিজেদের বংশধরদের কল্যাণ কামনা করছেন। সূর্যের পুত্র যম ঐ নরকের অধিপতি। তিনি ভগবানের আজ্ঞার অনুবর্তী হয়েই পাত্র মিত্র ও অনুচরদের নিয়ে মৃত প্রাণীদের কর্মদোষ বিচার করে দণ্ড বিধান করেন। কেউ মনে করেন যে নরকের সংখ্যা একুশ। তাদের নাম তামিস্র অন্ধ তামিস্র রৌরব মহারৌরব কুম্ভীপাক কালসূত্র অসিপত্রবন শূকরমুখ অন্ধকূপ কৃমি-ভোজন সন্দংশ তপ্তশূর্মি বজ্রকণ্টক শাল্মলী বৈতরণী পূয়োদ প্রাণরোধ বিশসন লালাভক্ষ সারমেয়াদন অবীচি ও অয়ঃপান। কেউ আরও সাতটি নরক আছে বলেন। তাদের নাম ক্ষারকর্দম রক্ষোগণ ভোজন শূলপ্রোত দন্দশূক অবটনিরোধন পর্যবর্তন ও সূচীমুখ। এই ভাবে যাতনার স্থান আটাশটি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

যে পরের ধন স্ত্রী বা সন্তান অপহরণ করে, সে অন্ধকার তামিস্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যে অপরকে বঞ্চিত করে তার স্ত্রী ও ধনসম্পত্তি উপভোগ করে, তাকে নিক্ষেপ করা হয় অন্ধ তামিস্র নরকে। সেখানে সেই পাপী যন্ত্রণায় অন্ধ হয়ে যায়। যে নিজের শরীরটিকেই আমি ও জগতের সমস্ত সম্পদকে আমার মনে করে নিজের স্ত্রী পুত্র ছাড়া আর সবাইকে পীড়ন করে, সে একাকী রৌরব নরকে পতিত হয়। সে যে প্রাণীকে যে ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছিল, তারা রুরু বা সর্পের চেয়েও ক্রুর এক প্রকার প্রাণী হয়ে তাকে সেই ভাবেই রৌরবে হিংসা করে। যে কেবল নিজের দেহের ভরণ পোষণেই নিরত থাকে, সে মহারৌরবে রুরুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। যারা নিজের পুষ্টির জন্য জীবন্ত পশুপাখি পাক করে, কুম্ভীপাক নরকে

তাদের তপ্ত তেলে পাক করা হয়। ব্রাহ্মণদ্রোহীকে কালসূত্র নরকে দগ্ধ করা হয়। যে বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড মত গ্রহণ করে, তার শাস্তি হয় অসিপত্রবন নরকে। দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে বা ব্রাহ্মণকে দৈহিক দণ্ড দিলে শূকরমুখ নরকে যেতে হয়। ঈশ্বরের বিধানে যে সব প্রাণী মানুষের রক্তপান করে তাদের হিংসা করলে অন্ধকূপ নরকে যেতে হয়। যে কাউকে ভাগ না দিয়ে একাকী ভোজন করে, কৃমিভোজন নরকে তার গতি হয়। যে চুরি বা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সে যায় সন্দংশ নরকে। যমালয়ে এই রকমের শত সহস্র নরক আছে। পাপীদের এইসব নরকে যেতে হয়। ধার্মিকের জন্য স্বর্গে সুখভোগের স্থান আছে। জীব স্বর্গ ও নরক ভোগের পর অবশিষ্ট পাপপুণ্য নিয়ে আবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত

ষষ্ঠ স্কন্ধ

অজামিলের উপাখ্যান

পরীক্ষিত বললেন, মানুষ যাতে যন্ত্রণাময় নরকে না যায় এবারে আপনি সেই কথা বলুন।

শুক বললেন, নরকে যেতে না হলে ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

রাজা বললেন, পাপ করলে রাজদণ্ড ও নরকভোগ হয় জেনেও প্রায়শ্চিত্তের পরেও পাপের বশীভূত হয়ে পুনরায় পাপ করে। প্রায়শ্চিত্ত তো হাতীর স্নানের মতোই নিরর্থক মনে হয়।

শুক বললেন, প্রায়শ্চিত্তে পাপ বিনষ্ট হলেও অবিদ্যার জন্য পাপে প্রবৃত্তি থেকে যায়। তাই জ্ঞান অর্জনই পাপের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভক্তি দিয়েও পাপকে সম্পূর্ণ দূর করা যায়। কৃষ্ণে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে যত পবিত্র হওয়া যায় তপস্যা করেও তত পবিত্র হওয়া যায় না। এর দৃষ্টান্ত রূপে প্রাচীন পণ্ডিতরা বিষ্ণুদূত ও যমদূত সংবাদ নামে যে পুরাতন ইতিহাস বলেন, আপনাকে এবারে তাই বলছি।

কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর সংসর্গে দূষিত হয়ে সদাচারহীন হয়েছিল। পাশা খেলা পণ রাখা বঞ্চনা ও চুরি প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তি আশ্রয় করে সে পরিজন ভরণপোষণ করত। এই ভাবে দাসীর গর্ভজাত নিজের পুত্রদের পালন করতে করতে তার বয়স আটাশি বছর হল। ব্রাহ্মণের দশটি পুত্র হয়েছিল। তার মধ্যে কনিষ্ঠ নারায়ণ পিতামাতার খুব প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ অজামিল এই শিশু পুত্রের প্রতি এমনই আসক্ত হয়েছিল যে মৃত্যুকালেও তার প্রতি মনোনিবেশ করেছিল। তিনজন পুরুষকে পাশ হস্তে নিকটে দেখে

সে দূরে ক্রীড়ারত পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিল। এই মুমুর্ষুর মুখে হরির নাম শুনে বিষ্ণুর দূতেরা এসে উপস্থিত হল। যমদূতেরা যখন হৃদয়ের মধ্যভাগ থেকে অজামিলকে টেনে বার করবার জন্য আকর্ষণ করছিল, তখন বিষ্ণুদূতরা সবলে তাদের বারণ করলেন। যমদূতেরা বলল, আমরা যমরাজের ভৃত্য, তাঁর আজ্ঞায় আমরা কর্তব্য পালন করতে এসেছি, তোমরা বাধা দিচ্ছ কেন? বিষ্ণুদূতরা হেসে বললেন, তোমরা যদি ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ হও, তবে ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ আমাদের বল। সকলেই কি দণ্ড লাভের যোগ্য হয়? যমদূতেরা বলল, বেদবিহিত কাজই ধর্ম এবং বেদে যা নিষিদ্ধ তাই অধর্ম। অধর্ম দণ্ডের বিষয়। জীবমাত্র কর্ম করে এবং কর্মানুসারে সকলেই যথাযোগ্য দণ্ডলাভের যোগ্য হয়। ইহলোকে যে যত অধর্ম বা ধর্মের অনুষ্ঠান করে, পরলোকে সে তার ততটাই ফলভোগ করে। ধর্মরাজ যম সংযমনী পুরীতে থেকেই নিজের মনের দ্বারা জীবের ধর্ম ও অধর্ম জানতে পেরে তার যোগ্য বিচার করেন। এই অজামিল পূর্বে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সকল সদ্‌গুণের আধার ছিল। একদিন পিতার আদেশে বন থেকে ফলমূল সমিধ্‌ প্রভৃতি আহরণ করে ফেরার পথে এক কামুক শূদ্রকে একটি পানমত্ত ভোগ্যা দাসীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় দেখেছিল। অজামিল এই দৃশ্য দেখে সেই দাসীর প্রতি এমনই আকৃষ্ট হয়েছিল যে তার সমস্ত পৈতৃক ধনসম্পত্তি তাকে দিয়ে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করেছিল এবং সেই কুলটার কটাক্ষে মোহিত হয়ে নিজের যুবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিল। তারপর সে ন্যায় ও অন্যায় ভাবে ধন সংগ্রহ করে সেই দাসী পত্নীর কুটম্বকে ভরণপোষণ করত। সারা জীবনে কৃত পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নি বলে আমরা তার যথাযোগ্য দণ্ডের জন্য নিতে এসেছি।

বিষ্ণুদূতরা বললেন, এই অজামিল অবশ অবস্থায় হরির নাম উচ্চারণ করেছে। এতে তার সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয় নি, মোক্ষ পদেরও সাধন হয়েছে। একে তোমরা আর নরকের পথে নিয়ে যেতে

পায় না। পুত্রের নাম বলেই হোক, পরিহাস প্রসঙ্গ গীতালাপ বা অবহেলাতেই হোক, যে কোন কারণে হরির নাম নিলে তা অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। এই ভাবে তাঁরা ভাগবত ধর্ম নিরূপণ করে অজামিলকে যমদূতের পাশমুক্ত করে মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং পরাজিত যমদূতেরা যমরাজের নিকটে গিয়ে সমুদায় ঘটনা নিবেদন করেছিল। অজামিল পাশ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুদূতদের প্রণাম করল। সে কিছু বলতে চায় দেখে তাঁরা তখনই অদৃশ্য হলেন। অজামিল ভাগবত ধর্মের কথা শুনে ভগবানে ভক্তিযুক্ত হল এবং পূর্বকৃত পাপের জন্য তার অনুতাপ হল। সে ভাবল, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম, না জাগ্রত অবস্থাতেই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম! যারা পাশ হাতে আমাকে আকর্ষণ করেছিল, তারা গেল কোথায়! আর যারা আমায় মুক্ত করলেন, সেই মনোহর পুরুষেরাই বা কোথায় গেলেন! আমি এ জন্মে পাপাত্মা হলেও পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই পুণ্য করেছিলাম। সেই পুণ্যবলেই আজ আমার দেব দর্শন হল। এখন থেকে আমি আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে চিত্তে ভগবানকেই ধারণ করব। এইভাবে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় অজামিল সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে হরিদ্বারে গেল। তারপর যোগমার্গ অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে মনকে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করল এবং সেই আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থেকে পৃথক করে চিত্তের একাগ্রতায় সেই আত্মা ভগবানের জ্ঞানময় স্বরূপে যুক্ত করল। তখন আবার তার সামনে সেই চারজন পুরুষকে দেখতে পেয়ে তাঁদের বিষ্ণুদূত বলে চিনতে পেরে প্রণাম করল। তারপর গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করে সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠলোকে গেল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, যমদূতদের কথা শুনে যম কী বলেছিলেন?

শুক বললেন, যমদূতেরা এসে যমকে বলেছিলেন, এই জগতে

জীবের কর্মফল দাতা ও শাসনকর্তা কজন আছেন ? যদি শাসনকর্তা ও দণ্ডধারী অনেক থাকেন তো বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি, এ জগতে একমাত্র আপনিই সকল জীবের অধীশ্বর শাসক ও দণ্ডধারী এবং আপনি সব মানুষের শুভ ও অশুভ বিচার করেন। আপনার আদেশে আমরা একজন পাপীকে বেঁধে নরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময় চারজন পুরুষ সবলে পাশ বন্ধন ছেদন করে পাপীকে মুক্ত করে দিয়েছেন। পাপী নারায়ণ নাম মুখে আনতেই তারা এসে উপস্থিত হয়। আপনার নিকটে আমরা তাদের পরিচয় জানতে চাই। যমরাজ বললেন, এই বিশ্বের আর এক অধীশ্বর আছেন। আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে শুধু পাপীদের ঈশ্বর হয়ে আছি। হরির দূতরা ইহলোকে বিচরণ করছেন। তাঁরা হরির ভক্তদের অগ্নি প্রভৃতি উৎপাত থেকে, শত্রুর নিকট থেকে, এমন কি আমার নিকট থেকেও সর্বদা রক্ষা করছেন। ভগবানের নাম গ্রহণে তাঁর প্রতি যে ভক্তিযোগের উদয় হয়, ইহলোকে মানুষের তাই পরম ধর্ম। তোমরা হরির নামের মাহাত্ম্য দেখ, হরির নাম করে মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। আমরা তার দণ্ডবিধানে অসমর্থ।

দ্বিতীয় দক্ষ ও তাঁর বংশ বিস্তার

সূত বললেন, এর পরে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বললেন প্রাচীন বর্হির প্রচেতা নামে দশ পুত্র সমুদ্র গর্ভ থেকে বেরিয়ে দেখলেন যে বৃক্ষে আবৃত হয়ে আছে পৃথিবী। এই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করবার জন্য মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করলেন। বনস্পতিদের রাজা চন্দ্র তাঁদেব ক্রোধ উপশমের জন্য বললেন, প্রজাদের জন্য ভগবান এই সব বৃক্ষ ও ধান্যাদি ওষধি সৃষ্টি করেছেন। পিতাব আদেশে প্রজা সৃষ্টির চেষ্টায় বেরিয়ে তোমরা প্রজাদের জীবন রক্ষার উপায় এই সব বৃক্ষকে দগ্ধ করতে পার না। পিতামাতা শিশুদের বন্ধু। চোখের পাতা চোখের ও পতি পত্নীর

বন্ধু। প্রজাপতি প্রজাদের, গৃহস্থ ভিক্ষুদের এবং পণ্ডিতরা অজ্ঞ ব্যক্তির সুহৃদ।—

তোকানাং পিতরৌ বন্ধু দৃষ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ॥ ৬।৪।১২

সমস্ত প্রাণীর দেহেই হরি আত্মরূপে বিরাজমান আছেন, তাই সমস্ত প্রাণী জগৎকে তাঁরই আবাসরূপে দেখলে হরি সন্তুষ্ট হবেন। বৃক্ষদের দগ্ধ করে কোন ফল নেই। তাই তোমাদের কল্যাণের জন্য বলছি যে বৃক্ষরা যে সুন্দরী কন্যাকে পালন করেছে, তাকে তোমরা পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

চন্দ্র এই ভাবে প্রচেতাদের ডেকে অপ্সরা প্রম্লোচার সুন্দরী কন্যাকে দান করে চলে গেলে প্রচেতারা তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। এই স্ত্রীর গর্ভেই প্রাচেতস দক্ষের জন্ম এবং দক্ষের সৃষ্ট প্রজাতেই ত্রিলোক পূর্ণ হয়েছে। প্রথমে তিনি আকাশ ভূমি ও জল নিবাসী দেবতা অসুর ও মানুষ মন দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রজা বৃদ্ধি হতে না দেখে বিন্ধ্য পর্বতের সমীপে অঘমর্ষণ তীর্থে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেন। এতে হরি তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যা অসিক্নিকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর এবং রতি ধর্মে আসক্ত হয়ে প্রজা সৃষ্টি কর। এই ভাবে তোমার পরবর্তী প্রজারাও আমার মায়ায় স্ত্রীপুরুষের মিলনেই বৃদ্ধি লাভ করবে। এই বলেই ভগবান হরি অদৃশ্য হলেন।

প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুর মায়ায় শক্তিশালী হয়ে পঞ্চজনের কন্যা অসিক্নিকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করে হর্যশ্ব নামে অযুত পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরা পিতার নিকটে প্রজা সৃষ্টির আদেশ পেয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। সিন্ধু নদ যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে নারায়ণ সরোবর নামে এক তীর্থ আছে। সেই তীর্থের জলে স্নান করে তাঁরা কঠোর তপস্যা করলেন। এই সময়ে নারদ এসে তাঁদের বললেন, পৃথিবীর অন্ত না জেনে তোমরা কী ভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?

তাঁর কূট বাক্য শুনে হর্যশ্বরা একমত হয়ে মোক্ষমার্গের পথিক হলেন। দক্ষ নারদেরই নিকটে তাঁর পুত্রদের স্বধর্মচ্যুতির কথা শুনে সন্তাপগ্রস্ত হলেন। ব্রহ্মার কথায় দক্ষ আবার সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরাও পিতার আদেশ পেয়ে নারায়ণ সরোবরে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করলেন। নারদ আবার এসে পূর্বের মতো কূট বাক্য শোনালেন। বললেন, বড় ভাইদের পথ অনুসরণ করাই তোমাদের উচিত। নারদের কথায় তাঁরা সেই পথই অবলম্বন করলেন। তাঁরাও আর সংসারে ফিরলেন না। দক্ষ শুনতে পেলেন যে নারদের উপদেশেই তাঁর পুত্রদের স্বধর্মচ্যুতি হয়েছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদের নিকটে গিয়ে বললেন, তুমি সাধুর বেশে আমার পুত্রদের অনিষ্ট করেছ। একবার আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর করব না। আমার পুত্রদের যেমন তুমি গৃহত্যাগ করিয়েছ, তেমনি তোমারও কোন স্থিতি হবে না, নিরন্তর তোমাকে ভ্রমণরত থাকতে হবে। তথাস্তু বলে দেবর্ষি নারদ সেই অভিশাপ মেনে নিলেন। প্রত্যুত্তরে অভিশাপ দিতে সমর্থ হলেও ক্ষমা করতে হয়, এই হল সাধুদের উপদেশ।

শুক বললেন, এর পর প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অনুরোধে ষাটজন কন্যার জন্ম দিলেন। তাদের মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে, দুটি ভূত নামের মুনিকে, দুটি অঙ্গিরাকে, দুটি কৃশাশ্বকে ও অবশিষ্ট চারটি তার্ক্ষ্য নামে কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। ধর্মকে যে দশটি কন্যা দান করলেন তাঁদের নাম ভানু লম্বা ককুদ যামি বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী বসু মুহূর্তা ও সঙ্কল্পা। ভানুর পুত্র দেব ঋষভ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত ও তাঁর পুত্র মেঘগণ। ককুদের পুত্র সঙ্কট, তাঁর পুত্র কীকট এবং এর থেকে ভূতলস্থ দুর্গাভিমানী দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল। যামির পুত্র স্বর্গ ও তাঁর পুত্র নন্দি। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ নিঃসন্তান। সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ ও তাঁর পুত্র অর্থসিদ্ধি। মরুত্বতীর মরুত্বান্ ও জয়ন্ত নামে দুই পুত্র, জয়ন্ত বাসুদেবের অংশ। মুহূর্তকালের অধিষ্ঠাতা দেবতারা মুহূর্তার পুত্র।

সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প ও তাঁর পুত্র কাম। বসুর পুত্র অষ্ট বসু, তাঁদের নাম দ্রোণ প্রাণ ধ্রুব অর্ক অগ্নি দোষ বাস্তু ও বিভাবসু। দ্রোণের পত্নী অভিমতীর গর্ভে হর্ষ শোক ও ভয় প্রভৃতি সন্তানদের জন্ম। প্রাণের স্ত্রী উর্জস্বতীর সহ আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র। পুরাভিমানী দেবতারা ধ্রুবের স্ত্রী ধরণির সন্তান। অর্কের স্ত্রী চামলা তর্ষ প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম দেন। দ্রবণিক প্রভৃতির জন্ম অগ্নির স্ত্রী ধারার গর্ভে। কৃত্তিকার পুত্র স্কন্দও অগ্নির পুত্র রূপে প্রসিদ্ধ, স্কন্দ থেকেই বিশাখ প্রভৃতির জন্ম হয়েছিল। দোষের স্ত্রী শর্বরীর পুত্র শিশুমার হরির অংশ। বসুর স্ত্রী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার জন্ম। বিশ্বকর্মার পুত্র চাক্ষুষ মনু, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। বিভাবসুর স্ত্রী উষা ব্যুষ্ট রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। আতপের পুত্র পঞ্চযাম, এই দিবসাভিমানী দেবতার প্রেরণায় প্রাণীরা দিনে কর্মরত থাকে।

ভূতের স্ত্রী সরূপা কোটি কোটি রুদ্রের জন্ম দেন। এঁরা রৈবত অজ ভব ভীম বাম উগ্র বৃষাকপি অজৈকপাদ অহির্ব্রধ্ন বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই একাদশ রুদ্রের পার্ষদ প্রেত ও বিনায়করা ভূতের অন্য স্ত্রীর সন্তান। অঙ্গিরার দুই পত্নীর নাম স্বধা ও সতী। স্বধার পুত্র পিতৃগণ এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস নামে বেদকে পুত্ররূপে লাভ করেন। কৃশাশ্বের দুই পত্নী অর্চি ও ধিষণা। অর্চির গর্ভে ধূমকেতু এবং ধিষণার গর্ভে বেদশিরা দেবল বয়ুন ও মনুর জন্ম হয়েছে।

তার্ক্ষ্য নামধারী কশ্যপের চার পত্নীর নাম বিনতা কদ্রু পতঙ্গী ও যামিনী। পতঙ্গী পক্ষীদের ও যামিনী শলভ বা ফড়িংদের জননী। বিনতা বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্যের সারথি অরুণের জন্ম দেন এবং কদ্রু অসংখ্য সর্প প্রসব করেন।

কৃত্তিকা প্রভৃতি তারকারা চন্দ্রের পত্নী হলেও দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁদের কোন সন্তান হয় নি।

কশ্যপের পত্নীদের নাম অদিতি দিতি দনু কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা মুনি ক্রোধবশা তাম্রা সুরভি সরমা ও তিমি। তিমি থেকে জলজন্তু ও সরমা থেকে বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উৎপত্তি হয়েছে। সুরভির সন্তান গো মহিষাদি দুই খুরের চতুষ্পদ প্রাণী, শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি তাম্রার সন্তান এবং মুনির গর্ভে অপ্সরাদের সৃষ্টি হয়েছে। দন্দশূক প্রভৃতি সর্প ক্রোধবশার সন্তান, ইলা বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদের জননী এবং রাক্ষসরা সুরসার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছে। অরিষ্টা গন্ধর্বদের জননী, কাষ্ঠার সন্তান এক খুরের চতুষ্পদেরা। দনুর পুত্রের সংখ্যা একষট্টি। তাদের মধ্যে প্রধান হল দ্বিমূর্ধা শম্বর অরিষ্ট হয়গ্রীব বিভাবসু অয়োমুখ শঙ্কুশিরা স্বর্ভানু কপিল অরুণ পুলোমা বৃষপর্বা একচক্র অনুতাপন ধূম্রকেশ বিরূপাক্ষ বিপ্রচিত্তি ও দুর্জয়। স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে নমুচি ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহুষের পুত্র যযাতি বিবাহ করেন।

বৈশ্বানরের চারটি সুন্দরী কন্যার নাম উপদানবী হয়শিরা পুলোমা ও কালকা। হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে ও ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন এবং ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপ পুলোমা ও কালকাকে বিবাহ করেন। পুলোমার সন্তান পৌলম ও কালকার সন্তান কালকেয়রা যুদ্ধরত দানবরূপে বিখ্যাত। তারা সংখ্যায় ষাট হাজার। তারা সর্বদা যজ্ঞ নষ্ট করত বলে অর্জুন একাকী তাদের বধ করেছিলেন।

সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির একশোটি পুত্র জন্মেছিল। রাহু তাদের মধ্যে বড় ও অবশিষ্ট একশোজন কেতু। অদিতির পুত্রদের নাম বিবস্বান অর্যমা পূষা ত্বষ্টা সবিতা ভগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শক্র ও উরুক্রম। বিবস্বানের স্ত্রী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব মনু এবং যম ও যমী নামে যমজ সন্তান প্রসব করেন। তারপর তিনিই ঘোটকী রূপে অশ্বিনীকুমার যুগলের জন্ম দিয়েছিলেন। বিবস্বানের ঔরসে ছায়া শনি ও সাবর্ণি মনু নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে এক কন্যা লাভ করেন। তপতী সংবরণকে পতিরূপে বরণ করেন। অর্যমার পত্নী মাতৃকার

গর্ভে অনেক পুত্র জন্মালে ব্রহ্মা তাদের মধ্যে মনুষ্য জাতি নির্বাচন করেছিলেন। পূষার কোন সন্তান নেই। দৈত্যদের কনিষ্ঠ ভগিনী রচনা ত্বষ্টার পত্নী। তাঁর গর্ভে ত্বষ্টার সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। বৃহস্পতি অবজ্ঞাত হয়ে দেবতাদের পরিত্যাগ করলে দেবতারা এই বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন।

বিশ্বরূপের কাহিনী

পরীক্ষিৎ বললেন, শিষ্যরা কী অপরাধ করেছিলেন এবং গুরু বৃহস্পতি তাঁর শিষ্য দেবতাদের কেন পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই কথা আপনি বলুন।

শুক বললেন, ত্রিলোকের ঐশ্বর্যলাভে মত্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একবার শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। একদিন তিনি শচীকে বামে নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মরুদ প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে ছিলেন এবং অপ্সরা গন্ধর্বরা তাঁর স্তুতি ও যশোগান করছিলেন। এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় এলে ইন্দ্র তাঁর আসন থেকে একটুও বিচলিত হলেন না। এই দেখে তাঁর মদ বিকার ঘটেছে ভেবে তিনি নিঃশব্দে সভা থেকে বেরিয়ে নিজের গৃহে চলে গেলেন। ইন্দ্র তখনই নিজের দোষ বুঝতে পেরে বললেন, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে আমি অন্যায় করেছি। আমি পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করব। কিন্তু বৃহস্পতি মায়া বলে গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর সন্ধান পেলেন না। এদিকে ইন্দ্রের এই বিপত্তির কথা শুনেই অসুররা শুক্রাচার্যের অনুমতি নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মার আশ্রয় নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, বৃহস্পতিকে অভিনন্দন না করে তোমরা গুরুতর অন্যায় করেছ। এখন তোমরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের সেবা কর, তিনি তোমাদের অভীষ্ট সাধন করবেন। এই কথা শুনেই দেবতারা ত্বষ্টার নিকটে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, তোমার তেজে

আমরা যাতে শত্রুজয় করতে পারি, সেইজন্য তোমাকে আমরা উপাধ্যায় রূপে বরণ করছি। বিশ্বরূপ বললেন, পৌরোহিত্য যদিও অধর্মের কারণ ও নিন্দনীয় বৃত্তি, তবু আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না বলেই বলছি যে আপনাদের সব কাজ আমি করব। এর পর তিনি পৌরোহিত্যে বৃত হয়ে সব কাজ করতে লাগলেন। বৈষ্ণবী বিদ্যায় তিনি অসুরদের লক্ষ্মী আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে দান করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের নিকটে নারায়ণ কবচ লাভ করে যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন।

শোনা যায় যে বিশ্বরূপের তিনটি মাথা ছিল। তার একটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, একটি দিয়ে সুরাপান করতেন এবং তৃতীয়টি দিয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন। দেবতারা ছিলেন বিশ্বরূপের পিতৃকুল। পুরোহিত হয়ে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের যজ্ঞভাগ দিতেন। কিন্তু অসুররা তাঁর মাতৃকুল বলে স্নেহবশত তিনি অসুরদের গোপনে যজ্ঞভাগ দিতেন। কোন বিশেষ উপায়ে তিনি তা তাদের কাছে পাঠাতেন। তাই দেখে ইন্দ্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই ছেদন করেন। তাঁর সোমপানকারী মাথা কপিঞ্জল পাখি, সুরাপানকারী মাথা চটক পাখি ও অন্নভক্ষণকারী মাথা তিতির পাখি হয়েছিল। এই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্র নিজের অঞ্জলিতে গ্রহণ করেছিলেন এবং সংবৎসরকাল পরে লোকাপবাদ পরিহারের জন্য তিনি ঐ পাপ চার ভাগ করে ভূমি জল বৃক্ষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এক এক ভাগ দিয়েছিলেন।

বৃত্রাসুর বধ

পুত্র বধের জন্য ক্রুদ্ধ ত্বষ্টা ইন্দ্রের বিনাশ কামনায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হলেন। 'হে ইন্দ্র সাত্রো, তুমি বৃদ্ধি লাভ করে সত্বর শত্রু সংহার কর।' এই বলে যজ্ঞে আহুতি দিতেই দক্ষিণাগ্নি থেকে এক ঘোরা-কৃতি পুরুষ উত্থিত হল। জন্মেই সে ত্রিলোক আবৃত করেছিল বলে

সে বৃত্র নামে বিখ্যাত হল। দেবতারা তার নিকটে গিয়ে নিজেদের অস্ত্র শস্ত্রে তাকে আঘাত করলে সে সমস্তই গ্রাস করল। তাই দেখে দেবতারা বিস্মিত ও বিষণ্ণ হয়ে আদি পুরুষের স্তব করতে লাগলেন। তাতে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী বিষ্ণু তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হয়েছি। তোমরা সত্বর ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকটে গিয়ে বিদ্যা ব্রত ও তপোবলে দৃঢ় তাঁর দেহটি প্রার্থনা কর। অথর্ব ঋষির পুত্র এই দধীচি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন, ত্বষ্টাকে তিনি দিয়েছিলেন অভেদ্য নারায়ণ কবচ। বিশ্বরূপের কাছে এই কবচ পেয়েছ তুমি। তোমাদের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর দেহটি চাইলে শিশু-বৎসল ঋষি তা অবশ্যই দান করবেন। দধীচির অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করে দিলে সেই অস্ত্রে তুমি বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদ করতে পারবে। এই বলে বিষ্ণু অন্তর্ধান হলে দেবতারা দধীচির নিকটে গিয়ে তাঁর দেহ চাইলেন। অন্তরে হর্ষ-যুক্ত হলেও ঋষি উপহাসের ভঙ্গিতে বললেন, দেহধারী জীবের মরণ কালে যে দুঃখ হয়, তা কি তোমরা জান না? দেবতারা বললেন, আপনার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে কোন ত্যাগই দুঃসাধ্য নয়। দধীচি বললেন, এ দেহ আমার অতি প্রিয় হলেও একদিন তো ত্যাগ করতেই হবে, তোমাদের প্রার্থনায় আমি আজই তা ত্যাগ করছি। এই বলে দধীচি জীবাত্মাকে পরব্রহ্ম ভগবানে যুক্ত করে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করে দিলেন।

নর্মদা নদীর তীরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধল। অসুরদের অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হবার পর তারা বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি নিক্ষেপ করতে লাগল। তাতেও ইন্দ্রের সেনা অক্ষত আছে দেখে তারা ভীত হল। বৃত্র তার সৈন্যদের ভয়ে ভগ্ন ও পলায়নরত দেখে বলল, জন্মালে মৃত্যু নিশ্চিত। এই অবস্থায় মৃত্যু থেকে যে যশ ও স্বর্গলাভ সম্ভব, তাই সাদরে বরণ করা উচিত। কিন্তু জ্ঞানহীন অসুররা তার কথা

শুনল না দেখে বৃত্র দেবতাদের ভৎ‍র্সনা করে বলল, যারা বীরত্বের অভিমান করে, তাদের পক্ষে ভীত শত্রুকে বধ করা ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে স্বর্গের কারণ হতে পারে না। যদি তোমাদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য থাকে এবং ঐহিক বিষয়-সুখে আসক্তি না থাকে, তবে আমার সামনে এসো। বলে এক সিংহনাদ করল। তাতে দেবতারা বজ্রাহতের মতো মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শূল হাতে বৃত্র তাঁদের পদদলিত করল। তাই দেখে ইন্দ্র গদা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বৃত্র অনায়াসে সেই গদা বাম হাতে ধরে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের কুম্ভে প্রহার করল। ঐরাবত আটাশ হাত পিছিয়ে গিয়ে রক্ত বমন করতে লাগল। বাহনকে অবসাদ গ্রস্ত ও ইন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখে উদার চিত্ত বৃত্র পুনরায় গদা নিক্ষেপ করল না। ইন্দ্রকে বজ্র হাতে দেখে হাসতে হাসতে বলল, তুমি ব্রহ্মঘাতী, গুরু হত্যাকারী ও আমার ভাইকে মেরে শত্রু হয়েছ। শূল দিয়ে আমি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে এখনই ভ্রাতৃ-ঋণ মুক্ত হতে পারি। স্বর্গকামী যাজ্ঞিক যেমন নিষ্ঠুর ভাবে পশুহত্যা করে, তুমিও তেমনি স্বর্গের আধিপত্য রক্ষার জন্য যজ্ঞে দীক্ষিত নিজের গুরুর বিশ্বাস উৎপাদন করে খড়্গে তার শিরশ্ছেদ করেছ। লক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দার পাত্র হয়েছ। আমার শূলে তোমার দেহ বিদীর্ণ হলে আগুনে তোমার সৎকার হবে না, গৃধ্ররা তা ভক্ষণ করবে। আর তুমি যদি তোমার চক্র দিয়ে আমার মস্তক ছেদন কর, তবে আমি আমার দেহ ভূত বলি দিয়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হব। তোমার বজ্র নিষ্ফল হবে না। দধীচির তপস্যা ও হরির তেজে তা শাণিত। হরি তো তোমাকে পাঠিয়েছেন। হরি যার অনুকূল তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমার প্রভু সঙ্কর্ষণ যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই অনুসারে আমি তাঁর পায়ে মনোনিবেশ করে দেহত্যাগের পর যোগীদের গতি লাভ করব। ভক্তকে ভগবান ত্রিলোকের সম্পদ দেন না, তাতে বিষাদ বিপত্তি ও ক্লেশের উদয় হয়। হে হরি, আমি

তোমার দাসদের অনুগত দাস হব। আমি মুক্তিপদও চাই না। তারপর বৃত্র তাঁর ত্রিশূল ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করল। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে সেই ত্রিশূল ও বৃত্রের একটি বাহু ছেদন করলেন। বৃত্র ইন্দ্রের নিকটে এসে তাঁর গণ্ডে পরিঘের আঘাত করতেই ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র খসে পড়ল। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে বজ্র তুলছিলেন না। তাই দেখে বৃত্র বলল, যুদ্ধে বিষাদ প্রকাশ করা সঙ্গত নয়, তুমি বজ্র ধারণ করে শত্রু সংহার কর। সব সময়েই কারও জয় হয় না। কখনও জয় কখনও বা পরাজয় হয়। কালরূপী ভগবানই সর্বত্র জয় পরাজয়ের কারণ। সকলেই ঈশ্বরের অধীন বলে কীর্তি-অকীর্তি জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণ সব অবস্থাতেই হর্ষ ও বিষাদ শূন্য হয়ে থাকবে। আমার একটি বাহু ছিন্ন হবার পরেও আমি তোমার প্রাণ সংহারের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করছি। এই যুদ্ধ পাশা খেলার মতো, একজনের জীবনই এর পণ এবং অস্ত্র এর পাশা। এই পাশা খেলায় কার জয় হবে তা আগে কেউই জানতে পারে না। ইন্দ্র এই কথা শুনে বললেন, তোমার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তুমি দেখছি বিষ্ণু মায়াকে অতিক্রম করেছ। এর পর বৃত্র তার বাম হাতে একটি ভয়ঙ্কর পরিঘ ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করলে ইন্দ্র বজ্র দিয়ে সেই অস্ত্র ও বৃত্রের বাম বাহু একই সঙ্গে ছেদন করলেন। দুটি বাহুই ছিন্ন হবার পর পদচারী পর্বতের মতো এগিয়ে এসে ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করল। দেবতারা হায় হায় করে উঠলেন। কিন্তু নারায়ণ কবচে রক্ষিত ইন্দ্রের মৃত্যু হল না। তিনি বজ্রে বৃত্রের উদর বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

শুক বললেন, বৃত্র বধের পর ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করল। তিনি দেখলেন যে চণ্ডালীর মতো সেই ব্রহ্মহত্যা ক্ষয়রোগ গ্রস্ত দেহে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে। পরিধানে রক্তবস্ত্র, বিক্ষিপ্ত কেশ

ও জরায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ইন্দ্র ভয়ে দশ দিকে ছুটোছুটি করে শেষে মানস সরোবরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি একটি মৃণালের সূত্রে অলক্ষ্যে থেকে মুক্তির উপায় ভেবেই হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন। অগ্নি তাঁর যজ্ঞভাগ নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন না। এদিকে নহুষ এই সময়ে স্বর্গ রাজ্য শাসন করছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য মদে তাঁর বিবেক বুদ্ধি লোপ পেলে শচীর জন্য তাঁর সর্প জন্ম হয়। ব্রাহ্মণদের আহ্বানে তখন তিনি স্বর্গে ফিরে আসেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে হরির আরাধনা করে পাপ মুক্ত হন।

চিত্রকেতুর উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, পাপাত্মা বৃত্রের মনে নারায়ণের প্রতি দৃঢ় ভক্তি কেমন করে উদয় হয়েছিল?

সূত বললেন, পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে শুকদেব উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে আমি বেদব্যাস নারদ ও দেবলের নিকটে যা শুনেছি তাই বলছি। পুরাকালে শূরসেন অর্থাৎ মথুরা মণ্ডলে চিত্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নীর সংখ্যা এক কোটি, কিন্তু কারও কোন সন্তান ছিল না। রাজা সর্বগুণে অলঙ্কৃত হয়েও সন্তানের অভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। একদিন ভ্রমণরত অঙ্গিরা ঋষি তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁর নিকট বসলেন। বিনয়াবনত রাজাকে ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মুখ চিন্তায় মলিন দেখছি, তুমি কি কোন অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়েছ? চিত্রকেতু বললেন, আপনি সব জেনেও যখন প্রশ্ন করছেন, তখন বলছি যে সন্তানের অভাবে আমি পূর্বপুরুষের নরকে গতির ভয় পাচ্ছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এই কথা শুনে অঙ্গিরা দয়ার্দ্র চিত্তে ত্বষ্টৃ দেবতার চরু পাক করে রাজার বড় রাণী কৃতদ্যুতিকে খেতে দিলেন। বললেন, তোমার একটি মাত্র পুত্র হবে এবং সে তোমাকে হর্ষ ও শোক দেবে। এই কথা বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

যথাকালে কৃতদ্যুতির একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। শূরসেনবাসী সকলেই এই সংবাদে আনন্দিত হল। রাজা অকাতরে দান করলেন। কিন্তু কৃতদ্যুতির সপত্নীদের মনস্তাপ জন্মাল। পুত্রবতী রাণীর প্রতি রাজারও বেশি প্রীতি দোষে অন্য রাণীদের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হল। এই বিদ্বেষে বুদ্ধিনাশ হয়ে মন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলে একদিন তারা কুমারকে বিষ প্রদান করল। কৃতদ্যুতি ভেবেছিলেন যে পুত্র নিদ্রা যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় পরে ধাত্রী তার চোখের তারা উর্ধ্বগত এবং দেহ প্রাণহীন দেখে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। রাণী মূর্ছা গেলেন, অন্য রাণীরাও কপট রোদনে প্রবৃত্ত হলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ভেবে রাজাও শোকে বিহ্বল হলেন।

সকলকে এইরকম দেখে নারদের সঙ্গে অঙ্গিরা এসে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরা যার জন্য শোক করছ সে তোমার কে, আর তুমিই বা তার কে? দেহেরই জন্ম হয়, দেহীর নয়। ব্রহ্ম বস্তুতে এই ভেদ অজ্ঞান কর্তৃক অনাদিকাল থেকে আছে। রাজা চিত্রকেতু বললেন, অবধূত বেশে আপনারা কে এসেছেন বলুন। অঙ্গিরা বললেন, আমি তোমার পুত্রদাতা অঙ্গিরা, আর ইনি নারদ। হরিভক্ত হয়েও তুমি শোকে মগ্ন দেখে আমরা এসেছি। আমি তোমাকে পরম জ্ঞান দেবার জন্যই এসেছিলাম, কিন্তু তুমি পুত্রাভিলাষী জেনে আমি তোমাকে পুত্র দিয়েছিলাম। পুত্রবানের মনস্তাপ অবশ্যম্ভাবী, সবরকম সম্পদও সন্তাপদলক। সবই অস্থায়ী, স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের মতো মিথ্যা। তাই স্থির চিত্তে তুমি আত্মতত্ত্ব বিচার করে দ্বৈত পদার্থ মিথ্যা জেনেই শান্তি মার্গে প্রবেশ কর। নারদ বললেন, তুমি আমার নিকটে এই মন্ত্র উপনিষদ গ্রহণ কর, সাত রাতের মধ্যেই তুমি ভগবান সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভে সমথ হবে।

তারপর নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রের আত্মাকে দৃষ্টিগোচর করিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, জীবাত্মা, তোমার' পিতামাতা ও

বান্ধবদের দিকে দেখ। এঁরা তোমারই বিচ্ছেদে শোকে সন্তপ্ত হচ্ছেন। তুমি নিজের দেহে প্রবেশ করে আয়ুর অবশিষ্ট কাল পিতার সিংহাসনে বসে বিষয়ভোগ কর। জীব বলল, আমি তো কর্মের বশে নানা জন্ম নিচ্ছি, এঁরা কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন? আত্মা দেহ ধারণ করলেই অপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সে দেহের অধীন নয়, এই জন্যই সে সুখ দুঃখ ও রাজ্যভোগ করে না। এই বলে সে প্রস্থান করতেই জ্ঞাতিরা শোক পরিত্যাগ করলেন এবং রাজপুত্রের শব দাহ করে তর্পণাদি করলেন। রাণীরাও পুত্র কামনা ত্যাগ করে যমুনার তীরে শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

রাজা চিত্রকেতু যমুনার জলে স্নান ও তর্পণ করে অঙ্গিরা ও নারদের বন্দনা করলে নারদ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিদ্যা উপদেশ দিয়ে অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন। চিত্রকেতু সপ্তাহ কাল শুধু জলপান করে একাগ্র চিত্তে সেই বিদ্যা ধারণ করলেন। সপ্তরাত্র অতিবাহিত হবার পর তিনি বিদ্যাধরদের আধিপত্য লাভ করলেন। তারপর তিনি অনন্তের পদপ্রান্তে পৌঁছলেন। এবং তাঁর স্তব করে বললেন, যাঁর একটি মাথায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একটি সর্ষের মতো অবস্থিত, সেই সহস্র শীর্ষ ভগবান অনন্তকে আমি নমস্কার করি। ভগবান বললেন, আমাকেই তুমি জীবের ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা বলে জানবে। জীব যদি এই ব্রহ্মভাব বিস্মৃত হয়, তাহলে তার জন্মের পর জন্ম ও মৃত্যুর পর মৃত্যু এই সংসার গতি চলতে থাকে। মনুষ্য জন্মেও যে আত্মাকে অবগত হয় না, সে কখনও কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় না। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য দর্শনকেই সর্বান্তঃকরণে স্বার্থ বলে মানবে। তাহলে অচিরে তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।

এরপর বিদ্যাধর চিত্রকেতু আকাশে বিচরণ করতে লাগলেন। একবার তিনি বিষ্ণুদত্ত বিমানে আকাশ পথে যেতে যেতে সিদ্ধ ও

চারণে পরিবেষ্টিত শিবকে দেখতে পেলেন। তিনি দেবীকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে চিত্রকেতু উচ্চহাস্যে দেবীর শ্রুতিগোচরে বললেন, ইনি জগৎ গুরু। এই ভাবে ইনি পত্নীকে নিয়ে সভায় বসে আছেন! ইতর জনেও তো নির্জনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়! এই ভাবে তিনি অনেক অসঙ্গত কথা বললে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্ট চিত্রকেতুকে বললেন, ইনিই কি জগতে নির্লজ্জ ও দুষ্টদের দণ্ডধারী হয়েছেন এবং শিবকে শাসন করতে এসেছেন? এই ধৃষ্টেরই দণ্ড হওয়া উচিত। এরপর তোমার অসুর জন্ম হোক। তাহলে আর মহাপুরুষদের নিকটে অপরাধ করবে না।

এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে চিত্রকেতু বিমান থেকে অবতরণ করে অবনত মস্তকে বললেন, আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলিতে গ্রহণ করলাম। এ তো আমি পূর্ব কর্মফলেই পেলাম। আমি শাপমোচনের জন্য আপনাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করছি না। আমার যে উক্তি আপনি অনুচিত মনে করেছেন তা ক্ষমা করুন। এই বলে হর পার্বতীকে প্রসন্ন করে চিত্রকেতু বিমানযোগে প্রস্থান করলেন। শিব বললেন, এই চিত্রকেতু হরির প্রিয় অনুচর। ইনি শান্ত ও সমদর্শী বলে পরিচিত।

শুক বললেন, এই শাপগ্রস্ত চিত্রকেতুই ত্বষ্টার যজ্ঞকালে দক্ষিণাগ্নিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনিই বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত।

মরুৎগণের জন্ম ও পুংসবন ব্রত

শুক বললেন, সবিতার স্ত্রী বৃশ্নির গর্ভে জন্ম সাবিত্রী ব্যাহৃতিত্রয় অগ্নিহোত্রযাগ পশুযাগ সোমযাগ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের। ভগ নামে আদিত্যের স্ত্রী সিদ্ধিমহিমা বিভু ও প্রভু এই তিন পুত্র এবং আশী নামে একটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। ধাতার পত্নী কুহূ সিনীবালী রাকা ও অনুমতি যথাক্রমে সায়ম দর্শ প্রাত ও পূর্ণমাস নামে চারটি

সন্তান প্রসব করেন। বিধাতার পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্য নামে পাঁচটি অগ্নি উৎপন্ন হয়। বরুণের স্ত্রী চর্ষণীর গর্ভে ভৃগু পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। মিত্র ও বরুণ উর্বশীর সমক্ষে কুম্ভের মধ্যে বীর্যাধান করায় অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি হয়েছিল। রেবতীর গর্ভে মিত্রের উৎসর্গ অরিষ্ট ও পিপ্পল নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। পৌলমী শচীর গর্ভে ইন্দ্রের জয়ন্ত ঋষভ ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। বামন-রূপী উরুক্রমের পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎ শ্লোকের জন্ম, তাঁর সৌভগ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র হয়েছিল।

দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র জন্মে। জম্ভাসুরের কন্যা কয়াধু হিরণ্যকশিপুর পত্নী, তাঁর গর্ভে সংহ্লাদ অনুহ্লাদ হ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামে চারটি পুত্রের জন্ম হয়। সিংহিকা তাদের ভগিনী, বিপ্রচিৎ নামে দানবের ঔরসে তার রাহু নামে এক পুত্র জন্মে। সংহ্লাদের পত্নী মতি পঞ্চজন নামে এক পুত্র প্রসব করে। হ্লাদের স্ত্রী ধমনি বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিল। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্যার গর্ভে বাষ্কল ও মহিষ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। প্রহ্লাদের পুত্রের নাম বিরোচন। দ্রবীর গর্ভে বিরোচনের পুত্র বলির জন্ম। বলির স্ত্রী অশনার গর্ভে একশো পুত্রের জন্ম হয়, বাণ তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শিবের আরাধনা করে বাণ প্রাধান্য লাভ করেছিল। উনপঞ্চাশজন মরুৎও দিতির পুত্র। তারা সকলেই নিঃসন্তান। ইন্দ্র এদের দেবত্ব লাভ করিয়েছিলেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, মরুৎরা এমন কী সৎকর্ম করেছিলেন যে ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দিয়েছিলেন ?

সূত বললেন, পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে শুকদেব বলেছিলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুকে দিয়ে দিতির দুই পুত্রকে বধ করালে দিতি সেবায় তাঁর স্বামীকে সন্তুষ্ট করে বললেন, আমি ইন্দ্রের বিনাশকারী একটি অমর পুত্র চাই। দিতির এই কথা শুনে কশ্যপ অনুতাপ করতে লাগলেন, স্ত্রীলোকের চরিত্র বোঝা দুঃসাধ্য। সার্থসিদ্ধি পরায়ণ স্ত্রীলোকের

প্রিয় কেউ নয়। তারা স্বার্থের জন্য পতি পুত্র বা ভ্রাতাকে স্বয়ং হত্যা করে, অথবা অপরের দ্বারা হত্যা করায়।—

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীনামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ॥ ৬।১৮।৪২

তোমাকে অভীষ্ট বর দেব বলে দিতির নিকটে আমি অঙ্গীকার করেছি। যাতে তাও মিথ্যা না হয়, আবার ইন্দ্রও নিহত না হয়, এই রকম উপায়ই যুক্তিযুক্ত। এই ভেবে কশ্যপ বললেন, যদি তুমি সম্বৎসরকাল ব্রত ধারণ করতে পার, তাহলেই তোমার ইন্দ্রের হত্যাকারী পুত্র হবে। দিতি বললেন, আমি ব্রত ধারণ করব, আপনি বিধি বলুন। কশ্যপ বললেন, এই ব্রতে একত্রিশটি কাজ নিষিদ্ধ। যদি তুমি এক বৎসর অক্ষুণ্ণ ভাবে এই পুংসবন ব্রত ধারণ করতে পার, তা হলেই তোমার ইন্দ্রঘাতী পুত্র জন্মাবে। তাই করব বলে দিতি অঙ্গীকার করে গর্ভধারণ করেছিলেন এবং ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।

মাসির অভিপ্রায় জানতে পেরে স্বার্থদর্শী ইন্দ্র দিতির আশ্রমে আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। ব্রতের ছিদ্র অন্বেষণের জন্যই তিনি কপট সাধু বেশে তাঁর পরিচর্যা করছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় ব্রতক্লিষ্টা দিতি দৈববশতই উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন ও পাদ-প্রক্ষালন না করেই নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন। ইন্দ্র এই ছিদ্র পেয়েই যোগমায়া বলে দিতির উদরে প্রবেশ করলেন এবং বজ্র দিয়ে সেই গর্ভকে সাত ভাগে ছেদন করলেন। গর্ভস্থ সন্তান রোদন করতে আরম্ভ করলে 'রোদন কোরো না' এই বলে প্রত্যেকটি খণ্ডকে আরও সাত ভাগ করলেন। তারা বলল, কেন আমাদের হিংসা করছ? আমরা যে তোমারই ভাই মরুৎ। ইন্দ্র বললেন, তোমরা ভয় পেও না। তোমরা আমার ভাই। দিতি এক বৎসর ধরে হরির আরাধনা করছিলেন বলে তাঁর গর্ভনাশ হল না। এই উনপঞ্চাশজন মরুৎকে ইন্দ্র সোমপানের অধিকার দিয়েছিলেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুক বললেন, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে পুংসবন ব্রত আরম্ভ করতে হয়। পত্নী অসমর্থ হলে পতিও এই অনুষ্ঠান করতে পারে। এই ব্রত করে পুরুষ অভীষ্ট লাভ করে, স্ত্রী সৌভাগ্য সম্পদ সন্তান পতির চির জীবন যশ ও গৃহলাভ করে। বিধবার পুণ্য গতি হয়। রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য হয়।

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত

সপ্তম স্কন্ধ

জয়-বিজয়ের তিন জন্ম

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন, বিষ্ণুর তো সর্বজীবে সমান দৃষ্টি, তবু তিনি বিষম দৃষ্টি ব্যক্তির মতো ইন্দ্রের কথায় দৈত্যদের কেন হত্যা করেন? তাঁর তো দেবতাদের নিকটে কোন স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজন নেই, আবার অসুরদের প্রতিও কোন বিদ্বেষ নেই। শুক বললেন, সকলের প্রতি ভগবানের সমভাব হলেও অগ্নি জল বা আকাশের মতো আশ্রয় ভেদে বৈষম্য হয়। এই সম্বন্ধে নারদ রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরকে একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল বাসুদেবে সাযুজ্য লাভ করলে যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দমঘোষের পুত্র শিশুপাল শৈশব থেকে ভগবানের নিন্দাপরায়ণ। কৃষ্ণকে বারবার কটূক্তি করেও তার জিহ্বায় কুষ্ঠ হল না, অন্ধকার নরকে না গিয়ে সে ভগবানের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হল। নারদ এই কথা শুনে বললেন, প্রকৃতি ও পুরুষের রচিত দেহে নিন্দা-প্রশংসার উপলব্ধি নেই। শুধু ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায় না, কাম ভয় দ্বেষ বা স্নেহ দিয়েও তাকে লাভ করা যায়। গোপীরা কাম ভাবে, কংস ভয়ে, দ্বেষে শিশুপাল প্রভৃতি, বৃষ্ণিরা সম্বন্ধ দিয়ে, তোমরা স্নেহে এবং আমরা ভক্তিতে তাঁকে পেয়েছি। এর কোন ভাবই বেণ রাজার মধ্যে ছিল না বলে তাঁকে নরকে যেতে হয়েছিল। তোমাদের মাসতুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র ব্রহ্মশাপে পদচ্যুত জয়-বিজয় নামে বিষ্ণুর দুই পার্ষদ।

যুধিষ্ঠির বললেন, কার অভিশাপে হরির দাসরা পদচ্যুত হয়েছিলেন? নারদ বললেন, এক সময় সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার চার পুত্র ত্রিলোক পর্যটন করতে করতে বিষ্ণুলোকে আসেন। দেখতে

তাঁরা পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতো এবং বস্ত্রাবরণহীন বলে তাঁদের সাধারণ শিশু মনে করে বিষ্ণুলোকের দ্বাররক্ষক তাঁদের বাধা দিলেন। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমরা মধুসূদনের নিকটে বাস করবার যোগ্য নও, অচিরে তোমরা অসুর হয়ে জন্মাবে। এই অভিশাপে তারা পতনে উন্মুখ হলে ঋষিরা দয়ালু হয়ে পুনরায় বললেন, তিন জন্মের পর তোমরা নিজেদের স্থান ফিরে পাবে। তাঁরাই দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে জন্মগ্রহণ করেন। হরি নৃসিংহ মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন পৃথিবী উদ্ধারের জন্য গৃহীত বরাহ মূর্তিতে। তাঁরাই কেশিনীর গর্ভে বিশ্বশ্রবার পুত্র রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে জন্মেছিলেন এবং হরি রামজন্মে তাঁদের বধ করেন। বর্তমানে তাঁরাই তোমার মাসতুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মেছেন। শিশুপাল পাপমুক্ত হলেন।

হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষ হল কেন, আপনি তাই বলুন।

নারদ বললেন, হরির বিক্রমে হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে ভ্রাতার শোকে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু তাঁর সভায় দানবদের বললেন, সবার প্রতি সমভাবাপন্ন হয়েও হরি দেবতাদের পক্ষপাতি হয়ে আমার প্রিয় ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। আমি তাঁর রক্তে ভাইএর তর্পণ করে আমার দুঃখ দূর করব। তাতে বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে। তোমরা ভুবনে গিয়ে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সংহার করতে থাক। তাদের কোন দোষ না থাকলেও বিষ্ণুর আশ্রিত বলেই তাদের বধ কর। প্রভুর এই আদেশ পেয়ে দানবরা সোৎসাহে অত্যাচার শুরু করল এবং জনগণ অসহায় হয়ে পড়লে দেবতারা আত্মগোপন করে ধরাতলে বিচরণ করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার শ্রাদ্ধ তর্পণ করে

ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের মা ও জননী দিতিকে বললেন, আমার ভাইএর জন্য কারও শোক করা উচিত নয়, তার বীরোচিত মৃত্যু হয়েছে। তারপর মাকে সম্বোধন করে বললেন, আত্মার মৃত্যু নেই, দেহ ধারণ করেই তার জন্ম ও মৃত্যু হয়। মায়ার প্রভাবেই আমাদের বিপরীত ভাবনা এবং তারই জন্য শোক। এই বিষয়ে যমের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের যে কথা হয়েছিল, তা বলছি শোন। উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক রাজা ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শত্রুদের হাতে নিহত হন। বনস্থলে এসে তাঁর পত্নীরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় শায়িত দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। সূর্যাস্ত কাল এসে গেলেও তাঁদের শব সৎকারের ইচ্ছা হল না। তাই দেখে স্বয়ং যম বালক মূর্তিতে সেখানে এসে বললেন, অনেক মৃত্যু দেখেও এই বয়স্কদের মোহ দূর হল না! মানুষ যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই তো গেছে, তার জন্যে বৃথা শোক কেন! যিনি বিশ্ব রচনা করেছেন, তিনিই রক্ষা করেন, সংহারও করেন তিনিই। এই বিশ্ব তো তাঁর খেলার জিনিস! তোমরা মোহগ্রস্ত বলেই এই রকম শোক করছ। এখন তো ইনি কিছু শুনতেও পাচ্ছেন না, কিছু বলতেও পারবেন না! এঁর আত্মা তো নিত্য। এ কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা শোক করেন না। আমি ইতিহাসের একটা গল্প বলছি।—পাখিদের যম এক ব্যাধ নানা প্রলোভনের জিনিস ছড়িয়ে জাল ফেলে পাখি ধরছিল। কুলিঙ্গ নামের এক জোড়া পাখির মধ্যে স্ত্রী পাখিটি ব্যাধের জালে ধরা পড়ল। পুরুষ পাখিটি কোন প্রতিকার করতে না পেরে বিলাপ করতে লাগল। ব্যাধ লুকিয়ে থেকে একটি বাণে তাকে বিদ্ধ করল। তোমরাও দেখছি নিজেদের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু না বুঝে যাকে আর ফিরে পাবে না তার জন্য শোক করছ। বালকের মুখে এই কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হলেন এবং যম অন্তর্হিত হলে জ্ঞাতিরা সুযজ্ঞের সৎকার করলেন। আমি তাই বলছি যে তোমরা পরের জন্য বা নিজের জন্য শোক কোরো না। অজ্ঞান অভিনিবেশ ছাড়া কারও

আপন পরের বিচার হয় না। হিরণ্যকশিপুর এই কথা শুনে দিতি ও তাঁর বধূরা শোক পরিত্যাগ করলেন।

এর পর হিরণ্যকশিপু নিজে অজর অমর অপরাজেয় হবার জন্য মন্দর পর্বতের কন্দরে পাদাঙ্গুষ্ঠের উপরে ভর দিয়ে উর্ধ্ববাহু ও উর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে দারুণ কষ্টসাধ্য তপস্যা করেন। তাঁর তপোবহ্নির তাপে দেবতারা অসহিষ্ণু হয়ে ব্রহ্মাকে এই কথা জানালেন। ব্রহ্মা ঋষিদের নিয়ে হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে এসে দেখলেন যে তিনি বল্মীকাদিতে আবৃত হয়েছেন ও পিপীলিকা তাঁর রক্তমাংস খাচ্ছে। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ব্রহ্মা বিস্মিত হয়েও সহাস্যে বললেন, তপস্যায় তুমি সিদ্ধ হয়েছ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। নিরম্বু উপবাসে তুমি দিব্য শতবর্ষ প্রাণ ধারণ করে আছ, এই অসাধারণ তপস্যায় তুমি আমাকে জয় করেছ। বলে ব্রহ্মা তাঁর দেহে কমণ্ডলুর জল ছেটাতেই হিরণ্যকশিপু সেই বল্মীক স্তূপ থেকে বজ্রের মতো সুদৃঢ় অঙ্গ ও তেজ নিয়ে উঠে এলেন। তারপর ব্রহ্মাকে আকাশে দেখে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করলেন। বললেন, যদি আপনি আমার অভিপ্রেত বর দিতে চান তো এই বর আমাকে দিন, যেন আপনাব সৃষ্টি কোন প্রাণীর হাতে আমার মৃত্যু না হয়। গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে, দিবসে বা রাত্রিতে, ভূমিতে বা শূন্য আকাশে, আপনার সৃষ্ট কারও দ্বারা, কোন মানুষ বা পশুদ্বারা, প্রাণহীন বা প্রাণবাণ দেবতা অসুর বা সর্পাদি দ্বারা, বা কোন অস্ত্রশস্ত্রেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে আমি যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই। জীবের ওপর আপনার একাধিপত্য ও লোকপালদের মহিমা আমাকে দিন, আমার তপস্যার প্রভাব যেন কোন দিন নষ্ট না হয়। হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মা এই সমস্ত বর দিয়ে প্রস্থান করলেন।

তারপর হিরণ্যকশিপু জগতের সকলকে পরাজিত করে স্বর্গে ইন্দ্রের গৃহে বাস করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছাড়া আর সকলেই তাঁর উপাসনা করতে লাগল। গন্ধর্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর ও অপ্সরা

সকলেই তাঁর স্তব গান করত। তিনি সমস্ত যজ্ঞে হরির ভাগ গ্রহণ করতেন। তাঁর এমন প্রভাব হল যে বিনা বর্ষণেই পৃথিবী শস্য দিত। সাগর ও নদীরাও রত্ন দিতে লাগল। বৃক্ষ সব ঋতুতেই ফল পুষ্প শোভিত হল। এই ভাবে বহুকাল অতিবাহিত হবার পরে তাঁর উগ্র দণ্ডের ফলে সকলের উদ্বেগ হল। তারা হরির শরণ নিলে অশরীরী বাণী শোনা গেল, হিরণ্যকশিপু যখন নিজের পুত্র প্রহ্লাদের উপরে অত্যাচার করবে, তখন আমি তাকে বধ করব। এই দৈববাণী শুনে দেবতারা বললেন, আর ভয় নেই, এবারে অসুর মরবে। বলে সবাই স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্র। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ মহান্‌ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের যেমন সদ্‌গুণ, তেমনি তাঁর মধ্যেও ছিল। দেবতারা অসুরদের শত্রু হয়েও প্রহ্লাদকে সাধন মার্গে আদর্শ বলে স্বীকার করেন। বাসুদেবে তাঁর ভক্তি ছিল স্বাভাবিক। তিনি কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দে গান গাইতেন। কখনও বা নির্লজ্জের মতো নৃত্য করতেন। এই রকমের মহাত্মা পুত্রের প্রতিও হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, এই রকমের শুদ্ধ চরিত্র পুত্রের প্রতি পিতা কেন দ্রোহাচরণ করেন, তা জানতে ইচ্ছা করছে।

নারদ বললেন, অসুররা শুক্রাচার্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটেই থাকতেন। তাঁরা প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুর বালককে দণ্ড নীতি প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় পড়াতেন। একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্রকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কী ভাল লাগে? প্রহ্লাদ বললেন, 'আমি ও আমার' এই অসৎ অভিনিবেশের জন্য মানুষ সর্বদাই উদ্বিগ্ন। তাই আত্মার অধঃপতনের কারণ এই অন্ধকূপের মতো গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে হরির আশ্রয় নেওয়াই আমি ভাল মনে করি। পুত্রের এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু হেসে বললেন,

শত্রুর বুদ্ধিতে বালকদের বুদ্ধি পরিচালিত হয়। গুরুগৃহে এদের ভাল করে রক্ষা করা দরকার, যাতে শত্রু পক্ষের কেউ ছদ্ম বেশে এদের বুদ্ধি বিচলিত না করে। গুরুরা প্রহ্লাদকে স্বগৃহে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বল তো, কেমন করে তোমার এই বুদ্ধি বিপর্যয় হল ? প্রহ্লাদ বললেন, যাঁকে জানতে চেষ্টা করে ব্রহ্মারও মোহ জন্মায়, তিনিই আমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। গুরুরা নিরুপায় হয়ে তাঁকে ভৎ´সনা করে বললেন, ওরে কে আছিস, বেত আন্ দেখি! এর জন্যেই আমাদের অখ্যাতি, তাই একে দণ্ড দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। এই ভাবে তাঁকে ভয় দেখিয়ে গুরু পুত্ররা প্রহ্লাদকে ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের বিদ্যা পাঠ করালেন। আরও কিছুদিন অতি-বাহিত হবার পর তাঁকে নিয়ে হিরণ্যকশিপুর কাছে গেলেন। প্রহ্লাদ তাঁর পিতাকে প্রণাম করতেই তিনি তাঁকে আদর করে কোলে বসিয়ে বললেন, এতদিন গুরুগৃহে থেকে যা শিখেছ, তার থেকে কিছু ভাল কথা আমাকে শোনাও। প্রহ্লাদ বললেন, বিষ্ণুতে ভক্তি যদি কেউ শিখে থাকে, তবে তারই ভাল অধ্যয়ন হয়েছে বুঝতে হবে। পুত্রের এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুপুত্রকে বললেন, আপনারা কি আমার শাসন অমান্য করে একে এই শিক্ষা দিয়েছেন ? গুরুপুত্র বললেন, একে আমরা এই শিক্ষা দিই নি, অন্য কেউও দেয় নি। এ তার স্বাভাবিক বুদ্ধি। হিরণ্যকশিপু তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে ? প্রহ্লাদ বললেন, যারা বিষয়ে আসক্ত, তারা অধ্যাত্মজ্ঞানগম্য ভগবানকে জানতে পারে না। বেদ থেকেই জানা যায় যে এক দেবতাই সর্ব ভূতে আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। তবু গৃহাসক্ত মানুষের সাধুসঙ্গ না হলে বিষ্ণুর পদস্পর্শ লাভ করে না। এই কথা শুনেই হিরণ্যকশিপু বেগে প্রহ্লাদকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। বললেন, একে দূরে নিয়ে যাও। যে ছেলে পাঁচ বছর বয়সেই নিজের বাপ মাকে ছেড়ে পিতৃব্য হন্তাকে দাসের মতো অর্চনা করে তাকে বধ করা উচিত। ঔষধের মতো

উপকার করলে পরের পুত্রকেও নিজের সন্তানের মতো গ্রহণ করতে হয়। আবার নিজের কোন অঙ্গ যদি বিষাক্ত হয়, তাহলে সেই অঙ্গ ছেদন করেই অবশিষ্ট অঙ্গ রক্ষা করতে হয়।

দৈত্যরা এই আদেশ পেয়ে 'মার মার, কাট কাট' বলে চিৎকার করে প্রহ্লাদের কর্মস্থলে শূলের আঘাত করতে লাগল। সে আঘাত নিষ্ফল হলে হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্বত থেকে প্রক্ষেপ, মায়াবাজী, গর্তে আবদ্ধ রাখা, অনাহারে রাখা, বিষ প্রদান, হিম ঝড় আগুন জল এবং পাথর চাপা দিয়েও হত্যার চেষ্টা হল। কিন্তু কোনমতেই তাঁকে হত্যা করতে না পেরে হিরণ্যকশিপু ভাবলেন, এই বালকের মৃত্যু নেই, কোন ভয়ও নেই। এর সঙ্গে বিরোধের ফলে হয়তো বা আমারই মৃত্যু হবে। এই ভেবে তিনি যখন অধোবদন হয়ে আছেন, তখন ষণ্ড ও অমর্ক এই দুই গুরুপুত্র তাঁকে নির্জনে বললেন, আপনি ত্রিলোক বিজয়ী, দিকপাল দেবতারাও আপনার ভয়ে ভীত। আপনি এমন চিন্তান্বিত কেন তা বুঝি না। প্রহ্লাদ এখনও বালক, তার ব্যবহারের দোষ গুণ বিচারের প্রয়োজন নেই। বয়স বাড়লে তার বুদ্ধিও ভাল হবে। গুরু শুক্রাচার্য না ফেরা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। গুরুপুত্রদের কথা অনুমোদন করে হিরণ্যকশিপু বললেন, তাই হোক। ততদিন আপনারা একে গৃহস্থের রাজধর্মের বিষয়ে উপদেশ দিন।

এরপর আচার্যরা তাঁকে ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ এই শিক্ষা ভাল বলে মেনে নিতে পারলেন না। গৃহের কাজে তাঁরা যখন অন্যত্র গেলেন, তখন অন্যান্য সমবয়সী বালকেরা অবসর বুঝে প্রহ্লাদকে ডাকল। তাদের বুদ্ধি দূষিত ছিল না বলে তারা প্রহ্লাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। প্রহ্লাদ তাদের বললেন, মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, অল্পকাল স্থায়ী হলেও এই জন্মে পরমার্থ লাভ সম্ভব। দেহ থাকলেই অদৃষ্ট বশে সুখ দুঃখ লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য চেষ্টা আয়ুক্ষয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। শত

বৎসর মানুষের আয়ু। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির আয়ু তার অর্ধেক, তার কারণ নিদ্রায় তার নিরর্থক কাল কাটে। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের কুড়ি বৎসর কাটে বাল্য ও কৈশোরের খেলাধুলোয়, জরাগ্রস্ত ও অসমর্থ অবস্থায় কাটে শেষ কুড়ি বছর। অবশিষ্ট পরমায়ু গৃহাসক্ত মোহে বৃথা নষ্ট হয়। তাই নিজের চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করা যায় না বলে নারায়ণের শরণ নেওয়াই উচিত। দেবর্ষি নারদের নিকটে আমি এই ভাগবত ধর্মের কথা শুনেছি।

দৈত্য বালকরা বলল, প্রহ্লাদ, আমরা তো দুই গুরুপুত্র ষণ্ড ও অমর্ক ছাড়া আর কাউকে জানি না। আমাদের সংশয় হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা বলে আমাদের সংশয় দূর কর।

নারদ বললেন, প্রহ্লাদ এই কথা শুনে আমার উপদেশ স্মরণ করে বলতে লাগলেন, তপস্যার জন্য আমার পিতা মন্দর পর্বতে গেলে দেবতারা দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করলেন। এই কথা জেনেই দানব দলপতিরা ভয়ে স্ত্রী পুত্র ফেলে পালিয়ে গেলেন। দেবতারা এসে দৈত্য রাজপুরী পর্যন্ত লুণ্ঠন করলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতাকে টেনে নিয়ে চললেন। মা যখন ভয়ে কাতর হয়ে কাঁদছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে বললেন, দেবরাজ, ইনি পরস্ত্রী ও সতী, এঁকে ছেড়ে দিন। ইনি অন্তঃসত্ত্বা, যতদিন এঁর সন্তান না হয় ততদিন ইনি আমার গৃহে থাকুন। দেবর্ষির কথায় ইন্দ্র আমার মাকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন এবং দেবর্ষি তাঁকে নিজের আশ্রমে এনে বললেন, তোমার পতি না ফেরা পর্যন্ত তুমি এই আশ্রমেই থাক। আমার মা ঋষির আশ্রমে থেকে তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। আমার জন্যে তিনি যে জ্ঞান ও ধর্মের তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন, মা তা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে সেই স্মৃতি আমার আজও আছে। হরি সকল জীবের আত্মা ও ঈশ্বর, তিনি সকলের অন্তর্যামী। তাঁর চিন্তায় আমি যেমন শান্তি পাই, তোমরাও তেমনি শান্তি পাবে, মঙ্গল হবে তোমাদের।

দৈত্য বালকেরা গুরু ষণ্ড ও অমর্কের শিক্ষা পরিহার করে প্রহ্লাদের বিবেচনা গ্রহণ করল। গুরু যখন দেখলেন যে সমস্ত বালকের বুদ্ধিই এক রকম হয়েছে, তখন ভয় পেয়ে রাজার নিকটে গিয়ে সমস্ত জানালেন। রাজা হিরণ্যকশিপু রোষাবিষ্ট হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন, তুমি কি আমাদের কুল নাশ করবার জন্য জন্মেছ? কার বলে তুমি আমার শাসন লঙ্ঘন করছ?

প্রহ্লাদ বললেন, যাঁর বলে আমি বলবান, তিনি শুধু আমার নন। আমার আপনার ও সকলেরই বল তিনি। নিজের বলে তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলকেই বশীভূত করে রেখেছেন। মনে সমভাব ধারণ করলে আপনারও আর বিদ্বেষ থাকবে না। উৎপথগামী মন ছাড়া আর শত্রু নেই। মনের সমভাবই অনন্তের শ্রেষ্ঠ আরাধনা।—

ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহ প্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥ ৭।৮। ৯-১০

যাঁরা জ্ঞানী ও সবার প্রতি সমভাবাপন্ন, তাঁদের আর কল্পিত শত্রু থাকে না।

হিরণ্যকশিপু বললেন, মরবার জন্যই বোধহয় তুমি এই কথা বলছ! তোমার জগদীশ্বর কোথায় আছে বল। তুমি যে বলছ তিনি সর্বত্র আছেন, কই, এই স্তম্ভের মধ্যে তো তাঁকে দেখা যাচ্ছে না? আজ আমি তোমার মাথা কাটছি, দেখি হরি তোমাকে কেমন করে রক্ষা করে! বলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জন করে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে সবলে স্তম্ভের উপরে মুষ্টির আঘাত করলেন। অমনি সেই স্তম্ভ থেকে ভীষণ শব্দ উত্থিত হল। সেই ধ্বনি শুনে হিরণ্যকশিপু সভার দিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু যে শব্দ শুনে দানবেরা ভীত হয়েছিল তার কারণ দেখতে পেলেন না। ভগবান ভক্ত প্রহ্লাদের কথা সত্য প্রমাণ করবার জন্য অদ্ভুত এক রূপে স্তম্ভ

থেকে বহির্গত হলেন। সে রূপ মৃগের নয়, মানুষেরও নয়। সে কি নৃমৃগেন্দ্র নরসিংহ রূপ! জলন্ত স্বর্ণগোলকের মতো চোখ, জটা-কেশরে আবৃত বিশাল মুখ, তীক্ষ্ণ দন্ত ও ক্ষুরধার জিহ্বা, শঙ্কুর মতো কান এবং বিদীর্ণ প্রান্তের গণ্ড ভীষণদর্শন। দেহ তার গগনস্পর্শী, স্থূল গ্রীবা, প্রশস্ত বক্ষ ও কৃশ উদর। চন্দ্র কিরণ ধবল রোমে আবৃত তার সারা দেহ, চারিদিকে প্রসারিত বাহু, তাতে আয়ুধের মতো ভয়ঙ্কর মুখ। এই মূর্তি দেখে হিরণ্যকশিপু বললেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনে সমর্থ এই হরিই আমার মৃত্যুর কারণ হবেন। এই বলে তিনি গর্জন করে গদা হাতে নৃসিংহকে আক্রমণ করলেন। তাঁর পরাক্রম দেখে দেবতারা ব্যাকুল চিত্তে মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলেন। হিরণ্যকশিপু খড়্গ বর্ম নিয়ে শ্যেন বেগে উপরে ও নিচে ভ্রমণ করছিলেন। নৃসিংহ তাঁকে ধরতেই তিনি যেন বিবশ হয়ে গেলেন। সভার দ্বারে-বাহিরে বা ভিতরে নয়, উরুর উপরে—ভূমিতে বা শূন্যে নয়, নখ দিয়ে—অস্ত্র শস্ত্রে নয়, দিবা বা রাত্রি নয়—এইরকম সন্ধ্যায় হরি নখ দিয়ে অসুরকে বিদীর্ণ করলেন। তারপর ক্রোধাবেশে তিনি নৃপাসনে বসলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ তাঁর সেবা করতে অগ্রসর হল না।

দেবতাদের বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত হল। তাঁরা দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। গন্ধর্বরা গান আরম্ভ করলেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র ঋষি চারণ প্রভৃতি বিষ্ণু পার্ষদেরা অনতিদূরে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পৃথক ভাবে স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা দূর থেকেই স্তব করলেন, কাছে যেতে কেউ সাহস পেলেন না। লক্ষ্মীও এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শঙ্কায় সমীপে গেলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে বললেন, প্রভুর ক্রোধ উপশমের জন্য তুমি নিকটে যাও।

'যথা আজ্ঞা' বলে প্রহ্লাদ নৃসিংহের নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। নৃসিংহ তাঁর মাথায় হাত রাখতেই প্রহ্লাদ তাঁর স্তব করে

বললেন, সকলের ভয় দূর করবার জন্য আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন।

নৃসিংহ প্রীত হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন, তুমি বর নাও, বলে তাঁকে অনেক রকম বরের লোভ দেখালেও প্রহ্লাদ কিছুই চাইলেন না। বললেন, স্বভাবতই মানুষ কামনায় আসক্ত। বর দিয়ে আপনি আমাকে কামনার লোভ দেখাবেন না। আপনাকে পেয়েও যে সাংসারিক মঙ্গল চায়, সে আপনার ভৃত্য নয়। তবে বর দিয়ে আপনি যদি সন্তোষ লাভ করেন, তবে এই বর দিন যে আমার হৃদয়ে যেন কামনার অঙ্কুর উদ্‌গত না হয়।

ভগবান বললেন, বৎস, তোমার মতো ভক্ত ইহকাল বা পরকালের জন্যেও কিছু চায় না। তবু আমার আজ্ঞা পালন কর। তুমি এই মন্বন্তর কাল এখানে দৈত্য রাজ্য ভোগ কর। পুণ্য আচরণ করে পাপ ক্ষয় কর।

প্রহ্লাদ বললেন, আপনার কাছে আমি আর একটি বর চাই। আমার পিতা আপনাকে না জেনে নিন্দা করেছেন। তাঁর ভাইকে হত্যা করেছেন বলে আমার উপরে অত্যাচার করেছেন। এই পাপ থেকে তাঁকে মুক্তি দিন।

ভগবান বললেন, তোমার কুল পাপ মুক্ত হয়েছেন। এইবারে তোমার পিতার প্রেত কার্য কর। তারপর পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হও।

ভগবানের আজ্ঞানুসারে প্রহ্লাদ তাঁর পিতার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করলেন। ব্রহ্মা নৃসিংহের স্তব করে বললেন, আমাদের ভাগ্য যে আপনি অসুর বধ করে জনগণের সন্তাপ দূর করলেন। ভগবান বললেন, অসুরদের আপনি এ রকম বর আর দেবেন না। বলে অন্তর্হিত হলেন।

এর পর ব্রহ্মা শুক্রাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য-দানবের আধিপত্য দান করলেন এবং আশীর্বাদ করে ফিরে গেলেন।

ত্রিপুর দহন

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই ভাবে বিষ্ণুর তুই পার্ষদ নিহত হল। এ কথা ভেবো না যে প্রহ্লাদ ভাগ্যবান, আর তুর্ভাগ্য আমাদের। বিষ্ণু এখন মানুষ হয়ে গোপনে অবস্থান করছেন। তিনি তোমাদের প্রিয় বান্ধব, সুহৃদ ও আত্মীয়। তোমাদের প্রতি প্রসন্ন তিনি। অসংখ্য মায়া বিস্তারে নিপুণ ময় দানব যখন দেবাদিদেব রুদ্রের যশ বিনাশ করেন, তখনও তিনি তাঁর মহিমা বিস্তার করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, ময় দানবের কোন্ কাজে শঙ্করের যশ বিনষ্ট হয়েছিল ?

নারদ বললেন, দেবতা ও দানবদের যুদ্ধে বিষ্ণু দানবদের পরাজিত করেন। তারা ময় দানবের শরণাগত হলে তিনি তাদের স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহ দিয়ে তিনটি পুরী নির্মাণ করে দেন। সেই সব পুরীর মধ্যে দানবেরা কী ভাবে যাতায়াত করত তা কেউ বুঝতে পারত না। আর সেখানে কত দ্রব্য আছে তা জানাও সম্ভব ছিল না। অসুররা এই তিনটি পুরীতে অদৃশ্য থেকে পূর্বের শত্রুতা বশে ত্রিলোকের বিনাশ আরম্ভ করল। সকলে তখন শিবের নিকটে গিয়ে বললেন, ত্রিলোক আপনার, তাই ত্রিপুরবাসী দানবদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। শিব তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় পেও না। বলে নিজের ধনুতে শর যোজনা করে ত্রিপুরের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই শরটি অগ্নিবর্ণ বহু শর হয়ে ত্রিপুর আচ্ছন্ন করল। ত্রিপুরবাসী দানবেরা মৃত্যু কবলিত হতে লাগল। এই দেখেই মায়াবী ময় মৃত দানবদের এক অমৃতময় কূপে ফেলতে লাগল এবং সেই অমৃত স্পর্শে মৃত তারা দৃঢ় শরীর নিয়ে পুনরায় উত্থিত হল। এতে সঙ্কল্প ভঙ্গ হল বলে শঙ্কর বিমনা হলেন এবং তাই দেখে বিষ্ণু এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। নিজে গাভীর মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মাকে বৎস রূপে নিয়ে ত্রিপুরে প্রবেশ করলেন এবং অমৃতময় কূপের সমস্ত অমৃত

নিঃশেষে পান করলেন। অসুররা তা দেখেও মায়ামোহিত হয়ে নিষেধ করতে পারল না। শঙ্কর এই ব্যাপার বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে লোকপালদের বললেন। তাঁর যুদ্ধের উপকরণ বিষ্ণু নিজে রচনা করে দিলেন। যুদ্ধের বেশ পরিধান করে তিনি মধ্যাহ্নে রথে আরোহণ করে ধনুতে শর যোজনা করলেন। দানবদের তিনটি দুর্ভেদ্য পুরী একসঙ্গে দগ্ধ হল। শত শত বিমানে আচ্ছন্ন আকাশে দুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল। পুষ্প বর্ষণের সঙ্গে জয়ধ্বনি শোনা গেল দেবতা ও ঋষিদের। তাঁরা আনন্দে গান ও নৃত্য করলেন। অপ্সরারা এই ভাবেই উৎসব করেন।

সনাতন ধর্ম

শুক বললেন, প্রহ্লাদের পবিত্র চরিত কথা শুনে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ধর্ম অনুশীলন করে মানুষ পরম বস্তু লাভ করতে পারে, সেই সনাতন ধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছা করছে।

নারদ বললেন, নারায়ণের মুখে শোনা সনাতন ধর্মের কথা বলছি শোন। এই নারায়ণ ঋষি ভগবানের অংশে ধর্ম ও দাক্ষায়নীর সন্তান রূপে জন্মে বদরিকাশ্রমে তপস্যায় নিরত হয়ে আছেন। বেদময় হরিই ধর্মের মূল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের স্মৃতিও ধর্ম। তাতে আত্মার প্রসন্নতা লাভ হয়। মানুষের সাধারণ ধর্ম হল সত্য দয়া তপস্যা শৌচ তিতিক্ষা বিবেক শম দম অহিংসা ব্রহ্মচর্য ত্যাগ স্বাধ্যায় আর্জব সন্তোষ সেবা নিবৃত্তি বহির্দৃষ্টি দেহে অনাত্মবুদ্ধি ও মানুষে দেবতাজ্ঞান। কৃষ্ণের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ, তাঁর সেবা অর্চনা প্রণাম সখ্য দাস্য ও তাঁতে আত্মসমর্পণ পরম ধর্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম অধ্যয়ন অধ্যাপনা যজন যাজন ও দান পরিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের অন্য কয়টি ধর্ম এবং প্রজাপালনে নিযুক্ত হলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের নিকটে কর গ্রহণ। বৈশ্যের জীবিকা কৃষি ও বাণিজ্য। এবং শূদ্রেরা

সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করবেন। শম দম তপস্যা শৌচ সন্তোষ ক্ষান্তি আর্জব জ্ঞান দয়া অচ্যুতাত্মতা ও সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য বীর্য ধৈর্য তেজ ত্যাগ ইন্দ্রিয়জয় ক্ষমা ব্রহ্মণ্যতা প্রসন্নতা ও সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেব গুরু ও অচ্যুতে ভক্তি, ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পোষণ, আস্তিক্য নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য বৈশ্যের লক্ষণ। নমস্কার, শৌচ, অকপট ভাবে প্রভুর সেবা, মন্ত্র উচ্চারণ না করে যজ্ঞ করা, চুরি না করা, সত্য ও গো বিপ্রের রক্ষা শূদ্রের লক্ষণ।

নারীর ধর্ম পতির অনুকূল হয়ে শুশ্রূষ, তাঁর আত্মীয়ের অনুবর্তন ও পতির ব্রত পালন। মার্জন লেপন ও চিত্রাদি অঙ্কন করে গৃহের শোভা বর্ধনও তাঁদের কাজ। নিজেরাও সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকবেন। সাধ্বী পত্নী পতির কামনা অনুসারে দম ও বিনয়ে সত্য কথা ও প্রীতি ব্যবহারে পতির সেবা করবেন। সতী স্ত্রী অনলস নির্লোভ যথালাভে সন্তুষ্ট ও ধর্মপ্রাণ হয়ে সব দিকে দৃষ্টি রেখে সত্য ও প্রিয় কথায় শুচিতা ও স্নিগ্ধতা বজায় রেখে নির্দোষ ভাবে স্বামীর সেবা করবেন। পতিকে যিনি হরির মতো সেবা করেন, তিনি লক্ষ্মীর মতো পরম পতির সঙ্গে আমোদিত হন।

মিশ্রজাতি ও প্রতিলোমজাত ব্যক্তির নিজের কুলকর্মই ধর্ম। চৌর্য বা হিংসা ধর্ম নয়। কোন বর্ণের ব্যক্তির মধ্যে অন্য বর্ণের লক্ষণ দেখা দিলে সেই ব্যক্তির লক্ষণ অনুসারেই বর্ণ নির্দেশ করতে হবে।

ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় দমন করে গুরুর সেবক রূপে গুরুকুলে বাস করবে। ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র জপ বেদপাঠ ও ভিক্ষা করে পরিমিত আহার করবে। স্ত্রী প্রসঙ্গ বর্জন করতে হবে। ইন্দ্রিয় সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে বলে যুবা ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীকে দিয়ে কেশ প্রসাধন বা গাত্র মর্দনাদি করাবে না। কারণ যুবতী নারী অগ্নির মতো এবং ঘৃতকুম্ভের মতো পুরুষ। নির্জনে কন্যার সঙ্গেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় থাকবে না।—

নগ্নগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃত কুম্ভসমঃ পুমান্।
স্মৃতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ ৭।১২।৯

ব্রহ্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীরও পালনীয়। গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হতে পারেন, সন্ন্যাসও অবলম্বন করতে পারেন। বাণপ্রস্থ আশ্রমে সূর্যপক্ক ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। গৃহ পর্ণকুটির বা গিরিগুহায় আশ্রয় নিতে হয় শুধু অগ্নি স্থাপনের জন্য। অন্তত এক বৎসর তপস্যা করে বনে বিচরণ করতে হয়। ব্যাধি বা বয়সের আধিক্যে কাজে অসমর্থ হলে অনশন ব্রত গ্রহণ করতে হয়। স্বদেহে অগ্নি সংযোগ করে দেহ পঞ্চভূতে বিলীন করে দেবে।

জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকরে অনিকেতন হয়ে ভ্রমণ করে কাল যাপন করবেন। কোন গ্রামে এক রাত্রির বেশি থাকবেন না। কৌপীন ও দণ্ডাদি চিহ্ন ছাড়া আর সব কিছু পরিত্যাগ.করবেন। বন্ধন ও মোক্ষ এই দুই-ই মায়া বলে মানবেন। নক্ষত্র বিদ্যা বা জ্যোতিষ দিয়ে জীবিকা অর্জন করবেন না, তর্ক বিদ্যা ত্যাগ করবেন, প্রলোভনে শিষ্য নেবেন না, মঠ নির্মাণে আগ্রহ করবেন না এবং ধর্ম ব্যাখ্যা করে অর্থ গ্রহণ করবেন না। কোন আশ্রম চিহ্ন ধারণ না করেও সাধারণের সামনে পাগল বা বালকের মতো অবস্থান করা যায়, পণ্ডিত হয়েও মূকের মতো থাকা যায়। এরই উদাহরণ রূপে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলছি।—

এক মুনি অজগর ব্রত ধারণ করে কাবেরী নদীর ধারে সহ্য পর্বতের সানুদেশে শয়ন করেছিলেন। দেহের উপরে ধুলো পড়ে তাঁর তেজ গোপন ছিল। ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর কয়েকজন অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে লোকতত্ত্ব জানবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে চিনতে না পারলেও তিনি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, বিনা ভোগে আপনার দেহ এমন স্থূল হল কেমন করে তা জানবার ইচ্ছা হচ্ছে। ব্রাহ্মণ বললেন, ভোগের তৃষ্ণা নিয়ে আমার অনেক

জন্ম হয়েছে। এই তৃষ্ণার জন্যই আমার মানুষ জন্ম। এই দেহে ধর্মানুষ্ঠান স্বর্গের দ্বার, অধর্মে নীচ যোনিতে জন্ম, ধর্মাধর্ম মিশ্র কর্মে মনুষ্য জন্ম এবং ধর্ম ও অধর্ম সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারলেই মোক্ষের দ্বার পাওয়া যায়। সুখ দুঃখ পরিহারের জন্যই আমি সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। জীবের আত্মার রূপই সুখ এবং বাসনা নিবৃত্তিতে সুখের অনুভব। তাই ভোগ্য সামগ্রী অনিত্য বুঝে আমি নিরুদ্যম হয়েছি। ভ্রমর ও অজগরের নিকটে আমি বৈরাগ্য ও পরিতোষ শিখেছি। তারা আমার গুরু। ভ্রমরের বহু কষ্টে সঞ্চিত মধু লোকে হরণ করে, অজগর নিশ্চেষ্ট হয়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমিও যা পাই তাই খাই, যা জোটে তাই পরি। শয়নের নির্দিষ্ট স্থান নেই, ভ্রমণেরও নিয়ম নেই। কারও নিন্দা বা বন্দনা করি না, বিষ্ণুকে প্রাণের দেবতা জেনে তাঁকেই স্মরণ করি। এই ভাবেই আত্মাভিমানের বিলোপ হয়।

নারদ বললেন, মুনির কাছে প্রহ্লাদ এই পরমহংস ধর্মের উপদেশ শুনে তাঁর পূজা করে গৃহে ফিরলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, এইবারে গৃহস্থ যে ধর্ম পালন করলে উন্নত হতে পারেন তাই বলুন।

নারদ বললেন, গৃহস্থ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে বাসুদেবকে সমর্পণ করবে। যে পরিমাণ অর্থের একান্ত প্রয়োজন তাই গ্রহণ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে, কিন্তু বাহিরের ব্যবহার হবে অনুরক্ত লোকের মতোই। বেশি ভোগের অভিমান থাকলে তাকে চোর বলা যায়। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে তা দণ্ডনীয়। সকল জীবকে নিজের সন্তানের মতো মনে করবে। খুব কষ্ট করে ধর্ম অর্থ ও কামনা পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয়। ভোগ্য বস্তু সবাইকেই সমান ভাবে ভাগ করে দেবে। পত্নীকে অতিথির সেবায় নিযুক্ত করলে যদি নিজের যত্নের ত্রুটি হয় তো তা স্বীকার করবে। স্ত্রীর মমতা যে ত্যাগ করতে পারে, সে ভগবানকে জয় করতেও সমর্থ হয়। স্বামীর ভাবনা ত্যাগ করা

পত্নীর পক্ষে কঠিন। দেহের শেষ পরিণতি তো ভস্ম! তাই দেহের জন্যও মমতা থাকা উচিত নয়। গৃহস্থ তার অদৃষ্ট অনুসারে প্রাপ্ত অর্থে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে এবং অবশিষ্ট অর্থে জীবিকা নির্বাহ করবে। দেবতা ঋষি পিতৃগণ মানুষ ও জীব—এঁরাই পঞ্চযজ্ঞের দেবতা।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ কর্মনিষ্ঠ, কেউ তপোনিষ্ঠ, কেউ স্বাধ্যায় নিরত, কেউ বেদব্যাখ্যায় নিপুণ, কেউ বা জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা লাভ করেন। বিধর্ম পরধর্ম ধর্মাভাস উপধর্ম ও ছল ধর্ম অধর্মেরই শাখা। যাতে স্বধর্মে বাধা পড়ে তা বিধর্ম, অন্যের উপদিষ্ট ধর্ম পরধর্ম, পাষণ্ডের ধর্ম উপধর্ম এবং যা নামে ধর্ম কাজে নয়, তারই নাম ছল ধর্ম। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এগুলি ত্যাগ করবেন। স্বকপোলকল্পিত পূজা ধর্মাভাস, তাও ধর্ম নয়। পাদুকা নিয়ে যেমন সুখে বিচরণ করা যায়, তেমনি মন সন্তুষ্ট থাকলে সবদিকেই মঙ্গল। মন সন্তুষ্ট না থাকলে লালসার বশীভূত হয়ে কুকুরের মতো ছুটোছুটি করতে হয়! অসন্তুষ্ট ব্যক্তির বিদ্যা তপস্যা তেজ ও যশ ইন্দ্রিয়ের লালসায় বিনষ্ট হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হলে কাম শেষ হয়, অন্নজল পেলে কামনার অন্ত হয়, কামনা পূরণেই ক্রোধের সমাপ্তি। কিন্তু পৃথিবী ভোগ করেও লোভের শেষ নেই।—

কামস্যান্তং হি ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ।

জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ॥ ৭।১৫।২০

সঙ্কল্প ত্যাগ করে কামকে জয় করতে হয়, কাম পরিত্যাগ করলে ক্রোধ জয় করা যায়। অর্থ যে অনর্থের মূল, তা জেনে লোভকে জয় করতে হয় এবং কেউ কারও দুঃখের কারণ নয়, এই তত্ত্ব বিচার করেই ভয়কে জয় করা যায়। আত্মা ও অনাত্মা বিচার করে শোক ও মোহ জয় করতে হয়, দম্ভ ও অভিমানকে জয় করতে হয় মহতের উপাসনা করে। মৌন অভ্যাস করবে ও হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

আধি ভৌতিক আধি দৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখ।

আধি ভৌতিক বা কোন প্রাণীর জন্য দুঃখ হলে তাকে দয়া করেই দুঃখ ত্যাগ করবে। দৈব বা অজ্ঞাত কারণে দুঃখ হলে সমাধি অবলম্বন করে তা নিরাকরণ করবে। দুঃখ আধ্যাত্মিক হলে যোগবলে তা পরাজিত করবে। গুরু ভগবানের স্বরূপ।

চিত্ত জয়ের জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে নির্জনে বাস করতে হয়। ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার্যে কোন মতে দেহ ধারণ করতে হয়। আত্মজ্ঞানীর ইন্দ্রিয় চাপল্য থাকে না। পণ্ডিতরা এই দেহকে রথ বলেছেন। ইন্দ্রিয়রা রথের অশ্ব, মন সেই অশ্বের মুখের বল্‌গা। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শময় জগৎ এই রথের গন্তব্য পথ। বুদ্ধি তার সারথি, চিত্ত রথের বন্ধন রজ্জু এবং বন্ধনের কর্তা পরমেশ্বর। ধর্ম ও অধর্ম রথের দুই চাকা, দশ প্রাণবায়ু রথ চক্রের অক্ষ। রথী অহঙ্কারী জীব, প্রণব তার ধনুক ও শুদ্ধ জীবস্বরূপ তার শর। লক্ষ্য পরম ব্রহ্ম। এই দেহ রথের প্রধান উপাদান ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে দেহ ধারণ করবে। গুরু সেবা করে অচ্যুতকে আশ্রয় করবে। তা না হলে অসৎ ইন্দ্রিয় ও সারথি উৎপথে নিয়ে যাবে।

বৈদিক ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুই প্রকার। প্রবৃত্তির পথে বার বার ফিরে আসা, আর নিবৃত্তির পথে অমৃত ভোগ। কর্মের দ্বারা আরোহণ ও অবরোহণক্রমে সংসারে আবৃত্তি হয়। নিবৃত্তির পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। বেদ নির্মিত পিতৃযান প্রবৃত্তি কর্ম মার্গ এবং দেবযান নিবৃত্তির পথ।

পঞ্চভূত একত্র হয়ে এই দেহ নির্মল হয় নি, এই দেহ পঞ্চভূতের বিকারও নয়। দেহ বা ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এরা যেমন মিথ্যা, তেমনি পঞ্চভূতও মিথ্যা। সবই যদি মিথ্যা তো কাকে নিয়ে শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ! এই আশঙ্কার উত্তর আছে। অজ্ঞান অবিদ্যার অবস্থায় শাস্ত্রের বিধি নিষেধ।

নারদ বললেন, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা বহু বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছ। পুরাকালে আমি উপবর্হন নামে একজন সম্মানিত

গন্ধর্ব ছিলাম। প্রিয়দর্শন বলে স্ত্রীলোকেরা আমাকে ভালবাসত। আমি মদমত্ত হয়ে লম্পটের মতো নিজের গৃহে বাস করতাম। এক-দিন দেবতাদের যজ্ঞে হরিগাথা গানের জন্য ব্রহ্মা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের ডাকলেন। স্ত্রীলোক পরিবৃত হয়ে আমিও প্রমত্ত ভাবে সেখানে উপস্থিত হলাম। আমার ধৃষ্টতা ও অবহেলা দেখে ব্রহ্মা শাপ দিলেন তুমি শূদ্র হও। এই শাপে মুনিদের এক দাসীর গর্ভে আমার জন্ম হল। তারপর সেই মুনিদের সেবা করেই পুনরায় আমি ব্রহ্মার পুত্র হয়ে জন্মেছি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। তোমরা ভাগ্যবান। মুনিরা তোমাদের গৃহে যাতায়াত করছেন। পরম ব্রহ্ম মানুষ হয়ে গোপনে অবস্থান করছেন। কৃষ্ণ তোমাদের প্রিয় সুহৃদ আত্মীয় ও গুরু। তোমাদের মতো ভাগ্যবান আর কে আছে!

শুক বললেন, যুধিষ্ঠির এই কথা শুনে প্রীত হলেন। দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে স্বস্থানে গমন করলেন।

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত

অষ্টম স্কন্ধ

মন্বন্তর বর্ণনা

পরীক্ষিৎ বললেন, আপনি তো স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের সব কথা বললেন, এবারে অন্য মনুদের কথা বলুন।

শুক বললেন, যে ছয়জন মনুর কাল অতীত হয়েছে, তার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। এই সময়ে হরি ধর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্য স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে ও দেবহূতির গর্ভে কপিল নামে জন্ম নিয়েছিলেন। কপিলের কথা বলেছি, যজ্ঞের কথাও বলব। বিষয় সুখে বিরক্ত হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপাকে নিয়ে তপস্যার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তিনি সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোরতর তপস্যা করেছিলেন। সমাধিমগ্ন অবস্থায় তিনি যখন মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন ক্ষুধার্ত অসুররা তাঁকে বিবশ মনে করে তাঁকে ভক্ষণ করবার জন্য ছুটে আসে। তাই দেখে যজ্ঞ তাঁর পুত্র যাম নামে দেবতাদের নিয়ে ছুটে এসে অসুর ও রাক্ষসদের বিনাশ করেন। তার পর তিনি ইন্দ্র হয়ে স্বর্গ রাজ্য শাসন করেন।

দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ। দ্যুমান সুষেণ রোচিষ্মাণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে ইন্দ্র রোচন, তুষিত প্রভৃতি দেবতা এবং উর্জ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। বেদশিরা ঋষির পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামে এক পুত্র হয়। আটাশী হাজার মুনি সেই কুমার ব্রহ্মচারীর নিকটে ব্রত শিক্ষা করেন।

প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম তৃতীয় মনু। পবন সৃঞ্জয় যজ্ঞহোত্র প্রভৃাত তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে সত্যজিৎ ইন্দ্র, সত্য বেদশ্রুত ও ভদ্ররা দেবতা এবং বশিষ্ঠের পুত্র প্রমদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। হরি ধর্মের পত্নী

সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রতদের সঙ্গে সত্যসেন নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইন্দ্র সত্যজিতের সখা হয়ে যক্ষ রাক্ষস ও হিংস্র প্রাণী বধ করেছিলেন।

উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু। পৃথু খ্যাতি নর কেতু প্রভৃতি দশজন তার পুত্র। এই মন্বন্তরের দেবতা সত্যক হরি ও বীরগণ, ইন্দ্র ত্রিশিখ এবং জ্যোতিধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি। বিধৃতির পুত্ররাও দেবতা হয়ে কালক্রমে বিনষ্ট বেদ নিজেদের তেজে ধারণ করেছিলেন। হরি হরিমেধসের পত্নী হরিণীর গর্ভে হরি নামে জন্ম নিয়ে গজেন্দ্রকে কুমীরের গ্রাস থেকে মুক্ত করেছিলেন।

গজেন্দ্রের উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, হরি গজেন্দ্রকে কীভাবে মুক্ত করেন তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন করলে শুকদেব মুনিদের সভায় উত্তর দিলেন, ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত চিত্রকুট নামে এক উচ্চ পর্বত আছে। পর্বতে সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরাদের বাস। বনে নানাবিধ পশু এবং উদ্যানে পক্ষী। নদী ও সরোবরও আছে। পর্বতের সন্ধিস্থলে ঋতুমান নামে বরুণের উদ্যানে দেব রমণীরা ক্রীড়া করেন। তাতে সকল ঋতুতে ফলপুষ্পশালী বৃক্ষরাজি এবং কুমুদ কহ্লারে শোভিত সুবিশাল সরোবর পাখির কলরবে মুখর।

একদিন সেই পর্বতের অরণ্যবাসী এক হস্তিযূথপতি হস্তিনীদের সঙ্গে গ্রীষ্মের সন্তাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই সরোবরের নিকটে এল। গজেন্দ্র সরোবরের জলে অবগাহন করে শুঁড় দিয়ে জল পান করল। তারপর নিজে স্নান করে হস্তিনী ও শাবকদের স্নান করাল। এমন সময়ে এক কুমীর এসে তার পা আক্রমণ করল। কাতর গজেন্দ্রকে বলবান কুমীর আকর্ষণ করছে দেখে হস্তিনীরা চিৎকার করতে লাগল। তাতে অন্য হস্তীরা সাহায্য

করতে এসেও তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হল না। গজেন্দ্র ও কুমীর যুদ্ধরত হয়ে একে অপরকে জলের বাহিরে ও ভিতরে আকর্ষণের চেষ্টা করে এক হাজার বছর কাটাল। কিন্তু কারও প্রাণবিয়োগ হল না। এই দীর্ঘ সময় জলে থেকে গজেন্দ্র অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং জলবাসী কুমীরের শক্তি বাড়ল। নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে গজেন্দ্রের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হতেই তার মনে এক চিন্তার উদয় হল। সে ভাবল যে হস্তীরা যখন তাকে উদ্ধার করতে পারল না, তখন হস্তিনী-বাই বা তাকে কেমন করে উদ্ধার করবে! তাই পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হওয়া যাক। এই ভেবে সে পূর্বজন্মে শেখা একটি স্তোত্র জপ করতে লাগল।

এই স্তব শুনে কোন দেবতা তাকে উদ্ধারের জন্য এলেন না দেখে হরি নিজে এলেন গরুড়ে চড়ে। আকাশে তাঁকে দেখতে পেয়ে গজেন্দ্র তার শুঁড়ে একটি পদ্ম উপরের দিকে প্রসারিত করে অতিকষ্টে বলল, ভগবান নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার। হরি গরুড়ের পিঠ থেকে জলে নেমে তাঁর চক্র দিয়ে কুমীরের মুখ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন।

শুক বললেন, দেবতারা হরির প্রশংসা করে পুষ্প বর্ষণ করলেন। দুন্দুভি ধ্বনি হল ও গন্ধর্বরা নৃত্য গীত করলেন। দেবল ঋষির শাপ-মুক্ত হয়ে কুমীর এক আশ্চর্য রূপ ধারণ করল। সে ছিল হূ হূ নামের এক প্রধান গন্ধর্ব। হরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেই সে গন্ধর্বলোকে চলে গেল। গজেন্দ্রও পীতবসনধারী ও চতুর্ভুজ হয়ে হরির সারূপ্য লাভ করল। পূর্বজন্মে সে ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্যদেশজাত দ্রবিড় সত্তম বিষ্ণুভক্ত রাজা। এই জটাধারী তাপস রাজা একদিন তাঁর মলয় পর্বতের আশ্রমে মৌন ব্রত নিয়ে হরির অর্চনা করছিলেন। সেই সময়ে শিষ্য পরিবৃত অগস্ত্য ঋষি এসে উপস্থিত হলে তাঁর সৎকার না করার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী এই দুরাত্মা জড়বুদ্ধি হস্তী হোক। ঋষি এই শাপ দিয়ে চলে গেলে রাজা

ইন্দ্রদ্যুম্নই হস্তী রূপে জন্মেছিলেন। হরি তাঁকে নিজের পার্ষদ করে নিয়ে নিজ ধামে ফিরে গেলেন।

সমুদ্র মন্থন

শুক বললেন, তামসের সহোদর রৈবত পঞ্চম মনু। অর্জুন বলি বিন্ধ্য প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র, ভূতরয় প্রভৃতি দেবতা এবং হিরণ্যরোমা বেদশিরা উর্ধ্ববাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি। শুভ্রের পত্নী বিকুণ্ঠার গর্ভে হরি বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্মীর প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠলোক রচনা করেন।

চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। পূরু পুরুষ সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্য প্রভৃতি দেবতা এবং হর্যস্মান ধারক প্রভৃতি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। বেরাজের ঔরসে দেব সম্ভূতির গর্ভে হরি অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমুদ্র মন্থন করে দেবতাদের জন্য সুধা সংগ্রহ করেছিলেন এবং সমুদ্রের জলে মন্থন দণ্ড মন্দর পর্বত বিচলিত হলে তিনি কূর্ম রূপে সেই পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, সমুদ্র মন্থনের কথা আপনি বলুন।

সূত বললেন, পরীক্ষিতের কথা শুনে শুকদেব বলতে লাগলেন, পুরাকালে দুর্বাসা ঋষির অভিশাপে ত্রিলোক লক্ষ্মীশূন্য হয়েছিল এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া লোপ পেয়েছিল। সেই সময়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা হতাহত হতে থাকলে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতারা সুমেরুর উপরে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হয়ে সব কথা জানালেন। তাঁদের দুর্দশা দেখে ব্রহ্মা বললেন, আমরা হরির শরণ নেব। বলে হরির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ক্ষীরোদ সাগরে গেলেন এবং তাঁর স্তব করে বললেন, যে কাজের জন্য আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি তা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। একটা উপায় করুন। হরি তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বললেন, দৈত্যদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি কর।

বাক্সে বদ্ধ সাপ যেমন ইঁদুরের সঙ্গে সন্ধি করে তাকে দিয়ে বাক্স ছিদ্র করে আগে বেরিয়ে আসে ও পরে ইঁদুরকে খায়, তেমনি নিজেদের কাজ উদ্ধারের জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। তারপর অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর। এই অমৃত পানে মৃত প্রাণীও অমর হতে পারে। এর:জন্য তোমরা ক্ষীরোদ সাগরে তৃণলতা গুল্ম ও ওষধি নিক্ষেপ করে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে সাবধানে মন্থন কর। এতে দৈত্যরা ক্লেশভাগী ও তোমরা ফলভাগী হবে। এর জন্য অসুররা যা চায় তাতেই রাজী হয়ো। সামভাবে যেমন কার্য সিদ্ধি হয়, ক্রোধে তা হয় না।—

ন সংরম্ভেণ সিদ্ধ্যন্তি সর্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥ ৮।৬।২৪

মন্থনের সময় সমুদ্রে সঞ্জাত কালকূট বিষ দেখে ভয় পেও না। অন্য যে সব জিনিস উৎপন্ন হবে, তা পাবার জন্যেও লোভ বা ক্রোধ প্রকাশ কোরো না। হরি এই কথা বলেই অন্তর্ধান হলেন এবং দেবতারা ফিরে এলেন।

ব্রহ্মা ও শিব গেলেন নিজের ধামে এবং অন্য দেবতারা দৈত্যরাজ বলির নিকটে গেলেন। ইন্দ্র কোমল বাক্যে বলি রাজাকে পুরুষোত্তমের নিকটে শেখা কথা বললেন। ইন্দ্রের প্রস্তাব বলি ও উপস্থিত দৈত্য নায়কদের সমর্থন পেল। তাঁরা শপথ করে সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অমৃত লাভের জন্য উদ্যম প্রকাশ করলেন। শক্তিশালী দুর্মদ দেবাসুর মিলিত হয়ে মন্দর উৎপাটন করে সমুদ্রের দিকে নিয়ে চললেন। কিন্তু দীর্ঘ পথ এই গুরু ভার বহনে শ্রান্ত ও অবশ হয়ে পথিমধ্যে পর্বতকে পরিত্যাগ করলেন। অনেক দেবতা ও অসুর নিচে চাপা পড়ে চূর্ণ হয়ে গেলেন। হরি তাঁদের সংকল্প ত্যাগের কথা জানতে পেরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং নিজে তা অনায়াসে গরুড়ের পিঠে তুলে ক্ষীর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। গরুড় এই পর্বত জলের প্রান্ত ভাগে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

'এর পর দেবতা ও অসুররা সর্পরাজ বাসুকিকে অমৃতের ভাগ দেবেন বলে আমন্ত্রণ করে এনে রজ্জুর মতো তাঁকে মন্দর পর্বত জড়িয়ে হর্ষ ভরে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলেন। হরি প্রথমে বাসুকির মুখের দিক ধরলে দেবতারাও সেদিকে ধরলেন। দৈত্যরা এতে সম্মত হল না। তারা বলল, আমরা শাস্ত্র পাঠে জ্ঞানবান এবং জন্ম ও কর্মে বিখ্যাত। সাপের অমঙ্গলকর লেজের দিকে আমরা ধরব না। এই বলে তারা মৌন হয়ে রইলে হরি মৃদু হেসে দেবতাদের নিয়ে লেজের দিকে ধরলেন। তারপরেই মন্থন আরম্ভ হল।

কিন্তু গুরুত্বের জন্য মন্দর পর্বত জলের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। নিজেদের পৌরুষ নষ্ট হচ্ছে দেখে দেবতা ও অসুররা বিষাদগ্রস্ত হলেন। তাই দেখে হরি কচ্ছপ মূর্তিতে জলে প্রবিষ্ট হয়ে পর্বতকে ধারণ করে রইলেন। মন্থন নির্বিঘ্নে চলতে লাগল। বাসুকির মুখ ও নিঃশ্বাস থেকে নির্গত অগ্নি ও ধূমে অসুরেরা দাবানলে দগ্ধ বৃক্ষের মতো নিষ্প্রভ হল। নিঃশ্বাসের অগ্নিশিখায় দেবতাদেরও কান্তি মলিন হলে হরির বশীভূত মেঘ তাঁদের ওপরে জলবর্ষণ করল এবং সমুদ্রের শীতল বাতাসও তাঁদের দিকে প্রবাহিত হল। এইভাবে মন্থন করেও যখন সুধা পাওয়া গেল না, তখন হরি নিজেও মন্থন করতে লাগলেন। তাতে সর্বাগ্রে সমুদ্র থেকে হলাহল নামে অতি তীব্র বিষ উত্থিত হল। সেই বিষ চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে দেখে ত্রিলোকবাসী ভীত হয়ে সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তখন কৈলাস পর্বতে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। প্রজাপতিরা তাঁর স্তব করে বললেন, ত্রিলোক বিনাশী বিষ থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। প্রজাদের এই বিপদের কথা শুনে শিব সতীকে বললেন, প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি এই কালকূট গলাধঃকরণ করব। এই বলে তিনি সেই বিষ নিজে পান করলেন। তাঁর কণ্ঠ হল নীল বর্ণ। যে সামান্য বিষ তাঁর হাত থেকে ভূমিতে পড়েছিল তা গ্রহণ করল সর্প বৃশ্চিক বিষধর প্রাণী ও বিষময় ওষধি।

এর পর সমুদ্র মন্থনে যজ্ঞীয় হবির আধার সুরভি ধেনু উত্থিত হল। ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সেই ধেনু গ্রহণ করলেন। তারপর চন্দ্রের মতো শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামের অশ্ব উত্থিত হলে বলি তা চাইলেন এবং হরির নির্দেশে ইন্দ্র তা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তার পর উত্থিত হল চার দন্তের গজরাজ ঐরাবত ও আরও আটটি দিগ্‌গজ ও অভ্রমূ প্রভৃতি আটটি হস্তিনী। কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি উত্থিত হলে হরি তা নিজের বুকের অলঙ্কার করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তারপর পারিজাত বৃক্ষ উঠল। পারিজাতের পর নানা অলঙ্কারে ভূষিত অপ্সরারা উত্থিত হয়ে দেবতাদের অনুরাগ উৎপাদন করল। এর পরে উঠলেন লক্ষ্মী। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর একজন নিত্য পুরুষের অনুসন্ধান করে অবশেষে তিনি হরিকেই নিজের পতি রূপে বরণ করলেন। দৈত্য ও দানবেরা উপেক্ষিত হয়ে লোভপরবশ উদ্যমহীন ও নির্লজ্জ হয়েছিল। তারপর সমুদ্র থেকে বারুণী দেব-কন্যা রূপে উত্থিত হলে হরির কথায় অসুররা তাকে গ্রহণ করল। তার পরেও মন্থন চলতে থাকলে এক পুরুষ উঠলেন। তিনি বয়সে যুবা ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত। ধন্বন্তরি নামে তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিশারদ ও যজ্ঞের অংশভাগী ছিলেন। তাঁর হাতের সুধাপূর্ণ কলসটি দেখে অমৃতের সমস্ত ভাগ অধিকারের লোভে অসুররা ঐ কলসটি হরণ করল। তাই দেখে বিষণ্ণ হয়ে দেবতারা হরির শরণ নিলেন। হরি দেবতাদের বললেন,তোমরা দুঃখ কোরো না, আমি মায়ায় এদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করে তোমাদের অভীষ্ট সাধন করব। এর পরেই তৃষ্ণার্ত অসুরদের মধ্যে বিবাদ বাধল। কে আগে অমৃত পান করবে, এই নিয়েই বিবাদ। অনেকে বলল, দেবতারাও এই অমৃতের জন্য সমান পরিশ্রম ও অর্থাদি ব্যয় করেছেন, তাই তাঁদেরও এতে সমান অধিকার আছে। এটাই সনাতন ধর্ম। এই অবসরে হরি এক অবর্ণনীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে অসুররা তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে বলল, তুমি কে, কোথা

থেকে এলে? আমাদের চিত্ত তুমি আলোড়িত করেছ। এখানে আমরা সকলেই কশ্যপের পুত্র বলে ভাই হই, অমৃতের জন্য সবাই মিলে পরিশ্রম করেছি। তুমি আমাদের মধ্যে এই অমৃত ভাগ করে দাও, যাতে আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ না হয়। হরি তাঁদের নিরীক্ষণ করে হেসে বললেন, আমি বারাঙ্গনা, কেন তোমরা আমার অনুসরণ করছ? আমার মতো রমণীকে পণ্ডিতরা কখনও বিশ্বাস করে না। এই পরিহাসে আশ্বস্ত হয়ে অসুররা তাঁর হাতে সুধাভাণ্ড অর্পণ করল।

সেই সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে হরি সহাস্যে বললেন, আমার কাজ সঙ্গত বা অসঙ্গত তা যদি তোমরা নির্বিচারে মেনে নাও, তবেই আমি এই সুধা ভাগ করে দিতে পারি। অসুররা কিছুই জানত না বলে মোহিনীর কথায় সম্মত হয়ে গেল। তারপর তারা উপবাসী থেকে স্নান করে আগুনে হোম করল এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করে কুশের উপরে উপবেশন করল। হাতে সুধাকুম্ভ নিয়ে মোহিনী প্রবেশ করে দেবতা ও অসুরদের পৃথক পংক্তি রচনা করে দিলেন। তারপর সমাদর ও প্রিয় বাক্যে অসুরদের অতিক্রম করে গিয়ে দেবতাদের অমৃত পান করালেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা নিন্দনীয় বলে তারা নিজেদের শপথ রক্ষা করে মৌন হয়ে রইল।

রাহু নামে এক অসুর দেবতার চিহ্ন দিয়ে স্বরূপ গোপন করে দেবতাদের পংক্তিতে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে বসে অমৃত পান করছিল। চন্দ্র ও সূর্য তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতেই হরি তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্রে রাহুর মস্তক ছেদন করলেন। মুণ্ডহীন দেহ সুধাসিক্ত হবার আগেই ভূতলে পড়ল। কিন্তু সুধাপানের জন্য তার ছিন্ন মুণ্ড অমর হল। ব্রহ্মা তাকে গ্রহ করে দিলেন। বৈর বুদ্ধির জন্য সেই রাহু এখনও পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করবার জন্য তাঁদের দিকে ধাবিত হয়। দেবতাদের অমৃত পান শেষ হতেই হরি অসুরদের চোখের সামনেই নিজ রূপ ধারণ করলেন। সমুদ্র মন্থনের কাজে

দেবতা ও অসুররা সমান অর্থবায় কর্ম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের ফল লাভে বৈচিত্র্য ঘটল।

হরি তাঁর অনুগত দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে নিজ ধামে প্রস্থান করলেন। অসুররা দেবতাদের সমৃদ্ধি দেখে অসহিষ্ণু হয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল। সুধাপানে সমৃদ্ধ দেবতারাও ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে রোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। অসুর বাহিনীর অধিপতি বলি ময় দানবের তৈরি বৈহায়ন অর্থাৎ আকাশগামী যানে আরোহণ করেছিলেন। অন্যান্য অসুররা যথোচিত যানে তাঁর চতুর্দিকে ছিল। এঁরা সকলেই সমুদ্র মন্থনের ক্লেশ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু অমৃতের ভাগ পান নি। দেবসম্রাট ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করেছিলেন। অন্য দেবতারা তাঁর চতুর্দিকে ছিলেন। দেবতা ও অসুররা পরস্পরকে ডেকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে বলি, নিশুম্ভ ও শুম্ভের সঙ্গে ভদ্রকালী, শুক্রাচার্যের সঙ্গে বৃহস্পতি—এই ভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছিল। এক সময় বলি অন্তর্হিত হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করলেন। দৈত্যরাও নানাবিধ মায়া সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলে দেবতারা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এই মায়ার প্রতিকার অবগত হতে না পেরে হরির ধ্যান করলেন। তাতে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনেই অসুরদের মায়া বিনষ্ট হল। কালনেমি তাঁর দিকে একটি শূল নিক্ষেপ করতেই হরি সেই শূল ধরে নিয়ে তা দিয়েই তাকে বধ করলেন। মালী ও সুমালী তাঁর চক্রের আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হল। মাল্যবান তাঁকে গদার আঘাত করতে তিনি তাঁরও মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতারা চৈতন্য লাভ করে পুনরায় শত্রুদের আক্রমণ করলেন। ইন্দ্র বলির প্রতি বজ্র উত্তোলন করে বললেন, আমি বজ্রে তোমার শিরশ্ছেদ করছি, তুমি জ্ঞাতিদের সঙ্গে প্রতিকারের চেষ্টা কর। বলি বললেন, যুদ্ধরত লোকের জয় ও কীর্তি বা পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এটা কাল নিয়ন্ত্রিত বলে এর জন্য কোন হর্ষ বা শোক নেই। এ বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ বলেই নিজেদের জয়

পরাজয়ের কারণ ভাবছ। বলে ইন্দ্রকে আঘাত করলেন। ইন্দ্র তা সহ্য করতে না পেরে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। তাতে বলি বিমান সহ ভূপতিত হলেন। সখার এই অবস্থা দেখে জম্ভাসুর এগিয়ে এলেন। তাঁর গদার আঘাতে ঐরাবত মূর্ছাগ্রস্ত হলে ইন্দ্র মাতলির সহস্র অশ্বের রথে আরোহণ করলেন। তারপর ইন্দ্র বজ্র দিয়ে জম্ভাসুরের শিরশ্ছেদ করলেন।। নমুচি বল ও পাক নামে তিনজন অসুর দেবর্ষি নারদের কাছে জম্ভাসুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সত্বর সেখানে উপস্থিত হল এবং বাণ বর্ষণে দেবরাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ইন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে দেবতারা চিৎকার করতে লাগলেন। ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বল ও পাকের শিরশ্ছেদ করলেন এবং শূল হাতে নমুচিকে ধেয়ে আসতে দেখে তাকেও বজ্রাঘাত করলেন। কিন্তু বজ্রে নমুচির চর্ম মাত্রও ভেদ হল না। তাই দেখে ইন্দ্র বিষাদগ্রস্ত হলে দৈববাণী হল যে কোন শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে একে বধ করা যাবে না, একে বধ করতে অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। এই কথা শুনে ইন্দ্র সমুদ্রের ফেণ দিয়ে নমুচির শিরশ্ছেদ করলেন। মুনিরা মাল্য বর্ষণ করলেন, হর্ষভরে গান করলেন গন্ধর্ব বিশ্বাবসু ও পরবসু, দুন্দুভির ধ্বনির সঙ্গে নৃত্য করল নর্তকীরা।

অন্যান্য দেবতারাও প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদের সংহার করলেন। দানবদের ক্ষয় দেখে ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে পাঠালেন দেবতাদের কাছে। নারদ এসে বললেন, নারায়ণের অনুগ্রহে তোমরা অমৃত পেয়েছ, এবারে যুদ্ধে বিরত হও। দেবতারা তাঁর কথায় ক্রোধ সংবরণ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন। যে দৈত্যরা অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদের মতে বিপন্ন বলিকে নিয়ে অস্তাচলে গেল। যে সব দৈত্যের অবয়ব বিনষ্ট ও গ্রীবা ছিন্ন হয় নি, শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যায় তাদের জীবন দান করলেন। তাঁর স্পর্শে বলিও স্মৃতিশক্তি লাভ করলেন।

মোহিনী-শিব সংবাদ

শুকদেব বললেন, হরি রমনী মূর্তিতে দানবদের মোহিত করে সুধা পান করিয়েছেন শুনে শিব দেবী ও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিবাসে এলেন। বললেন, যে মূর্তিতে আপনি দৈত্যদের মোহিত করেছেন, সেই মূর্তি দেখবার জন্যে আমরা এখানে এসেছি।

এই কথা শুনে হরি হেসে বললেন, সুধাভাণ্ড দৈত্যদের হস্তগত হলে রমণীর বেশেই দেবতাদের কার্য সিদ্ধ হবে ভেবে আমি ঐ রূপ নিয়েছিলাম। বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

তারপর শিব চারি দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন যে সম্মুখে বিচিত্র বৃক্ষ সমন্বিত উপবনে পরম সুন্দর এক রমণী কন্দুক অর্থাৎ বল নিয়ে খেলছেন। শিথিল পরিধেয় বস্ত্র ও স্খলিত কেশবন্ধন বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে বল লোফালুফি করছেন। বলটি একবার দূরে চলে যেতে তা ধরবার জন্য ছুটতে গিয়ে শিবের দৃষ্টির সামনেই বায়ু তাঁর বস্ত্র হরণ করল। শিব তাঁর কটাক্ষে আকৃষ্ট হয়ে মোহিনীর নিকটে গেলেন। বিবসনা মোহিনী বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপনের জন্য সেখানে আর রইলেন না। কিন্তু শিব কামবশে তাঁকে অনুসরণ করে দুই বাহু দিয়ে মোহিনীকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর নিজেকে দেব মায়ায় বশীভূত বুঝে নিজের গর্হিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হলেন। হরি আবার পুরুষ মূর্তি ধারণ করে বললেন, আপনি যে মোহিত হয়েও পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছেন, এ খুবই সৌভাগ্যের কথা।

হরির এই কথা শুনে সবাইকে নিয়ে শিব ফিরে গেলেন। তার পরে শিব ভবানীকে বললেন, হরির মায়া দেখলে তো! আমিও তাঁর মায়ায় মোহিত হয়েছি। অন্য পুরুষে যে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

শুক বললেন, বর্তমানে সপ্তম মনুর কাল। ইনি বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব। এই বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু নভগ ধৃষ্ট শর্যাতি নরিষ্যন্ত নাভাগ দিষ্ট করূষ পৃষধ্র ও বসুমান। এই মন্বন্তরে আদিত্য বসু রুদ্র বিশ্বদেব মরুৎ ঋভু ও অশ্বিনীকুমাররা দেবতা, পুরন্দর তাঁদের ইন্দ্র। কশ্যপ অত্রি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গৌতম জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি। কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আদিত্যদের মধ্যে কনিষ্ঠ বামনরূপী বিষ্ণু।

এই ভাবে সাতটি মন্বন্তরের কথা বলা হল। এরপর সাতটি ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের কথা বলছি। বিবস্বানের দুই পত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া, এঁরা দুজনেই বিশ্বকর্মার কন্যা। অনেকে তাঁর বাড়বা নামে তৃতীয়া পত্নীর কথা বলেন। সংজ্ঞার দুই পুত্র যম ও শ্রাদ্ধদেব এবং একটি কন্যা যমী। ছায়ার পুত্র সাবর্ণি এবং কন্যা তপতী সংবরণের পত্নী। শনিও ছায়ার পুত্র, ইনি যম ও যমীর পর তৃতীয় সন্তান। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় বাড়বার পুত্র।

অষ্টম মন্বন্তর এলে সাবর্ণি মনু হবেন। নির্মোক বিরজস্ক প্রভৃতি তাঁর পুত্র। সুতপা বিরজা ও অমৃতপ্রভরা দেবতা, বিরোচনের পুত্র বলি তাঁদের ইন্দ্র হবেন। তিনি যাচক বিষ্ণুকে ত্রিপদ পরিমিত ভূমিদানের ছলে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করে এই ইন্দ্রপদ পাবেন। বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করে স্বর্গের চেয়েও সমৃদ্ধিশালী সুতলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরমানন্দে বাস করছেন। গালব দীপ্তিমান পরশুরাম অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ঋষ্যশৃঙ্গ ও আমার পিতা বাদরায়ণ এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। বিষ্ণু দেবগুহ্যের পত্নী সরস্বতীর গর্ভে সার্বভৌম নামে জন্ম নিয়ে পুরন্দরের ইন্দ্রত্ব হরণ করে বলিকে প্রদান করবেন।

নবম মন্বন্তরে বরুণের পুত্র দক্ষ সাবর্ণি মনু হবেন। ভূতকেতু ও দীপ্তকেতু তাঁর পুত্র। মরীচি গর্ভ প্রভৃতি পারগণ দেবতা এবং অদ্ভুত

ইন্দ্র হবেন। সপ্তর্ষি হবেন দ্যুতিমান প্রভৃতি। বিষ্ণু আয়ুষ্মানের পত্নী অম্বুধারার গর্ভে ঋষভদেব নামে জন্মাবেন এবং ইন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করাবেন।

উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্ম সাবর্ণি হবেন দশম মনু। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র। সুরাসন বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁদের ইন্দ্র। হবিষ্মাণ সুকৃত সত্য জয় প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। বিষ্ণু বিশ্বসৃকের পত্নী বিসূচীর গর্ভে বিষ্বক্‌সেন নামে জন্মগ্রহণ করে ইন্দ্রের সখা হবেন।

একাদশ মনু হবেন ধর্ম সাবর্ণি। সত্য ধর্ম প্রভৃতি তাঁর দশটি পুত্র হবে। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম কামগম নির্বাণ রুচি প্রভৃতি দেবতা ও বৈবত ইন্দ্র হবেন। সপ্তর্ষি হবেন অরুণ প্রভৃতি। হরি বৈধৃতার গর্ভে আর্যকের পুত্র হয়ে জন্মে ধর্মসেতু নামে ত্রিলোক পরিপালন করবেন।

দ্বাদশ মনুর নাম রুদ্র সাবর্ণি। দেববান উপদেব দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁর পুত্র। হরিত প্রভৃতি দেবতা ও ঋতধামা ইন্দ্র। সপ্তর্ষি হবেন তপোমূর্তি তপস্বী আগ্নীধ্রক প্রভৃতি। সুনৃতার গর্ভে সত্যসহার পুত্র স্বধামা নামে জন্মে হরি এই মন্বন্তর সমৃদ্ধ করবেন।

দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু এবং চিত্রসেন বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র। সুকর্মা সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি ইন্দ্র হবেন। সপ্তর্ষি হবেন নির্মোক তত্ত্বদর্শ প্রভৃতি। বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের পুত্ররূপে জন্মে হরি যোগেশ্বর নামে দিবস্পতির ইন্দ্রত্বলাভে সহায় হবেন।

চতুর্দশ মনুর নাম ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু গম্ভীর বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁর পুত্র। পবিত্র চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা ও শুচি ইন্দ্র হবেন। সপ্তর্ষি হবেন অগ্নি বাহু শুচি শুদ্ধ মাগধ প্রভৃতি। হরি বিতানার গর্ভে সত্রায়নের পুত্র বৃহদ্ভানু নামে জন্মে লোকের কল্যাণকর ক্রিয়ার

বিস্তার করবেন। এই চতুর্দশ মন্বন্তর পরিমিত কল্পকালের পরিমাণ এক হাজার যুগ।

পরীক্ষিৎ বললেন, মন্বন্তরে মনুরা কী কাজ করেন?

শুক বললেন, বিষ্ণু সকলকেই নিজ নিজ কাজে নিয়োগ করেন। মনুরা জগতের কার্য নির্বাহ করেন এবং পৃথিবীতে ধর্ম প্রবর্তন ও প্রতিপালন করেন। ইন্দ্র ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করেন।

বলির উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, বলির নিকটে হরি কেন দীনের মতো ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন এবং তা পাবার পরেও কেন তাঁকে বন্ধন করেছিলেন?

শুক বললেন, দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের নিকটে পরাজিত ও নিহত হলে শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবনদান করেন। তার পর থেকেই শিষ্য বলি যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করে তাঁর সেবা করছিলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণেরা স্বর্গজয়ের অভিলাষী বলিকে অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করলেন। তারপর বলি অসুর বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে ইন্দ্রপুরীর দিকে যাত্রা করালেন। নন্দন প্রভৃতি উপবন ও উদ্যানে এই পুরী অতি মনোরম। বলি এই ইন্দ্রপুরী অবরোধ করলেন। দেবতারা গিয়ে বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পুরাতন শত্রু বলি কোন্ তেজে এমন বলবান হল? বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ, ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণেরাই শিষ্য বলির মধ্যে এই তেজ সঞ্চয় করেছেন। হরি ছাড়া আর কেউ তাঁকে জয় করতে সমর্থ নয়। কাজেই এখন তোমরা স্বর্গপুরী ত্যাগ করে কোথাও লুকোও। যতদিন শত্রুর বিপর্যয় দেখা না দেয়, ততদিন অপেক্ষা কর। ব্রাহ্মণের বলেই সে পরাক্রান্ত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণকে অবমাননার জন্যই সে সবংশে বিনষ্ট হবে। বৃহস্পতির সুমন্ত্রণায় দেবতারা

স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং বলি স্বর্গে থেকে ত্রিলোকের উপরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন। শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দিয়ে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন এবং তারই প্রভাবে বলি ত্রিলোক বিখ্যাত কীর্তি বিস্তার করলেন।

এইভাবে দৈত্যরা স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে দেবমাতা অদিতি অনাথার মতো পরিতপ্ত হলেন। এই সময়ে কশ্যপ একদিন অদিতির নিরানন্দ আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পত্নীকে ম্লানমুখী দেখে প্রশ্ন করলেন, কোন অমঙ্গল হয় নি তো? তোমার অন্তঃকরণ অসুস্থ বলে আমার মনে হচ্ছে। অদিতি বললেন, শত্রুরা আমাদের ঐশ্বর্য ও বাসস্থান হরণ করেছে, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমার পুত্ররা যাতে হৃত ঐশ্বর্য পুনরায় ফিরে পায়, তার ব্যবস্থা করুন। কশ্যপ বললেন, তুমি বাসুদেবের আরাধনা কর, তিনিই তোমার কামনা পূরণ করবেন। অদিতি বললেন, কোন্ বিধান অনুসারে আমি তাঁর আরাধনা করব? কশ্যপ বললেন, আমি একসময় সন্তান কামনায় ব্রহ্মাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে হরির প্রিয় ব্রতের কথা বলেছিলেন। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে বারো দিন পয়োব্রত অবলম্বন করে হরির অর্চনা করবে।

স্বামীর উপদেশে অদিতি বারো দিন ধরে অনলস ভাবে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। এতে বিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্তিতে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। অদিতি তাঁর স্তব করলেন। এর উত্তরে বিষ্ণু বললেন, দেবী, অসুরদের এখন ব্রাহ্মণরা রক্ষা করছেন বলে সেখানে বিক্রম প্রকাশ করতে গেলে তা সুখের হবে না। তথাপি ব্রতচর্যায় আমাকে তুষ্ট করছ বলে কোন উপায় করতেই হবে। আমি তোমার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। এই বর পেয়ে অদিতি কশ্যপের নিকটে গেলেন এবং কশ্যপ অদিতির মধ্যে তপস্যায় সঞ্চিত বীর্য স্থাপন করলেন।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে ভগবান আবির্ভূত হলেন। এই দিনের নাম বিজয়া দ্বাদশী। অপ্সরা নৃত্য করেছিল, গান গেয়েছিল গন্ধর্ব এবং ঋষিরা স্তুতি পাঠ করেছিলেন। পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল অদিতির আশ্রমে। প্রথমে হরি সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করেছিলেন, পরে নটের ন্যায় বামনাকৃতি বটু হয়েছিলেন। মহর্ষিরা তাঁর জাত কর্ম সম্পাদন করেন। উপনয়নের পর তিনি বলির যজ্ঞক্ষেত্রে গেলেন।

নর্মদার উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামে ক্ষেত্রে বলির ভৃগু বংশীয় ঋত্বিকরা অশ্বমেধের প্রবর্তন করছিলেন। বামন ছত্র দণ্ড ও স্বজল কমণ্ডলু নিয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। বলি তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আসন দিয়ে বললেন, আপনার কী কাজ করব আদেশ করুন। আপনাকে প্রার্থী মনে হচ্ছে, আপনার যা ইচ্ছা তাই আমার নিকটে গ্রহণ করুন। বামন বললেন, যাচক ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন নাই, এরকম কেউ আপনার বংশে নেই। আমি আপনার নিকটে আমার পায়ের ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি চাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান গ্রহণ করলে জ্ঞানী পুরুষ পাপের ভাগী হন বলে এর বেশি আমি চাই না। বলি বললেন, আপনার কথা বৃদ্ধের সম্মত, কিন্তু বালক ও অজ্ঞমতি বলে স্বার্থের বিষয়ে অপণ্ডিতের মতো কথা। যিনি একটি দ্বীপ দানে সমর্থ সেই ত্রিলোকের একচ্ছত্র অধিপতির নিকটে ত্রিপাদ মাত্র ভূমি প্রার্থনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাব কাছে একবার এলে আর কাউকে যাচ্ঞা করতে হয় না। তাই আমার নিকটে জীবিকার উপযোগী ভূমি গ্রহণ করুন। বামন বললেন, ত্রিপাদ ভূমি লাভে যার সন্তুষ্টি হয় না, একটি দ্বীপ পেলেও তার সন্তোষ হবে না, তার সপ্ত দ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে। আমি আপনার নিকটে তিন পদ ভূমি চাই। বলি সহাস্যে বললেন, আপনি তাহলে ইচ্ছানুরূপ ভূমিই গ্রহণ করুন। বলে ভূমি উৎসর্গের জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে শুক্রাচার্য বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে শিষ্য বলিকে বললেন, এই বামন ব্রাহ্মণ বালক সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দেবতাদের কার্য উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তুমি নিজের অনর্থ না জেনে এঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি এটা সঙ্গত মনে করি না। ইনি মায়াবলে কৌশলে তোমার সমস্ত কিছু হরণ করে ইন্দ্রকে দেবেন। ইনি বিশ্বকায় অর্থাৎ ত্রিবিক্রম রূপে তিনবার পদবিন্যাস করে ত্রিলোক অধিকার করবেন। বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করে তুমি কী ভাবে জীবন ধারণ করবে? এঁর তৃতীয় পদের ভূমি দিতে না পারলে তোমার নরকে গতি হবে। ভিক্ষুককে সর্বদা হাঁ বলতে হলে নিজে ভোগ করা যায় না। তা ছাড়া স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে হলে, পরিহাস ও বিবাহের ব্যাপারে, জীবিকার জন্য কিংবা প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হলে অথবা গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে দস্যুর হিংসা থেকে রক্ষার জন্য মিথ্যা ভাষণ নিন্দনীয় নয়।—

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণ-সঙ্কটে।
গো-ব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥৮।১৯ ৪৩

কুলগুরু শুক্রাচার্যের কথা শুনে বলি কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন যে যাতে অর্থ কাম যশ ও জীবিকার বাধা না হয় তাই গৃহস্থের ধর্ম। কিন্তু প্রহ্লাদের বংশধর হয়ে দানের অঙ্গীকার করে এখন বিত্তের লোভে এই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করব কেমন করে। অসত্যের চেয়ে তো বড় অধর্ম আর কিছু নেই। আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করাকে যত ভয় পাই, নরক দারিদ্র্য স্থানচ্যুতি বা মৃত্যুকেও তত ভয় পাই না। ইনি যদি বিষ্ণু হন বা কোন শত্রু হন, তাহলেও আমি এঁকে এঁর প্রার্থিত ভূমি দান করতে চাই। ইনি যদি সত্যিই বিষ্ণু হন এবং নিজের যশ ত্যাগ করতে না চান, তবে আমাকে যুদ্ধে বধ করেই ভূমি হরণ করুন অথবা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করুন।

এরপর গুরু শুক্রাচার্য সত্যনিষ্ঠ উদারচিত্ত বলিকে অভিশাপ

দিলেন, তুমি অজ্ঞ হয়েও নিজেকে পণ্ডিত মনে কর। আমাকে উপেক্ষা করে তুমি গর্বের পরিচয় দিলে। অচিরেই তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে। গুরুর শাপেও বিচলিত না হয়ে বলি জল স্পর্শ করে বামনকে পৃথিবী দান করলেন। বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি স্বর্ণকুম্ভে জল এনেছিলেন। সেই জলে বলি বামনের পা ধুইয়ে দিলেন। দেবতা ও সিদ্ধরা পুষ্প বর্ষণ করলেন, স্বর্গে দুন্দুভি বাজল। বলি জেনে শুনেই শত্রুকে ত্রিলোক দান করলেন বলে গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা গান গাইতে লাগলেন। সেই সময়ে বামন অদ্ভুত রূপে বৃদ্ধিলাভ করলেন। ভগবান উরুক্রম এক পদে বলির অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ ও দ্বিতীয় পদবিন্যাসে স্বর্গলোক অধিকার করলেন। কিন্তু তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য অণুমাত্র স্থান রইল না। তারপর তিনি ত্রিবিক্রম মূর্তি সংক্ষেপ করে পূর্বের ন্যায় বামন রূপ ধারণ করলেন।

বামন ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞার ছলে বলির সমস্ত পৃথিবী হরণ করেছেন দেখে অসুররা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, এ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সন্তান নয়, মায়াবীদের প্রধান বিষ্ণুই আত্মগোপন করে দেবতাদের কার্য সাধন করতে চাইছে। আমাদের যজ্ঞে দীক্ষিত প্রভুর তো মিথ্যা বলা সম্ভব নয়, কাজেই এই কপট বেশধারী বিষ্ণুকে বধ করাই আমাদের উচিত। এই বলে বলির অনুচররা অস্ত্রধারণ করল। বলির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা বামনকে বধ করবার জন্যে ধাবিত হলে বিষ্ণুর অনুচররা তাদের বাধা দিল। বলি তাঁর সৈন্যদের হত হতে দেখে গুরুর অভিশাপ স্মরণ করে তাদের নিবারণ করলেন। বললেন, কাল এখন আমাদের অনুকূল নয়, তোমরা কালের অপেক্ষা করে থাক। দৈত্যরা এরপর পাতালে প্রবেশ করল। প্রভুর অভিপ্রায় জানতে পেরে গরুড় যজ্ঞের সোমাভিষেকের দিন বরুণের পাশে বলিকে আবদ্ধ করলেন। এইভাবে বলিকে বন্ধন করে বিষ্ণু তার উপরে নিগ্রহের উপক্রম করতেই স্বর্গ ও মর্তের সকল দিকে তুমুল হাহাকার উত্থিত হল। বামন বলিকে বললেন, আমি দুই পদেই সমস্ত অধিকার করেছি,

এখন আমার তৃতীয় পদ বিন্যাসের স্থান দাও। দিতে না পারলে তুমি নরকে প্রবেশ কর।

বলি এই কথায় একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে বললেন, আপনি তো কপটতা অবলম্বন করে বামন রূপে ত্রিপাদ ভূমি চেয়ে এই বিরাট দেহ ধারণ করে ভূমি নিচ্ছেন! এর জন্য আমার প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বা কপট বলতে পারেন না। তবু আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বলছি যে আপনার তৃতীয় পদ আপনি আমার মাথায় রাখুন। আমি অপকীর্তিকে ভয় পাই, নরক পাশ বন্ধন বা পীড়নকে ভয় পাই না।

ঠিক এই সময়ে প্রহ্লাদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বরুণ পাশে আবদ্ধ ছিলেন বলে বলি পিতামহকে দেখে লজ্জায় মুখ নত করলেন। প্রহ্লাদ হরিকে বললেন, আত্মার মোহজনক সম্পদ কেড়ে নিয়ে আপনি এর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি বললেন, আপনাকে কে কী দান করতে পারে! ব্রহ্মা বললেন, হৃতসর্বস্ব বলিকে আপনি বন্ধন মুক্ত করুন, ইঁনি নিগ্রহের যোগ্য নন। ভগবান বললেন, আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তার ধনসম্পদ হরণ করি। কারণ ধনমদে গর্বিত হয়ে তারা শুধু জগৎকে নয় আমাকেও অবজ্ঞা করে। আমি ছল করে ধর্মের কথা বলেছি, গুরু এঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। তবু এই সুব্রত সত্যবাদী বলি ধর্মকে লঙ্ঘন করেন নি। তাই আমি এঁকে দেবতাদেরও দুর্লভ স্থান দান করছি। সাবর্ণি মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্র হবেন। তার আগে ইনি বিশ্বকর্মার নির্মিত সুতলে বাস করবেন। বন্ধনমুক্ত বলি হরি ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণাম করে পাতালে প্রবেশ করলেন।

প্রহ্লাদ বললেন, আপনার চরিত্র সত্যিই অতি বিচিত্র। ভগবান বললেন, তুমিও সুতলে গিয়ে পৌত্রের সঙ্গে থাক। সেখানে তুমি আমাকে গদা হাতে অবস্থান করতে দেখবে। প্রহ্লাদও বলির সঙ্গে সুতলে গেলেন। ভগবান শুক্রাচার্যকে বললেন, আপনার শিষ্য বলির কাজ আপনি সম্পূর্ণ করুন। হরির আদেশে শুক্রাচার্য ঋষিদের

সঙ্গে যজ্ঞের ত্রুটি পূরণ করলেন। বামন বলির হৃত রাজ্য তাঁর ভ্রাতা ইন্দ্রকে দান করলেন। কশ্যপ ও অদিতির প্রীতির জন্য ব্রহ্মা বামনকে লোকপালদের অধিপতি করলেন। এর পর ইন্দ্র বামনকে নিয়ে বিমান যোগে স্বর্গে গেলেন।

মৎস অবতার

পরীক্ষিৎ বললেন, হরি যে জন্য মৎস রূপ ধারণ করেছিলেন সেই আদি অবতার কথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সূত বললেন, পরীক্ষিৎ এই কথা বললে শুকদেব মৎস্য রূপে বিষ্ণু যা করেছিলেন তার বর্ণনা করলেন। শুক বললেন, অতীত কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হলে নৈমিত্তিক প্রলয়ে সমস্ত লোক সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল। নিদ্রার আবেশে ব্রহ্মা যখন শুতে যাচ্ছিলেন, তখন দানব হয়গ্রীব তাঁর মুখের বেদ হরণ করে। হরি এ কথা জেনে শফরী মৎস্যের রূপ ধারণ করেন। সেই সময়ে সত্যব্রত নামে এক তপস্বী জলে তপস্যা করছিলেন। বর্তমান কল্পে তিনিই সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত। কৃতমালা নদীতে তিনি যখন তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিতে একটি শফরী অর্থাৎ পুঁটিমাছ দৃষ্টিগোচর হয়। দ্রবিড় দেশের অধিপতি সত্যব্রত সেটি জলে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে শফরী কাতর স্বরে বলল, হিংস্র জলজন্তুর মধ্যে আমাকে ত্যাগ করবেন না। এই কথা শুনে তিনি শফরীটিকে কলসের জলে নিয়ে আশ্রমে এলেন। কিন্তু এক রাত্রেই সে এমন বৃদ্ধি পেল যে জলের পাত্রে স্থানের অভাবে সে রাজাকে বলল, আমি এই কমণ্ডলুর মধ্যে আর থাকতে পারছি না, আমাকে কোন বড় জায়গায় রাখুন। রাজা তখন তাকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। কিন্তু সেখানে সে মুহূর্ত কালের মধ্যে তিন হাত বৃদ্ধি পেয়ে বলল, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু এ জায়গাও আমার সুখে থাকবার উপযোগী নয়। সত্যব্রতএবারে তাকে সরোবরে

নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেখানেও সে নিজের দেহে সরোবর ব্যাপ্ত করে বলল, এ জায়গাও আমার সুখকর বোধ হচ্ছে না। জল ক্ষয় হয় না এই রকম সরোবরে আমাকে রাখুন। সত্যব্রত এইভাবে একের পর আর এক হ্রদে শফরীকে নিয়ে গেলেন এবং সমস্ত জলাশয়ে তার দেহ বর্ধিত হতে থাকলে তিনি তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। এই অবস্থায় সেই মৎস্য রাজাকে বলল, আপনি আমাকে সমুদ্রের জলে ত্যাগ করবেন না, মকরাদি জলজন্তু আমাকে খেয়ে ফেলবে। এইবারে রাজা সত্যব্রত বললেন, আপনি কে আমাকে মৎস্য রূপে মোহিত করছেন? আমার মনে হচ্ছে যে আপনি নারায়ণ, অনুগ্রহ করবার জন্যই মৎস্য মূর্তি ধারণ করেছেন। এই কথা শুনে মৎস্য রূপী হরি রাজাকে বললেন, আজ থেকে সপ্তম দিবসে ত্রিলোক প্রলয়ের জলে নিমগ্ন হবে। সে সময়ে আমি একটি বিশাল নৌকা তোমার নিকটে পাঠাব। তুমি সমস্ত প্রাণী ও ওষধি নিয়ে সপ্তর্ষির সঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করবে। বায়ুবেগে নৌকা বিচলিত হলে আমি নিকটে আসব। তখন তুমি বাসুকিকে রজ্জুর মতো করে আমার শৃঙ্গে নৌকাটি বেঁধে দেবে। যতকাল ব্রহ্মার রাত্রি থাকবে ততকাল তোমাদের নিয়ে আমি প্রলয় সমুদ্র বিচরণ করব এবং তোমার নিকটে পরম ব্রহ্মের মহিমা বর্ণনা করব। রাজাকে এই আদেশ দিয়ে হরি অন্তর্হিত হলেন।

এক সময়ে দেখা গেল যে সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে চারিদিক প্লাবিত করছে। এই সময়ে একটি নৌকা নিকটে এল। রাজা সপ্তর্ষির সঙ্গে ওষধি ও লতা নিয়ে সেই নৌকায় উঠলেন। ঋষিদের কথায় রাজা হরির ধ্যান করতে আরম্ভ করলে এক-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট সুবর্ণ-ময় একটি মৎস্য এসে উপস্থিত হল। রাজা রজ্জুরূপী বাসুকির দেহ দিয়ে সেই নৌকা মৎস্যের শৃঙ্গে বেঁধে দিয়ে মৎস্যরূপী ভগবানের স্তব করলেন। তিনি সমুদ্রে বিহার করতে করতে রাজা সত্যব্রতকে সাংখ্য ও যোগের উপদেশপূর্ণ মৎস্যপুরাণ ও আত্মতত্ত্বের উপদেশ

দিলেন। এর পর মৎস্যরূপী হরি হয়গ্রীব অসুরকে বধ করে বেদ উদ্ধার করলেন এবং প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা উত্থিত হলে পুনরায় তাঁকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। সেই রাজর্ষি সত্যব্রতই বর্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু হয়েছেন।

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত

নবম স্কন্ধ

ইলার উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, আপনি বলেছেন যে দ্রবিড় দেশের অধিপতি সত্যব্রতই বিবস্বানের পুত্র মনু হয়েছেন। এবারে তাঁর বংশের কথা বলুন।

সূত বললেন, পরীক্ষিতের অনুরোধে শুকদেব বলতে লাগলেন, শতবর্ষেও মনুর বংশের কথা শেষ হয় না। তাই সংক্ষেপে বলছি। পরমপুরুষের নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির জন্ম, কশ্যপ মরীচির পুত্র। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে বিবস্বানের জন্ম হয়। শ্রাদ্ধদেবের জন্ম বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে। এঁরই নাম মনু। মনুর পত্নী শ্রদ্ধা দশটি পুত্রের জন্ম দেন। তাঁদের নাম ইক্ষাকু নৃগ শর্যাতি দিষ্ট ধৃষ্ট করূষ নরিষ্যন্ত পৃষধ্র নভগ ও কবি। মনু যখন নিঃসন্তান ছিলেন তখন বশিষ্ঠ তাঁর সন্তান লাভের জন্য মিত্র ও বরুণের যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞকালে শ্রদ্ধা কন্যা সন্তানের প্রার্থনা জানালে তাঁর ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। এতে মনু সন্তুষ্ট হলেন না দেখে বশিষ্ঠ ইলার পুরুষত্বের জন্য ভগবানের স্তব করলেন। তাতে হরি ইলাকে সুদ্যুম্ন নামে পুরুষে পরিণত করলেন। একবার সুদ্যুম্ন কয়েকজন অমাত্যকে নিয়ে মৃগয়ার জন্য সুমেরু পর্বতের সানুদেশে গেলেন। হর-পার্বতী যেখানে বিহাররত ছিলেন সেখানে প্রবেশ করতেই তাঁরা সকলে স্ত্রীরূপ পেলেন।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন, কেন এমন হল ?

শুক বললেন, একদিন ঋষিরা শিবের দর্শনের জন্য সেই বনে এসেছিলেন। তাঁদের দীপ্তিতে অন্ধকার দূর হয়েছিল এবং বিবস্ত্র

পার্বতী খুব লজ্জিত হয়েছিলেন। ঋষিরা তাঁদের বিহার লক্ষ্য করেই নরনারায়ণ আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন এবং শিব বলেছিলেন যে এর পর কোন পুরুষ এখানে এলে স্ত্রী হবে। এর পর থেকেই পুরুষরা এই বন পরিত্যাগ করে। সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরদের নিয়ে স্ত্রী মূর্তিতে বন থেকে বনান্তরে বিচরণ করতে থাকেন। এই সময়ে বুধ নিজের আশ্রমের নিকটে রমণী পরিবৃত সুদ্যুম্নকে দেখে তাঁকে লাভ করতে ইচ্ছা করেন এবং ইনিও চন্দ্রের পুত্র বুধকে পতি রূপে পেতে চান। তারপর বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবার জন্ম দেন।

এর পর সুদ্যুম্ন কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেন এবং বশিষ্ঠ কৃপা পরবশ হয়ে তাঁর পুরুষত্ব কামনা করে শিবের স্তুতি করেন। শিব বলেন যে তোমার গোত্রজাত সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হবে। বশিষ্ঠের অনুগ্রহে সুদ্যুম্ন পুরুষত্ব লাভ করে পৃথিবী পালন করেছিলেন। স্ত্রীভাব পেলে তিনি লুকিয়ে থাকতেন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্র উৎকল গয় ও বিমল দক্ষিণাপথের রাজা হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠানপুরের আধিপত্য পুত্র পুরূরবাকে দিয়ে বনগমন করেছিলেন।

পৃষধ্রের উপাখ্যান

সুদ্যুম্ন বনে যাবার পরেই বৈবস্বত মনু পুত্রলাভের জন্য শত বৎসর যমুনায় তপস্যা করে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে পৃষধ্রকে তিনি গোরক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন। পৃষধ্র খড়্গ হাতে রাত জেগে পাহারা দিতেন। একদিন রাতে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এমন সময়ে একটি বাঘ গোষ্ঠে এসে প্রবেশ করল। বাঘ একটি গাভীকে ধরলে সে চিৎকার করল। সেই চিৎকার শুনে পৃষধ্র ছুটে এসে অন্ধকারে বাঘ মনে করে একটি কপিলা গাভীর মস্তক ছেদন করলেন। সেই আঘাতে বাঘের একটি কানের অগ্রভাগ ছিন্ন হল। প্রভাতে কপিলা গাভীকে নিহত দেখে পৃষধ্র দুঃখিত হলেন। এই

অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কুলগুরু অভিশাপ দিলেন, তুমি শূদ্র রূপে পরিচিত হবে।

এর পর পৃষধ্র ঊর্ধ্বরেতা হয়ে ব্রত অবলম্বন করলেন। বাসুদেবের ভক্তিতে সকল প্রাণীর সুহৃদও সমভাবাপন্ন হলেন এবং জড় অন্ধ ও বধিরের ন্যায় পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। একদিন এক বনে দাবানল প্রজ্বলিত দেখে তিনি সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মপদ লাভ করলেন।

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবিও বিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে কৈশোরেই সমস্ত ত্যাগ করে বনে যান এবং পরমপুরুষের ধ্যানে রত হয়ে পরম পদ লাভ করেন।

মনুর পুত্রদের বংশ বিস্তার

করূষের বংশে কারূষ নামে ক্ষত্রিয়রা উত্তরাপথের রক্ষক হয়েছিলেন। ধৃষ্টের বংশে ধার্ষ্টরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। নৃগের পুত্র সুমতি, তাঁর পুত্র ভূতজ্যোতি, তাঁর পুত্র বসু, বসুর পুত্র প্রতীক, তাঁর পুত্র ওঘবান, তাঁর ওঘবান ও ওঘবতী নামে পুত্র ও কন্যা জন্মে। সুদর্শন ওঘবতীকে বিবাহ করেছিলেন। নরিষ্যন্তের পুত্র চিত্রসেন, তাঁর পুত্র ঋক্ষ, তাঁর পুত্র মীঢ্বান, তাঁর পুত্র পূর্ণ এবং পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র বীতহোত্র, তাঁর পুত্র সত্যশ্রবা, তাঁর পুত্র উরুশ্রবা, তাঁর পুত্র দেবদত্ত। দেবদত্তের পুত্র রূপে অগ্নি স্বয়ং অগ্নিবেশ্য নামে উৎপন্ন হন। ইনি কানীন অর্থাৎ কুমারী কন্যার পুত্র এবং জাতুকর্ণ ঋষি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আগ্নিবেশ্যনয়ন ব্রাহ্মণদের জন্ম এঁরই বংশে। দিষ্টের পুত্রের নাম নাভাগ, কর্মে ইনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। এঁর পুত্র ভলন্দন ও তাঁর পুত্র বৎসপ্রীতি, তাঁর পুত্র প্রাংশু, তাঁর পুত্র প্রমতি, তাঁর পুত্র খনিত্র, তাঁর পুত্র চাক্ষুষ এবং তাঁর পুত্র বিবিংশতি। বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, তাঁর পুত্র খনীনেত্র ও তাঁর পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ, তাঁর পুত্র মরুত্ত সার্বভৌম

রাজা ছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র সংবর্ত তাঁর যে যজ্ঞ করেছিলেন, সে রকম যজ্ঞ আর হয় নি। মরুত্তের পুত্র দম, তাঁর পুত্র রাজবর্ধন, তাঁর পুত্র সুধৃতি, তাঁর পুত্র নর, তাঁর পুত্র কেবল, তাঁর পুত্র ধুন্দুমান, তাঁর পুত্র বেগবান, তাঁর পুত্র বুধ। বুধের পুত্র তৃণবিন্দু গুণের আধার ছিলেন বলে অপ্সরা অলম্বুষা তাঁর ভজনা করেন। এঁরই গর্ভে কয়েকটি পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। বিশ্রবা ঋষি ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম দেন। তৃণবিন্দুর পুত্রদের নাম বিশাল শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু। বিশাল রাজা হয়ে বৈশালী পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ, তাঁর পুত্র সংযম এবং সংযমের কৃশাশ্ব ও দেবজ নামে দুই পুত্র জন্মে। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর পুত্র সুমতি এবং সুমতির পুত্র জনমেজয়।

সুকন্যার উপাখ্যান

শুক বললেন, মনুর পুত্র শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা ছিল। একদিন রাজা এই কন্যাকে নিয়ে বনে গিয়ে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে প্রবেশ করলেন। রাজকন্যা সখী পরিবৃত হয়ে পুষ্পাদি চয়ন করবার সময়ে একটি বল্মীকের ছিদ্রে দুটি খদ্যোতের মতো জ্যোতি দেখতে পেলেন। তিনি অজ্ঞতা বশত কণ্টক দিয়ে তা বিদ্ধ করতেই সেই দুটি জ্যোতি থেকে রক্ত নিঃসৃত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সৈন্যদের মলমূত্র ত্যাগে বাধা উপস্থিত হতেই শর্যাতি বিস্মিত হয়ে অনুচরদের বললেন, মহর্ষি চ্যবনের নিকটে কেউ অপরাধ করে নি তো? সুকন্যা ভীত হয়ে পিতাকে বললেন, আমি কাঁটা দিয়ে দুটি জ্যোতি বিদ্ধ করেছি। রাজা ভয় পেয়ে বল্মীকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চ্যবনকে ধীরে ধীরে প্রসন্ন করলেন এবং মুনির অভিপ্রায় জেনে তাঁর হাতেই কন্যাকে সমর্পণ করলেন। এই ভাবে বিপদমুক্ত হয়ে তিনি নিজের পুরে ফিরে গেলেন।

সুকন্যা এই ক্রোধী ঋষিকে আনুগত্য দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

এক সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনি তাঁদের পূজা করে বললেন, আপনারা আমাকে যৌবন দান করুন, আমি আপনাদের যজ্ঞে সোমপানের অধিকারী করব। ঋষির এই কথা শুনে স্বর্গের সুনিপুণ চিকিৎসকেরা বললেন, তাই হবে। আপনি সিদ্ধ নির্মিত এই হ্রদে অবগাহন করুন। এই বলে তাঁরা জরাক্রান্ত পক্ককেশ লোলচর্ম ও শিরাজালে আচ্ছন্ন মুনিকে নিয়ে সেই হ্রদে প্রবেশ করলেন তারপরেই সেখান থেকে একই রকম রূপবান তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। পতিব্রতা সুকন্যা নিজের পতিকে চিনতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা তাঁর পতিকে দেখিয়ে দিয়ে বিমানে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

এরপর এক সময় রাজা শর্যাতি যজ্ঞ করবেন ভেবে চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁর কন্যার পাশে একজন সূর্যের মতো তেজস্বী পুরুষকে দেখতে পেলেন। কন্যা তাঁকে প্রণাম করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ছি ছি, নিজের জরাগ্রস্ত পতিকে ত্যাগ করে তুমি এই পথিক উপপতিকে আশ্রয় করেছ। পিতার কথা শুনে সুকন্যা সহাস্যে বললেন, ইনিই আপনার জামাতা। বলে স্বামীর রূপ যৌবন লাভের কথা পিতাকে বললে তিনি বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হয়ে কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন। মহর্ষি চ্যবন রাজা শর্যাতিকে সোমযাগ করাবার সময় অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের ব্যবস্থা না থাকলেও তাঁদের সোমরস পূর্ণ পানপাত্র দান করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তা সহ্য করতে না পেরে শর্যাতিকে বধ করবার জন্য বজ্র হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু চ্যবন তাঁর সেই হাত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। চিকিৎসক বলে অশ্বিনীকুমাররা সোমযাগে সোমপানের অধিকারী ছিলেন না। তারপর সকলেই তাঁকে সোমপাত্র দানে সম্মত হল।

রেবতীর উপাখ্যান

শর্যাতির উত্তানবর্হি আনর্ত ও ভূরিষেণ নামে তিন পুত্র হয়। আনর্তের পুত্র রেবত সমুদ্রগর্ভে কুশস্থলী নগরী নির্মাণ করে সেখান থেকে আনর্ত প্রভৃতি রাজত্ব ভোগ করেন। তাঁর একশো পুত্র হয়, তাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ।

এক সময়ে ককুদ্মী নিজের কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর উপযুক্ত বরের কথা জানবার জন্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন গন্ধর্বদের গান হচ্ছিল। প্রশ্ন করবার অবকাশ না পেয়ে রাজাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গান শেষ হলে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা এই কথা শুনে উচ্চ হাস্য করে বললেন, রাজা, তুমি পৃথিবীতে যাদের কন্যার বর রূপে চিন্তা করেছিলে, তারা আর বেঁচে নেই। এখন তাদের বংশধরদের কথাও শোনা যায় না। এর মধ্যে সাতাশ চতুর্যুগ অতীত হয়েছে। এখন ভগবানের অংশে বলদেব সেখানে আছেন, তাঁকেই কন্যাদান কর। ব্রহ্মার আদেশে ককুদ্মী নিজের পুরীতে ফিরে দেখলেন যে যক্ষদের ভয়ে তাঁর ভ্রাতারা নানা স্থানে বাস করছেন। তাই তিনি বলদেবকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করে নারায়ণাশ্রম বদরিকা ক্ষেত্রে চলে গেলেন।

অম্বরীষের উপাখ্যান

শুক বললেন, মনুর পুত্র নভগের পুত্রের নাম নাভাগ। তিনি গুরুগৃহ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বড় ভাইরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য ভাগ রূপে পিতাকে দান করলেন। এই কথা শুনে পিতা নভগ তাঁকে বললেন, এই প্রতারণায় তুমি বিশ্বাস কোরো না। অঙ্গিরার পুত্ররা এখন যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁদের বৈশ্বদেব সম্বন্ধে মন্ত্র দুটি পাঠ করাও। স্বর্গে যাবার সময় তাঁরা তোমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন দিয়ে যাবেন। পিতার উপদেশে নাভাগ এই কাজ করলে অঙ্গিরার ত্ররা তাঁকে

অবশিষ্ট ধন দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু নাভাগ সেই ধন গ্রহণে উদ্যত হতেই এক কৃষ্ণকায় পুরুষ অর্থাৎ রুদ্র উত্তর দিক থেকে এসে বললেন, এই ধন আমার। নাভাগ বললেন, ঋষিরা যখন এই ধন আমাকে দিয়ে গেছেন, তখন এ আমারই। রুদ্র বললেন, এই বিবাদে তোমার পিতাকে প্রশ্ন করা উচিত। নাভাগ তাঁর পিতাকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দক্ষের যজ্ঞে উদ্বৃত্ত সব কিছুই ঋষিরা রুদ্রের ভাগ বলেছিলেন। কাজেই রুদ্রই জগতে সকল বস্তুর অধিকারী। নাভাগ ফিরে গিয়ে রুদ্রকে প্রণাম করে বললেন, এই ধন আপনারই। রুদ্র বললেন, তোমার পিতা ধর্মের কথা বলেছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলেছ। আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিচ্ছি। আর এই ধনও দান করলাম। বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করেও এ সমস্ত স্বপ্নের মতো তুচ্ছ মনে করেছিলেন। বাসুদেব ও তাঁর ভক্তদের প্রতি ভক্তির জন্য এই বিশ্ব তাঁর কাছে লোষ্ট্রের মতো তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তিনি জলশূন্য দেশে সরস্বতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে হরির আরাধনা করেছিলেন। তিনি বরণীর সঙ্গে সংবৎসর ব্যাপী দ্বাদশী ব্রত পালন করে যমুনায় স্নান করে মধুবনে হরির পূজা করলেন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার পর পারণের উপক্রম করলেন। ঠিক এই সময়ে ঋষি দুর্বাসা তাঁর গৃহে অতিথি হয়ে এলেন। রাজা তাঁর পূজা করে ভোজনের জন্য অনুরোধ করতে ঋষি সম্মত হয়ে মাধ্যাহ্নিক কর্মের জন্য প্রস্থান করলেন এবং যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মচিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে দ্বাদশী তিথির আর অর্ধ মুহূর্ত বাকি। এর মধ্যেই পারণ করতে হবে। আবার ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করলেও দোষ। এই ধর্ম সঙ্কটে পড়ে রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিচার করে ঠিক করলেন যে কিঞ্চিৎ জল পান করেই পারণ করবেন, কারণ ভোজন বা অভোজন

ভুয়ের তুল্য। এই স্থির করে রাজা জল মাত্র পান করে দুর্বাসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

যমুনার তীর থেকে ফিরে ঋষি নিজের বুদ্ধিবলে রাজার আচরণ বুঝতে পারলেন। ক্রোধে তাঁর সর্বশরীর কেঁপে উঠল। অম্বরীষকে কৃতাঞ্জলি অবস্থায় দেখেও তিনি বললেন, এই ঐশ্বর্যমত্ত প্রভুত্বাভিমানীর ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন দেখ। অতিথিকে নিমন্ত্রণ করেও নিজে আগে ভোজন করেছে। আমি এর ফল দেখাচ্ছি। বলে নিজের একগাছি জটা ছিঁড়ে কালাগ্নিতুল্য এক কৃত্যা সৃষ্টি করলেন। সেই কৃত্যাকে নিজের দিকে আসতে দেখেও রাজা বিচলিত হলেন না। ভক্তকে রক্ষার জন্য হরির সুদর্শন চক্র কৃত্যাকে ভস্মীভূত করল। দুর্বাসা দেখলেন যে তাঁর প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছে এবং সুদর্শন চক্র তাঁরই দিকে আসছে। প্রাণের ভয়ে তিনি চারি দিকে ছুটতে লাগলেন এবং সুদর্শন চক্র তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। সর্বত্র অন্বেষণ করেও তিনি যখন কোন আশ্রয় খুঁজে পেলেন না, তখন ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে বললেন, রক্ষা করুন। ব্রহ্মা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব বললেন, তুমি হরির শরণ নাও, তিনি তোমার মঙ্গল করবেন। তার পর দুর্বাসা বৈকুণ্ঠে গিয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন, আমি অপরাধী, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান বললেন, আমি এর উপায় বলছি শোন। সাধুদের প্রতি কোন তেজ প্রয়োগ করলে তা প্রয়োগকারীরই অমঙ্গল করে। তাই যাঁর নিকট থেকে এই হিংসার আবির্ভাব হয়েছে, তুমি তাঁরই শরণ নাও।

এর পর দুর্বাসা অম্বরীষের নিকটে এসে দুঃখিত চিত্তে তাঁর পা ধরলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রাজা সুদর্শন চক্রের স্তুতি করে বললেন, গদাধর আপনাকে দুষ্টের প্রহারের জন্য নিযুক্ত করেছেন। আপনি আমাদের সৌভাগ্যের জন্য এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল করুন। আমার যদি কোন সুকৃত থাকে, তাহলে ইনি বিপদ মুক্ত হোন।

রাজার এই প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র শান্ত হলেন এবং দুর্বাসা অম্বরীষকে আশীর্বাদ করে তাঁর প্রশংসা করলেন।

দুর্বাসার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় অম্বরীষ এত কাল অনাহারে ছিলেন। তাই তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করে আহার করালেন। দুর্বাসা ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে সাদরে অম্বরীষকে বললেন, এখন তুমি ভোজন কর। বলে আকাশ মার্গে ব্রহ্মার নিত্য লোকে গেলেন। দুর্বাসার পলায়নের পর অম্বরীষ এক বৎসর শুধু জল পান করে অতিবাহিত করেছিলেন। দুর্বাসা প্রস্থান করলে তিনি তাঁর পবিত্র উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করলেন।

অম্বরীষ তাঁর পুত্রদের রাজ্য ভার দিয়ে বনে গিয়েছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের নাম বিরূপ কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব এবং তাঁর পুত্র রথীতর। রথীতরের পুত্র না থাকায় মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁর ক্ষেত্রে কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন।

ইক্ষ্বাকুর বংশ

মনুর হাঁচির সময় তাঁর নাক থেকে ইক্ষাকুর জন্ম হয়। এই ইক্ষাকুর একশো পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি নিমি ও দণ্ডক শ্রেষ্ঠ। এঁদের মধ্যে পঁচিশজন আর্যাবর্তের পূর্ব ভাগে, পঁচিশজন পশ্চিম ভাগে, তিনজন মধ্য ভাগে ও অন্যরা উত্তর ও দক্ষিণের নানা স্থানে রাজা হয়েছিলেন।

একবার অষ্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে পবিত্র মাংস আনতে বলেছিলেন। বিকুক্ষি বনে গিয়ে অনেক পশুবধ করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে একটি শশকের মাংস খেয়ে ফেলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ ঐ মাংস দূষিত হয়েছে বলেন এবং ইক্ষাকু পুত্রের কর্ম জানতে পেরে ক্রোধবশে তাঁকে দেশ থেকে বাহির করে দেন। ইক্ষাকু রাজ্য ভোগে বিরক্ত হয়ে যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর বিকুক্ষি দেশে ফিরে শশাদ নামে পৃথিবী শাসন করেন।

বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়কে ইন্দ্রবাহন ও ককুৎস্থ নামেও উল্লেখ করা হয়। সত্য যুগের অবসানে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে পুরঞ্জয়ের সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে বাহন হতে বললে বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র বৃষ রূপে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন। পুরঞ্জয় তাঁর ককুদে আরোহণ করে দেবতাদের নিয়ে দৈত্যপুরী অবরোধ করেছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে দৈত্যরা আহত হয়ে পাতালে পলায়ন করেছিল। পুরঞ্জয় দৈত্যপুরী জয় করে সমস্ত ধন ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্যই তাঁর নাম পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহন ও ককুৎস্থ হয়।

পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, তাঁর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি, তাঁর পুত্র চন্দ্র। এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র বৃহদশ্ব এবং বৃহদশ্বের পুত্র কুবলায়শ্ব। উতঙ্ক ঋষির প্রীতির জন্য ইনি নিজের একুশ হাজার পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধুন্দু নামে এক অসুর বিনাশ করে ধুন্দুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুন্দুর মুখের আগুনে তাঁর পুত্রেরা ভস্মীভূত হয়। শুধু তিনজন রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম দৃঢ়াশ্ব কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব ও তাঁর পুত্র নিকুম্ভ। নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব ও কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ ও সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। এই যুবনাশ্ব নিঃসন্তান ছিলেন বলে একশো পত্নী নিয়ে বনে গিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে দিন যাপন করছিলেন। ঋষিরা তাঁর এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। একদিন রাতে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। তিনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের নিদ্রামগ্ন দেখে নিজেই একটি কলসীর জল পান করেন। ব্রাহ্মণরা জেগে দেখলেন যে কলসীর মন্ত্র জল রাজা পান করেছেন। যথাকালে তাঁর উদরের দক্ষিণ ভাগ ভেদ করে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। শিশু যখন স্তন্য পানের জন্য রোদন করছিল, তখন ইন্দ্র বলেছিলেন, 'মাং ধাতা' অর্থাৎ আমাকে পান করবে। এই বলে তিনি

শিশুকে নিজের তর্জনী চুষতে দিয়েছিলেন। এর জন্য সেই পুত্রের নাম হয় মান্ধাতা। যুবনাশ্বের উদর বিদীর্ণ হলেও তাঁর মৃত্যু হয় নি। তপস্যায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মান্ধাতার ভয়ে দস্যুরা ত্রস্ত থাকত বলে ইন্দ্র তাঁর নাম দিয়েছিলেন ত্রসদ্দস্যু। তিনি রাজচক্রবর্তী হয়ে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরায় আধিপত্য করেছিলেন। শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতী তাঁর পত্নী, এই পত্নীর গর্ভে তাঁর পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে পুত্র ও পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে ছিল। তারা সৌভরি ঋষিকে পতি রূপে বরণ করেছিল।

সৌভরির উপাখ্যান

একদা সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন এক মৎস্যের ক্রীড়া দেখে তাঁরও সংসার সুখের স্পৃহা জন্মে। তিনি রাজা মান্ধাতার নিকটে এসে একটি কন্যা চান। রাজা বললেন, আপনি স্বয়ংবরে কন্যা নিন। সৌভরি ভাবলেন যে তিনি বৃদ্ধ পক্ক-কেশ লোলচর্ম ও তাঁর মাথা কাঁপে দেখে রাজা তাঁকে মেয়েদের অপ্রিয় হবেন ভেবে প্রত্যাখ্যান করছেন। এই ভেবে তিনি নিজের দেহ সুন্দর করলেন। তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে পঞ্চাশটি রাজকন্যাই তাঁকে পতিত্বে বরণ করলেন। রাজকন্যারা তাঁকে পাবার জন্য পরস্পরে বিবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর তপস্যার অপার শক্তিবলে সমৃদ্ধিশালী হয়ে গৃহ উপবন ও সরোবরে বিহার করতে লাগলেন। তাঁর সুসমৃদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন দেখে মান্ধাতাও বিস্মিত হয়ে তাঁর রাজসম্পদের গর্ব ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু গৃহধর্মে আসক্ত সৌভরি এত সুখভোগ করেও পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। একদিন উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে তাঁর তপস্যার হানি হয়েছে। তপস্যায় রত অবস্থায় মৎস্যের সঙ্গ দোষে তাঁর এই অবস্থা। সংসারে বিরক্ত হয়ে তিনি বনে গেলেন এবং পত্নীরাও তাঁর অনুগমন করলেন। তীব্র তপস্যায় তিনি আত্মাকে

পরমাত্মায় যুক্ত করেছিলেন। ঋষির পত্নীরাও তাঁর এই গতির অনুসরণ করেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র চরিত

মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষকে তাঁর পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনাশ্ব এঁর পুত্র এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। ভগিনী নর্মদাকে তাঁর ভ্রাতা সর্পরা পুরুকুৎসের হাতে সম্প্রদান করলে নর্মদা তাঁকে নাগরাজের কথায় পাতালে নিয়ে যান। পুরুকুৎস সেখানে বধযোগ্য গন্ধর্বদের বিনাশ করলে নাগরাজ বর দেন যে তাঁকে স্মরণ করলে সর্পভয় থাকবে না। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু অনরণ্যের পিতা, অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, তাঁর পুত্র প্রারুণ এবং প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। পিতার অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে যান। এখনও তাঁকে আকাশে দেখা যায়। দেবতারা তাঁকে স্বর্গ থেকে ফেলে দিলে বিশ্বামিত্র নিজের শক্তির বলে তাঁকে আকাশে স্তম্ভিত করে রেখেছেন। এই ত্রিশঙ্কুর পুত্রই হরিশ্চন্দ্র। তাঁর জন্যই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পক্ষীরূপে বহু বৎসর যুদ্ধ হয়েছিল।

সন্তানহীন বিষণ্ণ রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের উপদেশে বরুণের শরণাগত হয়ে বলেছিলেন, যদি আমার পুত্র হয় তো তাকেই আমি পশুরূপে উৎসর্গ করে আপনার যাগ করব। বরুণ বলেছিলেন, তথাস্তু। তারপর তাঁর রোহিত নামে পুত্র জন্মে। বরুণ তাকে দিয়ে যজ্ঞ করতে বললে হরিশ্চন্দ্র বললেন, দশদিন অতীত হলে সে যজ্ঞের যোগ্য হয়। দশদিন পর যজ্ঞ করতে বললে, হরিশ্চন্দ্র বললেন, পশুর দাঁত উঠলে সে যজ্ঞের যোগ্য হয়। দাঁত উঠবার পর বরুণ যখন তাঁকে যজ্ঞ করতে বললেন, তখন হরিশ্চন্দ্র বললেন, এই দাঁতগুলি পড়বার পর সে যজ্ঞের যোগ্য হবে। দাঁত পড়বার পরে বরুণ আবার যজ্ঞ করতে বললে হরিশ্চন্দ্র বললেন, পুনরায় দাঁত উঠলেই

পশু শুদ্ধ হয়। তারপর আবার দাঁত উঠবার পর বরুণ এসে যজ্ঞ করতে বললে হরিশ্চন্দ্র বললেন, ক্ষত্রিয় পশু বর্ম পরিধানের যোগ্য হলেই পবিত্র হয়। এইভাবে স্নেহাবদ্ধ পিতা যতদিন বঞ্চনা করেছিলেন, বরুণ ততদিনই অপেক্ষা করেছিলেন। বড় হয়ে রোহিতাশ্ব এই কথা জানতে পেরে প্রাণরক্ষার জন্য বনে গেলেন। সেখানে তিনি পিতাকে জলোদর রোগে আক্রান্ত জেনে ফিরে আসতে উদ্যত হলে ইন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, তীর্থের সেবা করে পৃথিবী পর্যটন পুণ্য কাজ, তুমি তাই কর। এই কথায় রোহিত এক বৎসর বনে কাটালেন। প্রতি বছরই ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে গ্রামে ফিরতে নিষেধ করতেন। এই ভাবে ষষ্ঠ বর্ষও বনে বিচরণ করে নিজের পুরীতে ফেরার পথে অজীগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে যজ্ঞীয় পশুরূপে পিতাকে অর্পণ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করে জলোদর রোগ মুক্ত হন। বিশ্বামিত্র রাজার সত্যবলাশ্রিত ধৈর্য দেখে তাঁকে অবাধ জ্ঞান দান করেছিলেন।

সগর চরিত

রোহিতের পুত্রের নাম হরিত, তাঁর পুত্র চম্প চম্পানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র সুদেব, তাঁর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক, তাঁর পুত্র বৃক ও বৃকের পুত্র বাহুক। শক্ররা রাজ্য হরণ করলে পত্নীকে নিয়ে বাহুক বনে আশ্রয় নেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দেহত্যাগের পর রাণী সহমরণের ইচ্ছা করলে মহর্ষি ঔর্ব তাঁকে গর্ভবতী জেনে এই কাজে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাঁর স্বপত্নীরা তাঁকে গর অর্থাৎ বিষ খেতে দেন। এই বিষের সঙ্গেই একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে সগর নামে বিখ্যাত হন। তিনি সার্বভৌম রাজা ছিলেন এবং তাঁর পুত্ররাই সাগরের সৃষ্টি করেন। ইনি গুরুর নির্দেশে তালজঙ্ঘ যবন শক হৈহয় ও বর্বরদের বধ না করে বিকৃত বেশধারী করেছিলেন। তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে ইন্দ্র একটি অশ্ব হরণ করে নিয়ে যান। তাঁর এক পত্নী সুমতির

পুত্ররা কপিলমুনির নিকটে অশ্বটি দেখতে পান। কপিল মুনিই অশ্ব অপহরণ করেছেন এই বলে ইন্দ্র তাঁদের মতিভ্রম ঘটালে তাঁরা মুনিকে বধ করতে উদ্যত হয়ে নিজের পাপেই ভস্মীভূত হন।

সগরের অন্য পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জসের জন্ম হয়। তাঁর পুত্র অংশুমান। অসমঞ্জস পূর্বজন্মে যোগী ছিলেন এবং জাতিস্মর হয়ে জন্মেছিলেন বলে লোকসঙ্গের ভয়ে অসামাজিক আচরণ করতেন। পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করলে তিনি বনে চলে যান। যে বালকদের তিনি সরযূর জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, তাদের আবার ফিরে আসতে দেখে অযোধ্যাবাসী সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সগরও অনুতাপ করেছিলেন। অংশুমান অশ্বের অন্বেষণে বেরিয়ে অশ্বটিকে কপিলের আশ্রমে দেখে তাঁর স্তব করেন। অংশুমান কৃপার যোগ্য ভেবে কপিল বললেন, তোমার পিতামহের যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে যাও এবং তোমার এই পিতৃগণ গঙ্গাজলেই উদ্ধার হবেন। অশ্ব নিয়ে অংশুমান ফিরে এলেন। এঁরই উপরে রাজ্যের ভার দিয়ে সগর পরম গতি লাভ করেন।

গঙ্গাবতরণ

শুক বললেন, গঙ্গা আনয়নের জন্য বহুকাল তপস্যা করেও অংশুমান কৃতকার্য হন নি, তাঁর পুত্র দিলীপও ব্যর্থ হয়েছিলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে গঙ্গা তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, আমি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? আর সবাই যখন আমার জলে নিজের পাপ ধোবে, তখন সেই পাপ আমি কোথায় ধোব? ভগীরথ বললেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা তাঁদের গাত্র সঙ্গে আপনার পাপ হরণ করবেন এবং রুদ্র আপনার বেগ ধারণ করবেন। এই বলে ভগীরথ তপস্যায় খুব সত্বর শিবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং তিনি গঙ্গাকে ধারণ

করলেন। ভগীরথ রথে আরোহণ করে বায়ুবেগে চললেন এবং গঙ্গা তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর জলে সগরের ভস্মীভূত সন্তানদের উদ্ধার করলেন।

সৌদাসের উপাখ্যান

ভগীরথের পুত্রের নাম শ্রুত, তাঁর পুত্র নাভ। নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ এবং অযুতায় তাঁর পুত্র। নলের সখা ঋতুপর্ণ অযুতায়ুর পুত্র। ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষক্রীড়ার রহস্য শিখিয়ে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্রের নাম সর্বকাম। সুদাস সর্বকামের পুত্র। সুদাসের পুত্র কোথাও মিত্রসহ কোথাও বা কল্মাষপাদ নামে পরিচিত। মদয়ন্তী তাঁর পত্নী এবং নিজ কর্মবশে ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। বশিষ্ঠের শাপে ইনি রাক্ষস হয়েছিলেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুক বললেন, মৃগয়ায় গিয়ে সৌদাস একটি রাক্ষস বধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই ভ্রাতা রাজার গৃহে পাচক হয়ে এসেছিল। একদিন গুরু বশিষ্ঠ ভোজন করবেন বলে সে নরমাংস পাক করে আনে। দিব্য দৃষ্টিতে এ কথা জেনে বশিষ্ঠ রাজাকে শাপ দিয়েছিলেন, তুমি রাক্ষস হও। পরে রাজার কোন দোষ নেই জেনে এই শাপ বারো বৎসর স্থায়ী হবে বলেছিলেন। সেই সময় সৌদাসও হাতে জল নিয়ে গুরুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে পত্নী মদয়ন্তী বারণ করেন এবং রাজা হাতের জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করায় তাঁর পা কল্মাষ অর্থাৎ নানা বর্ণবিশিষ্ট হয়।

রাক্ষস হবার পর রাজা একদিন বনে এক মৈথুনরত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পান। ক্ষুধার্ত রাজা ব্রাহ্মণকে ধরলে ব্রাহ্মণী বললেন, আমি পুত্রকামা, আপনি আমার পতিকে এখন বধ করবেন না। তা না হলে এঁকে ভক্ষণ করবার আগে আমাকেই খেয়ে ফেলুন। কিন্তু সৌদাস ব্রাহ্মণকেই আগে ভক্ষণ করায় ব্রাহ্মণী তাঁকে শাপ

দিলেন, মৈথুনে রত হলে তোমারও মৃত্যু হবে। তারপর তিনি স্বামীর জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেহত্যাগ করলেন।

বারো বৎসর পর শাপমুক্ত হয়ে রাজা মৈথুনে উদ্যত হলে মদয়ন্তী তাঁকে বারণ করেন। এরপর তাঁকে স্ত্রীসঙ্গ সুখ ত্যাগ করতে হয়। মদয়ন্তীর গর্ভাধানের জন্য তিনি বশিষ্ঠকেই নিয়োগ করেছিলেন। সাত বৎসর গর্ভধারণ করবার পরেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না দেখে বশিষ্ঠ অশ্ম অর্থাৎ পাথর দিয়ে মদয়ন্তীর উদরে আঘাত করলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এইজন্য সেই পুত্রের নাম হয় অশ্মক।

অশ্মকের পুত্র বালিককে নারীরা চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পরশুরামের হাত থেকে রক্ষা করে বলে তাঁর নাম হয় নারী কবচ। পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন হবার পরে ইনিই ক্ষত্রিয় কুলের মূল হবার জন্য মূলক নামেও পরিচিত হন। মূলকের পুত্র দশরথ। তাঁর পুত্র ঐড়বিড়ি এবং ঐড়বিড়ির পুত্র বিশ্বসহ রাজচক্রবর্তী খট্বাঙ্গের পিতা। দেবতাদের প্রার্থনায় ইনি দৈত্য বিনাশ করেন এবং নিজের আয়ু আর মুহূর্তকাল অবশিষ্ট আছে জেনে গৃহে ফিরে আত্মাভিমান ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিয়েছিলেন।

রাম চরিত

শুক বললেন, খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘাবাহুর পুত্র। রঘুর পুত্র অজ ও দশরথ অজের পুত্র। দেবতাদের প্রার্থনায় হরি রাম লক্ষ্মণ ও ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার অংশে দশরথের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। রামের চরিত কথা আপনি অনেকবার শুনেছেন। তবু সংক্ষেপে বলছি। তিনি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞক্ষেত্রে রাক্ষস বধ করেছিলেন। সীতার স্বয়ম্বরে হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে জয় করেছিলেন। ফেরার পথে দর্প চূর্ণ করেছিলেন পরশুরামের। তাঁর সত্য পাশে আবদ্ধ স্ত্রৈণ পিতার আদেশ মেনে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। সূর্পনখার রূপ বিকৃত করে খর দূষণ প্রভৃতি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেছিলেন।

তাঁর অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতা হরণ করেছিলেন। রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের চেষ্টায় নিহত জটায়ু পক্ষীর দাহ করেছিলেন। তারপর বানরদের সঙ্গে মিত্রতা করে বালী বধের পরে লঙ্কায় সীতার অবস্থানের কথা জানতে পাবেন। সমুদ্রে সেতু বন্ধনের পর লঙ্কায় প্রবেশ করে তিনি রাবণকে বধ করেছিলেন। রামের কথায় বিভীষণ জ্ঞাতিদের পারলৌকিক ক্রিয়া করেন। তারপর তিনি অশোক বনে সীতাকে দেখতে পান। বিভীষণকে লঙ্কাপুরীর আধিপত্য দিয়ে সবাইকে নিয়ে তিনি পুষ্পক রথে অযোধ্যা যাত্রা করেন।

রাম জটাবল্কলধারী ভরতের কথা শুনে সন্তাপবোধ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতির কথা শুনে ভরত রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে অগ্রসর হলেন। রাম তাঁকে পেয়ে আলিঙ্গন করলেন। অনেকদিন পর প্রজারা তাঁকে পেয়ে ফুলের মালা দিয়ে নৃত্য করেছিল। কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁর অভিষেক করলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের রোগ জরা শোক ও ভয় ছিল না, অনিচ্ছায় মৃত্যুও হত না।

একসময়ে তিনি তাঁর সম্বন্ধে প্রজাদের মনের ভাব জানবার জন্য রাত্রিকালে ভ্রমণ করতে করতে শুনতে পেলেন যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছে, স্ত্রৈণ রাম পরগৃহীতা সীতাকে ভরণপোষণ করতে পারেন, কিন্তু তোমার মতো পরগৃহগামী দুষ্ট অসতীকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। এই কথা শোনবার পর রাম লোকভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করলেন এবং সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং যথাসময়ে কুশ ও লব নামে যমজ পুত্র প্রসব করলেন। বাল্মীকি তাঁদের জাতকর্ম করলেন।

লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে দুই পুত্র, ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামে দুই পুত্র এবং শত্রুঘ্নেরও সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। ভরত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অসংখ্য গন্ধর্ব বধ করে তাঁদের ধন এনে রামকে দিয়েছিলেন। শত্রুঘ্ন মধু দৈত্যের পুত্র লবন নামে রাক্ষসকে বধ করে মধুবনে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সীতা তাঁর দুই পুত্র

বাল্মীকিকে সমর্পণ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাম তেরো বৎসর অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের পর জ্যোতির্ময় ধামে যাত্রা করেছিলেন।

কুশের পুত্রের নাম অতিথি, তাঁর পুত্র নিষধ। নভ নিষধের পুত্র. তাঁর পুত্র পুণ্ডরীক এবং ক্ষেমধন্বা পুণ্ডরীকের পুত্র। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তাঁর পুত্র অনীহ, তাঁর পুত্র পারিযাত্র, তাঁর পুত্র বলস্থল এবং সূর্যের অংশে বজ্রনাভ নামে বলস্থলের এক পুত্র জন্মে। বজ্রনাভের পুত্র সগণ, তাঁর পুত্র বিধৃতি এবং তার পুত্র হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য হয়েছিলেন। এঁর নিকটে কৌশল্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অধ্যাত্ম যোগ শিক্ষা করেছিলেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, তাঁর পুত্র ধ্রুবসন্ধি, তাঁর পুত্র সুদর্শন, তাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ, তাঁর পুত্র শীঘ্র ও শীঘ্রের পুত্র মরু। যোগে সিদ্ধিলাভ করে মরু সম্প্রতি কলাপগ্রামে বাস করছেন এবং কলির অবসানে পুনরায় সূর্যবংশ প্রবর্তন করবেন।

মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তাঁর পুত্র সন্ধি, তাঁর পুত্র অমর্ষণ, তাঁর পুত্র মহস্বান এবং তাঁর পুত্র বিশ্ববাহু। বিশ্ববাহুর পুত্র প্রসেনজিৎ, তাঁর পুত্র তক্ষক এবং তাঁর পুত্র বৃহদ্বল। আপনার পিতা অভিমন্যু যুদ্ধে এই বৃহদ্বলকে বধ করেছিলেন।

ইক্ষাকু বংশের এই সব রাজা অতীত হয়েছেন। এর পর ভবিষ্যৎ রাজাদের কথা শুনুন। বৃহদ্বলের পুত্র বৃহদ্রণ, তাঁর পুত্র উরুক্রিয়, তাঁর পুত্র বৎসবৃদ্ধ, তাঁর পুত্র প্রতিব্যোম, তাঁর পুত্র ভানু এবং দিবাক নামে ভানুর পুত্র জন্মাবেন দিবাকের পুত্র সহদেব, তাঁর পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁর পুত্র ভানুমান, তাঁর পুত্র প্রতীকাশ্ব এবং তাঁর পুত্র হবেন সুপ্রতীক। সুপ্রতীকের পুত্র মরুদেব, তাঁর পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁর পুত্র পুষ্কর, তাঁর পুত্র অন্তরীক্ষ, তাঁর পুত্র সুতপা এবং তাঁর অমিত্রজিৎ নামে পুত্র উৎপন্ন হবে। অমিত্রজিতের পুত্র বৃহদ্রাজ, তাঁর পুত্র বর্হি, তাঁর পুত্র কৃতঞ্জয়, তাঁর পুত্র রণঞ্জয় এবং তাঁর সঞ্জয় নামে পুত্র জন্মাবে। সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, তাঁর পুত্র শুদ্ধোদ, তাঁর পুত্র লাঙ্গল,

তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ এবং তাঁর পুত্রের নাম হবে ক্ষুদ্রক। ক্ষুদ্রকের পুত্র রণক, তাঁর পুত্র সুরথ, এবং সুরথের পুত্র সুমিত্রই ইক্ষাকু বংশের শেষ রাজা। এঁর রাজত্বকালের পরেই কলিযুগে এই বংশ লোপ পাবে।

নিমির উপাখ্যান ও তাঁর বংশ

শুকদেব বললেন, ইক্ষাকুর পুত্র নিমি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক পদে বরণ করলে বশিষ্ঠ বললেন, ইন্দ্র আমাকে পূর্বেই ঋত্বিক পদে বরণ করেছেন। আমি যতক্ষণ তাঁর যজ্ঞ শেষ করে না আসছি, ততক্ষণ আপনি অপেক্ষা করুন। রাজা নিমি এই কথা শুনে কিছু বললেন না। কিন্তু জীবন অনিত্য ভেবে অন্য ঋত্বিক দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ এসে নিমির অন্যায় আচরণ দেখে অভিশাপ দিলেন, এই পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহের পতন হোক। নিমিও গুরুকে অভিশাপ দিলেন, লোভের জন্য আপনারও দেহের পতন হোক। উভয়েই দেহত্যাগ করলেন।

উর্বশীর দর্শনে মিত্র ও বরুণের বীর্য থেকে এক কুম্ভের মধ্যে আমার প্রপিততামহ বশিষ্ঠের জন্ম হল। মুনিরা নিমির মৃতদেহ গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে রেখে যজ্ঞে সমাগত দেবতাদের নিকটে প্রার্থনা করলেন, রাজা জীবিত হোন। দেবতারা বললেন, তাই হোক। কিন্তু নিমি বললেন, আমার যেন আর দেহ বন্ধন না হয়। দেবতারা বললেন, ইনি বিদেহ হয়েই প্রাণীদের নেত্রে বাস করবেন। তাঁর অবস্থানের জন্যই সমস্ত প্রাণীর নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ হচ্ছে।

অরাজকতার ভয়ে ঋষিরা তাঁর দেহ মন্থন করলে এক কুমারের জন্ম হয়। তাঁর নাম জনক। বিদেহ নিমি থেকে জন্ম বলে বৈদেহ এবং মন্থনে জন্ম বলে মিথিল নাম হয়। ইনিই মিথিলা পুরী নির্মাণ করেছিলেন।

এই জনকের পুত্র উদাবসু, তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন, তাঁর পুত্র সুকেতু

এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, তাঁর পুত্র মহাবীর্য, তাঁর পুত্র সুধৃতি, তাঁর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর পুত্র হর্যশ্ব এবং হর্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীপক, তাঁর পুত্র কৃতরথ, তাঁর পুত্র দেবমীর, তাঁর পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, তাঁর পুত্র মহারোমা, তাঁর পুত্র স্বর্ণরোমা ও তাঁর পুত্র হ্রস্বরোমা। সীরধ্বজ এঁরই পুত্র। ইনি যখন যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন সীর অর্থাৎ লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতার আবির্ভব হয়েছিল। এরই জন্যে তিনি সীরধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হন।

সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, তাঁর পুত্র ধর্মধ্বজ এবং কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামে ধর্মধ্বজের দুই পুত্র। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যায় নিপুণ ও মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন এবং খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান, ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি, তাঁর পুত্র সনদ্বাজ, তাঁর পুত্র উর্জকেতু, তাঁর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি, তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু, তাঁর পুত্র সুপার্শ্বক, সুপার্শ্বকের পুত্র চিত্ররথ ও তাঁর পুত্র ক্ষেমাধি। ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, তাঁর পুত্র সত্যরথ, তাঁর পুত্র উপগুরু এবং অগ্নির অংশে এঁরই উপগুপ্ত নামে পুত্র জন্মে। উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তাঁর পুত্র যুযুধ, তাঁর পুত্র সুভাষণ. তাঁর পুত্র শ্রুত, তাঁর পুত্র জয়, তাঁর পুত্র বিজয় এবং বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র বীতহব্য, তাঁর পুত্র ধৃতি, তাঁর পুত্র বহুলাংশ, তাঁর পুত্র কৃতি এবং কৃতির পুত্র মহাবশী। মিথিলার এই রাজারা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির অনুগ্রহে আত্মবিদ্যায় নিপুণ হয়ে গৃহে থেকেও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বমুক্ত ছিলেন।

চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ও পুরূরবার উপাখ্যান

শুক বললেন, এর পর চন্দ্রবংশের কথা বলছি। পরমপুরুষের নাভি থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে সোম নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ ওষধি ও নক্ষত্রের অধিপতি করেছিলেন। ত্রিভুবন জয় করে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন ও দর্পের বশে বৃহস্পতির পত্নী তারাকে সবলে হরণ করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বার বার সোমকে অনুরোধ করেও তারাকে ফিরে না পেতে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হল। বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষের জন্য শুক্রাচার্য ও অসুররা চন্দ্রের পক্ষ নিলেন। অঙ্গিরার নিকটে বিদ্যালাভ করেছিলেন বলে শিব এসে গুরুপুত্র বৃহস্পতির সহায় হলেন। দেবতারাও তাঁর অনুগামী হলেন। অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে এই কথা জানালে ব্রহ্মা সোমকে ভর্ৎসনা করে তারাকে স্বামীর নিকটে অর্পণ করলেন। কিন্তু তারা তখন গর্ভবতী দেখে বৃহস্পতি বললেন, আমি সন্তানার্থী বলে তোমাকে ভস্ম করব না, কিন্তু তুমি এই গর্ভ ত্যাগ কর। লজ্জায় তারা গর্ভ ত্যাগ করলেন। কিন্তু সেই স্বর্ণকান্তি কুমারকে দেখে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই বললেন, এই পুত্র আমার। তাঁদের বিবাদ দেখে দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি লজ্জায় কিছু বললেন না। মাতার এই অলীক লজ্জা দেখে কুমার বললেন, নিজের দোষ বলছ না কেন, সত্য কথা প্রকাশ কর। ব্রহ্মা তারাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই কথা জানতে চাইলে তারা বললেন, এই পুত্র চন্দ্রের। এর পরে চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি দেখে নামকরণ করলেন বুধ।

বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্মের কথা পূর্বেই বলেছি নারদ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপগুণের বর্ণনা করলে উর্বশী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকটে এসেছিলেন। মিত্র ও বরুণের অভি-শাপে তিনি মনুষ্য ভাব নিয়েই এসেছিলেন। পুরূরবা হর্ষ ভরে বললেন, বল তোমার কোন্ প্রিয় কাজ করব। তুমি আমার সঙ্গে

বিহার কর। উর্বশী বললেন, কে না তোমার প্রতি আসক্ত হয়! আমার এই মেষ দুটি রাখো। আমি শুধু ঘৃত খাব এবং তোমাকে নগ্ন দেখব না। পুরূরবা সম্মত হলেন এবং উর্বশীর সঙ্গে দীর্ঘকাল আমোদ উপভোগ করলেন।

এদিকে ইন্দ্র উর্বশী না থাকলে তাঁর সভা শোভা পায় না বলে উর্বশীকে আনবার জন্যে গন্ধর্বদের পাঠালেন। তারা মধ্য রাত্রে এসে উর্বশীর মেষ দুটি হরণ করল। তাদের কাতর চিৎকারে উর্বশী হায় হায় করে উঠলে রাজা উলঙ্গ অবস্থাতেই খড়্গ হাতে ধাবিত হলেন। গন্ধর্বরা মেষ পরিত্যাগ করে দীপ্তি বিস্তার করতেই উর্বশী মেষ নিয়ে নগ্ন স্বামীকে ফিরে আসতে দেখলেন। ফিরে এসে পুরূরবা আর পত্নীকে দেখতে পেলেন না। তাঁর শোকে উন্মত্তের মতো পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। অনেক পরে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে পাঁচ-জন সখীর সঙ্গে তাঁকে দেখে বললেন, আবার আমাকে ত্যাগ করে যেও না। উর্বশী বললেন, কারও প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগ জন্মে না। তাদের হৃদয় বৃকের মতো নিষ্ঠুর। সামান্য কারণে পতি বা ভ্রাতাকেও হত্যা করতে পারে। কুলটা স্ত্রী তো নিত্য নূতন পুরুষ পেতে চায়। তবে তুমি সংবৎসর পরে এক রাত্রির জন্য আমাকে পাবে এবং তোমার আরও সন্তান হবে।

রাজা এক বৎসর পরে এসে তাঁর পুত্রের জননী উর্বশীর সঙ্গে এক রাত্রি বাস করলেন। রাজাকে বিরহে কাতর দেখে উর্বশী বললেন, তুমি গন্ধর্বদের স্তুতি কর, তাঁরা আমাকে তোমার নিকট অর্পণ করবেন। রাজার স্তুতিতে গন্ধর্বরা তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী দিলেন। রাজা যখন বুঝলেন যে এটি অগ্নিস্থালী, উর্বশী নন, তখন সেই স্থালী বনে ফেলে গৃহে ফিরলেন। পরে সেই স্থানের বৃক্ষ থেকে দুটি অরণি নির্মাণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেছিলেন। সেই অগ্নি ত্রিবিধ রূপে পরিণত হয়। ত্রেতায় পুরূরবার জন্যই বেদ ত্রয়ী রূপে প্রকাশিত হয়। সেই অগ্নিতে যজ্ঞ করে পুরূরবা গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম আয়ু শ্রুতায়ু সত্যায়ু অয় বিজয় ও জয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান, সত্যায়ুব পুত্র শ্রুতঞ্জয়, অয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তাঁর পুত্র হোত্রক। হোত্রকের পুত্র জহ্নু গণ্ডূষে গঙ্গাপান করেছিলেন। তাঁর পুত্র পুরু, বলাক পুরুর পুত্র এবং বলাকের পুত্র অজক। কুশ অজকের পুত্র এবং কুশের পুত্র কুশাম্বু তনয় বসু ও কুশনাভ। গাধি কুশাম্বুর পুত্র।

জমদগ্নি কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরাম

ঋচীক নামে ভৃগু বংশজাত এক ব্রাহ্মণ গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করতে চাইলে গাধি পণরূপে চন্দ্রতুল্য কান্তি ও একটি কালো শ্যামবর্ণ এই রকম এক হাজার অশ্ব চান। ঋচীক বরুণের নিকট থেকে অশ্ব এনে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ও শ্বশ্রূ উভয়েই সন্তান কামনা করলে তিনি দুজনের জন্য চরু প্রস্তুত করেন। মা কন্যার চরু ভক্ষণ করেছেন জানতে পেরে বললেন, এর ফলে তোমার পুত্র উগ্র ও হিংসাপরায়ণ ও ভ্রাতা বেদজ্ঞ হবে। সত্যবতীর অনুরোধে মুনি বলেন যে পুত্র এ রকম না হলে পৌত্র হবে। এর পর সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। রেণুকার গর্ভে তাঁর বসুমান প্রভৃতি পুত্র জন্মে, তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ রাম বা পরশুরাম। রাম বাসুদেবের অংশ জাত এবং একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুক বললেন, হৈহয় রাজা কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন দত্তাত্রেয় ঋষির পরিচর্যা করে সহস্র বাহু ও দুর্ধর্ষ হয়েছিলেন। একবার তিনি নর্মদায় স্নানের সময় জল প্রবাহ রুদ্ধ করলে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত রাবণের শিবির প্লাবিত হয়। রাবণ আক্রমণ করলে অর্জুন তাঁকে অনায়াসে বন্দী করে মাহিষ্মতী পুরীতে আবদ্ধ করে রাখেন ও পরে মুক্তি দেন। ইনিই একবার মৃগয়ায় বেরিয়ে

জমদগ্নির আশ্রমে আসেন। একটি মাত্র কামধেনুর সাহায্যে সকলের অতিথি সৎকার করলে রাজা সেই ধেনু সবলে হরণ করে নিয়ে যান। রাম আশ্রমে ফিরে এই দৌরাত্ম্যের কথা শুনে তাঁর পরশু বা কুঠার দিয়ে রাজার সমস্ত সৈন্য বধ করে রাজাকেও বধ করেন। তিনি ধেনু নিয়ে আশ্রমে ফিরলে পিতা তাঁকে বলেন, ব্রাহ্মণের গুণই ক্ষমা। তুমি তীর্থ সেবা করে পাপ পরিহার কর।

পরশুরাম এক বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে আশ্রমে ফিরলেন। একদিন রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদেব সঙ্গে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে ক্রীড়ারত দেখে সকৌতুকে বিলম্ব করেছিলেন। মুনি এই অন্যায়ের জন্য পুত্রদের বলেছিলেন, এই পাপীয়সীকে হত্যা কর। তাঁরা এই আদেশ পালন না করলে পরশুরাম পিতার কথায় মায়ের সঙ্গে ভাইদেরও হত্যা করেন। এতে তুষ্ট হয়ে জমদগ্নি বর দিতে চাইলে পরশুরাম নিহতদের পুনর্জীবন ও তাঁদের হত্যাকাণ্ডের বিস্মৃতি এই দুটি বর চেয়েছিলেন। এতে তাঁরা নিদ্রাভঙ্গের পর জেগে ওঠার মতো গাত্রোত্থান করেন।

কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার পুত্র ছিল। পরশুরামের অনুপস্থিতিতে তাঁরা জমদগ্নির আশ্রমে এসে অগ্নিশালায় তাঁকে হত্যা করেন। পরশুরাম ফিরে এসে পিতার মৃত্যু দেখে মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়ে সেই পুত্রদের মাথা কাটেন। এই ঘটনাকেই নিমিত্ত করে তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে তাদের রক্তে সমন্ত পঞ্চক ক্ষেত্রে নয়টি হ্রদ নির্মাণ করেন। এখন তিনি প্রশান্ত চিত্তে মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন।

বিশ্বামিত্রের কথা

রাজা গাধীর পুত্র বিশ্বামিত্র তপস্যায় ব্রহ্মতেজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর এক শত পুত্রের মধ্যে মধুচ্ছন্দ মধ্যম। তিনি ভৃগুবংশীয় অজীগর্তের পুত্র দেবরাত ওরফে শুনঃশেফকে পুত্র

রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অজীগর্ত ঐ পুত্রকে হরিশ্চন্দ্রের নিকটে পশুরূপে বিক্রয় করলে বিশ্বামিত্র তাঁকে পাশবন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাঁর যে উনপঞ্চাশজন পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করলেন না। তাঁরা পিতার শাপে ম্লেচ্ছ হলেন।

আয়ুর বংশ

শুক বললেন, পুরূরবার পুত্র আয়ুর পাঁচ পুত্রের নাম নহুষ ক্ষত্রবৃদ্ধ রজি রম্ভ ও অনেনা। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের কাশ্য কুশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র। গৃৎসমদের পুত্র শুনক এবং শৌণক এঁরই বেদজ্ঞ পুত্র। কাশ্যের পুত্র কাশি, তাঁর পুত্র রাষ্ট্র, তাঁর পুত্র দীর্ঘতমা এবং আয়ুর্বেদের প্রবর্তক ধন্বন্তরি দীর্ঘতমার পুত্র এবং বাসুদেবের অংশে এঁর জন্ম। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, তাঁর পুত্র ভীমরথ, তাঁর পুত্র দিবোদাস, তাঁর পুত্র দ্যুমান প্রতর্দন নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনিই শত্রুজিৎ বৎস ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত। তাঁর অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মেছিল। অলর্ক ছাড়া আর কোন রাজা অক্ষুণ্ণ যৌবনের অধিকারী হয়ে ছেষট্টি হাজার বছর রাজ্য ভোগ করেন নি। অলর্কের পুত্র সন্ততি, তাঁর পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র সুকেতন, তাঁর পুত্র ধর্মকেতু, তাঁর পুত্র সত্যকেতু। সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু। তাঁর পুত্র সুকুমার, তাঁর পুত্র বীতিহোত্র, তাঁর পুত্র ভর্গ এবং ভর্গের পুত্র ভার্গভূমি। রম্ভের পুত্র রভস, তাঁর পুত্র গম্ভীর ও গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাঁর পুত্র শুচি, এবং তাঁর পুত্র চিত্রকু। চিত্রকুর পুত্র শান্তরজা। রজির পাঁচশো পুত্র হয়। তিনি দেবতাদের কথায় দৈত্য সংহার করে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিলে দেবরাজ তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রজির মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্ররা স্বর্গের আধিপত্য করতে থাকলে বৃহস্পতির বুদ্ধিতে ইন্দ্র তাঁদের বধ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ, তাঁর পুত্র প্রতি, তাঁর পুত্র সঞ্জয়, তাঁর পুত্র জয়, তাঁর পুত্র কৃত, তাঁর পুত্র হর্যবল, তাঁর পুত্র সহদেব,

তাঁর পুত্র হীন, তাঁর পুত্র জয়সেন, তাঁর পুত্র সংকৃতি এবং সংকৃতির পুত্র জয়।

যযাতির উপাখ্যান

শুক বললেন, রাজা নহুষের যতি যযাতি সংযাতি আয়তি বিয়তি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র হয়। স্বর্গরাজ্য পাবার পর নহুষ শচীর প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জন্য অগস্ত্যের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অজগরত্ব প্রাপ্ত হন। যতি রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে যযাতি রাজা হন। তিনিই চার ভাইকে চার দিকে শাসনের ভার দিয়ে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, ক্ষত্রিয় যযাতি ব্রাহ্মণকন্যাকে কেন প্রতিলোম বিবাহ করেছিলেন?

শুক বললেন, দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও সহস্র সখীর সঙ্গে সরোবরের তীরে নিজেদের বস্ত্র রেখে জলে বিহার করছিলেন। এই সময়ে পার্বতীর সঙ্গে শিবকে বৃষে আরোহণ করে যেতে দেখে সবাই লজ্জায় তীরে উঠে বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। ব্যস্ততা বশত শর্মিষ্ঠা নিজের মনে করে গুরুকন্যার বস্ত্র পরিধান করলে দেবযানী বললেন, শূদ্রের বেদধারণের মতো অসুর কন্যা এই দাসী আমার কাপড় পরেছে। গুরুকন্যার এই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠা বললেন, ভিক্ষুকী, তোমরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না? বলে দেবযানীর বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে একটা কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন।

মৃগয়ায় এসে রাজা যযাতি দৈবাৎ দেবযানীকে দেখতে পেলেন। তিনি বিবস্ত্রা দেবযানীকে পরিধানের জন্য নিজের উত্তরীয় দিয়ে হাত ধরে তাঁকে কূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করলেন। দেবযানী বললেন, আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আর কেউ যেন আমাকে বিবাহ না করে। বৃহস্পতির পুত্র কচের অভিশাপে কোন ব্রাহ্মণ আমার

পাণিগ্রহণ করবেন না। এই বিবাহ অশাস্ত্রীয় হলেও যযাতি তা মেনে নিয়েছিলেন।

এর পর দেবযানী কাঁদতে কাঁদতে এসে শুক্রাচার্যের কাছে শর্মিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। শুক্রাচার্য মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দৈত্যপুরী ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃষপর্বা তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য তাঁর পায়ে ধরলেন। এতেই শুক্রাচার্য সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তো কন্যাকে ত্যাগ করতে পারি না, তুমি তার অভিলাষ পূর্ণ কর। দেবযানী বললেন, আমি যেখানে যাব, শর্মিষ্ঠা তার সহচরীদের নিয়ে আমার অনুগমন করবে। বৃষপর্বা নিজের সঙ্কট বুঝে এতে রাজী হয়ে গেলেন।

শুক্রাচার্য যযাতিকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করে বললেন, শর্মিষ্ঠাকে তুমি কখনও নিজের শয্যায় স্থান দিতে পারবে না। কিন্তু কিছুকাল পরে দেবযানীকে পুত্রবতী দেখে শর্মিষ্ঠা নির্জনে যযাতিকে তাঁর কামনার কথা জানিয়েছিলেন। দেবযানীর যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু অনু ও পুরু এই তিন পুত্র প্রসব করেন। এই কথা জানতে পেরে দেবযানী পিতৃগৃহে চলে যান এবং শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে শাপ দেন, তুমি জরাগ্রস্ত হও। যযাতি তাঁর পুত্রদের একে একে ডেকে নিজের জরা গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু সকলে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এতে সম্মত হলেন এবং যযাতি সপ্তদ্বীপের সম্রাট রূপে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। এক সময়ে এই স্ত্রৈণ রাজা আত্মবঞ্চনা বুঝতে পেরে দেবযানীর নিকটে নিজেদের আচরণের বর্ণনা দিলেন। তারপর পুরুকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজের জরা গ্রহণ করলেন। তিনি দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যদুকে দক্ষিণ দিকে, তুবর্শুকে পশ্চিম দিকে ও অনুকে উত্তর দিকে রাজা করলেন এবং পুরুকে ভূমণ্ডলের অধিপতি করে বনে গেলেন।

পুরু বংশ

শুক বললেন, এইবার পুরু বংশের কথা বলছি। পুরুর পুত্র জনমেজয়, তাঁর পুত্র প্রচিন্বান, তাঁর পুত্র প্রবীর, তাঁর পুত্র মনস্যু এবং তাঁর পুত্র চারুপদ। চারুপদের পুত্র সুদ্যু, তাঁর পুত্র বহুগব, তাঁর পুত্র সংযাতি, তাঁর পুত্র অহংযাতি এবং তাঁর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু কক্ষেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু কৃতেয়ু জলেয়ু সন্নতেয়ু ধর্মেয়ু সত্যেয়ু ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে দশটি পুত্র হয়। ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাবের সুমতি ধ্রুব ও অপ্রতিরথ নামে তিন পুত্র জন্মে। অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কণ্ব, মেধাতিথি তাঁর পুত্র। মেধাতিথি প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজাতি পুত্রের জন্ম দেন। সুমতির পুত্র রেভি ও রেভির পুত্র দুষ্মন্ত।

এক সময়ে দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? শকুন্তলা বললেন, আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা মেনকা আমাকে বনে ত্যাগ করে যান। ভগবান কণ্ব এই বৃত্তান্ত জানেন। ইচ্ছা করলে আপনি এখানে বাস করতে পারেন। দুষ্মন্ত বললেন, তুমি কুশিক বংশজাত রাজকন্যা, যোগ্য বর বরণ করতে পার। শকুন্তলা সম্মত হলে দুষ্মন্ত তাঁকে গন্ধর্ব বিধান অনুসারে বিবাহ করলেন এবং তাঁর গর্ভাধান করে নিজের পুরে ফিরে গেলেন।

যথাসময়ে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করলেন। বালক বয়সেই সে বনের সিংহের সঙ্গে খেলা করত। বিষ্ণুর অংশে জন্ম সেই বালককে নিয়ে শকুন্তলা স্বামীর নিকটে গেলে দুষ্মন্ত তাঁদের গ্রহণ করলেন না। তখন আকাশে দৈববাণী হল, পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর ও শকুন্তলাকে অবজ্ঞা কোরো না। এই পুত্রই পিতার মৃত্যুর পরে ভরত নামে সম্রাট হয়েছিলেন। ইনি তেত্রিশ শো অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে বিস্মিত করেছিলেন। দিগ্‌বিজয়ের সময় তিনি কিরাত হূণ যবন পৌণ্ড্র কঙ্ক

খশ শক ম্লেচ্ছ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী রাজাদের বধ করেছিলেন। তিনি সাতাশ হাজার বছর পৃথিবীর সকল দিকে সৈন্য চালনা করেছিলেন। ভরতের বিদর্ভদেশীয় পত্নী ছিল। ভরত তাঁদের পুত্রদের নিজের অনুরূপ না বলায় নিজেদের সতীত্বের প্রতি ভরতের সন্দেহ আছে ভেবে তাঁর পত্নীরা সন্তানদের জন্মের পরেই হত্যা করেছিলেন। বংশ রক্ষার জন্য ভরত মরুৎস্তোম যজ্ঞ করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে তাঁর পুত্ররূপে অর্পণ করেন। তিনি উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এঁরই নাম হয় বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু, তাঁর বৃহৎক্ষত্র জয় মহাবীর্য নর ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র হয়। নরের পুত্রের নাম সংকৃতি, তাঁর পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। রন্তিদেব শুধু জলপান করে আটচল্লিশ দিন কাটাবার পর যখন তিনি ভোজন করবেন, তখন একজন অতিথি ব্রাহ্মণ এসে তা ভক্ষণ করে যান। অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের সকলকে ভাগ করে দেবার পর যখন কিঞ্চিৎ আহার করবেন, তখন একজন শূদ্র অতিথি এলে তাকে অন্নের ভাগ দিলেন। এর পরে কুকুরদের নিয়ে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমরা ক্ষুধার্ত। রাজা সব কিছু তাদের দিয়ে যখন শুধু জলপান করতে যাবেন, তখন একজন চণ্ডাল এসে জল চাইল। রাজা তাঁর পানীয় জল চণ্ডালকে দিয়ে দিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারাই তাঁর ধৈর্য পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন।

মন্যুর অপর পুত্র গর্গের পুত্র শিনি, তাঁর পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মন্যুর অন্য পুত্র মহাবীর্যের পুত্রের নাম দুরিতক্ষয়। দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি কবি ও পুষ্করারুণি নামে পুত্র জন্মে। এঁরাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা। অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় হস্তীর পুত্র। অজমীঢ়ের বংশজাত প্রিয়মেধ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু, তাঁর পুত্র বৃহদ্ধনু, তাঁর পুত্র বৃহৎকায় এবং তাঁর পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তাঁর পুত্র সেনজিৎ এবং সেনজিতের রুচিরাশ্ব

দৃঢ়হনু কাশ্য ও বৎস নামে চার পুত্র। রুচিরাশ্বের পুত্র পার, তাঁর পুত্র পৃথুসেন। পারের অপর পুত্র নীপের একশো পুত্র হয়েছিল। শুকদেবের কন্যা কৃত্বীর গর্ভে নীপের ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। পত্নী সরস্বতীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তের বিষ্বকসেন নামে এক পুত্র জন্মেছিল। তাঁর পুত্র উদকসেন এবং উদকসেনের পুত্র ভল্লাট্ট। দ্বিমীঢ়ের পুত্রের নাম যবীনব, তাঁর পুত্র কৃতিমান্‌, তাঁর পুত্র সত্যধৃতি, তাঁর পুত্র দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি, তাঁর পুত্র সন্নতিমান, তার পুত্র কৃতী সামবেদের ছয়টি সংহিতা অধ্যাপনা করেছিলেন। কৃতীর পুত্র নীপ, তাঁর পুত্র ক্ষেম্য, তাঁর পুত্র সুবীর, সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয় এবং রিপুঞ্জয়ের পুত্র বসুরথ। হস্তীর পুত্র পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের পত্নী নলিনীর গর্ভে নীল নামে পুত্র হয়। নীলের পুত্র শান্তি, তাঁর পুত্র সুশান্তি, তাঁর পুত্র পুরুজ, তাঁর পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র ভর্মাশ্বের পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের নাম মুদ্গল যবীনর বৃহদ্‌বিশ্ব কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভর্ম্যাশ্ব বলেছিলেন, আমার এই পাঁচ পুত্র পাঁচটি দেশ রক্ষা করতে সক্ষম। এই জন্যই তাঁদের পঞ্চাল নাম হয়। মুদ্গল থেকেই মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ গোত্রের প্রবর্তন হয়। তাঁর দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দের জন্ম হয়েছিল। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তাঁর পুত্র শরদ্বান। উর্বশীকে দেখে শর গুচ্ছের উপর শরদ্বানের বীর্য স্খলিত হলে যমজ সন্তান জন্মে। রাজা শান্তনু কৃপা করে এঁদের নিয়ে আসেন বলে নাম হয় কৃপ ও কৃপী। কৃপী দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।

শুক বললেন, দিবোদাসের পুত্রের নাম মিত্রায়ু, তাঁর পুত্র চ্যবন, তাঁর পুত্র সুদাম, তাঁর পুত্র সহদেব, তাঁর পুত্র সোমক ও সোমকের একশো পুত্রের মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ। দ্রৌপদী তাঁর কন্যা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্র। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। এঁরা পাঞ্চাল নামে পরিচিত।

কুরু বংশ

অজমীঢ়ের অপর পুত্র ঋক্ষ, তাঁর পুত্র সংবরণ। সূর্যের কন্যা তপতীর গর্ভে সংবরণের কুরু নামে পুত্র হয়। কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ জহ্নু ও নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন ও তাঁর পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু। এঁর পুত্রদের নাম বৃহদ্রথ কুশাম্ব মৎস্য প্রত্যগ্র বেদিপ প্রভৃতি। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তাঁর পুত্র ঋষভ, তাঁর পুত্র সত্যহিত, তাঁর পুত্র পুষ্পবান ও তাঁর পুত্র জহ্নু। বৃহদ্রথের অন্য পত্নীর গর্ভে দুটি খণ্ড উৎপন্ন হলে তা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু জরা নামের রাক্ষসী খেলার ছলে তা জুড়ে 'জীবিত হও' বলতেই তা জোড়া লেগে বেঁচে ওঠে। বৃহদ্রথের এই পুত্রের নাম জরাসন্ধ। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তাঁর পুত্র সোমাপি, তাঁর পুত্র শ্রুতশ্রবা। পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান ছিলেন। জহ্নুর পুত্রের নাম সুরথ। তার পুত্র বিদূরথ, তাঁর পুত্র সার্বভৌম, তাঁর পুত্র জয়সেন, তাঁর পুত্র রাধিক, তাঁর পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাঁর পুত্র দেবাতিথি, তাঁর পুত্র ঋক্ষ, তাঁর পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। দেবাপি শান্তনু ও বাহ্লীক এই তিনজন প্রতীপের পুত্র। এদের মধ্যে দেবাপি রাজ্য ত্যাগ করে বনে যান। রাজা হন শান্তনু। পূর্বজন্মে তাঁর নাম ছিল মহাভিষ। তিনি কোন জরাগ্রস্তকে দু হাতে স্পর্শ করলে সে যৌবন লাভ করত। লোকে শান্তি লাভ করত বলেই তাঁর নাম শান্তনু হয়। তাঁর রাজ্যে বারো বছর বৃষ্টিপাত না হলে ব্রাহ্মণরা বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিলে এরকম হত না। এই কথায় শান্তনু বড় ভাইকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দেবাপিকে পাষণ্ড মত গ্রহণ করিয়েছিলেন। এতে তিনি বৈদিক মতের নিন্দা করেন। তিনি রাজত্ব গ্রহণ না করায় দেবতারা বৃষ্টিপাত করেন। দেবাপি এখনও যোগ অবলম্বন করে কলাপ গ্রামে বাস করছেন। কলিকালে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হলে সত্যযুগের আরম্ভে ইনিই ঐ বংশের প্রবর্তন করবেন।

বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত, তাঁর পুত্র ভূরি, তাঁর পুত্র ভূরিশ্রবা ও শল। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ভীষ্ম নামে পুত্র হয়। ইনি ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরম ভাগবত ছিলেন। দাস রাজের কন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদ ঐ নামেরই এক গন্ধর্বের হাতে নিহত হন। স্বয়ম্বর সভা থেকে সবলে আনীত কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্র-বীর্য বিবাহ করেন। কিন্তু পত্নীদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান। সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের। তিনি মাতার আজ্ঞায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীদের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দেন। গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রভৃতি একশো পুত্রের ও দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। পাণ্ডু মৃগয়াকালে মৃগরূপে মৈথুনরত এক মুনিকে বধ করার অভিশাপে মৈথুনে অক্ষম ছিলেন। তাই তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম.বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন এবং অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এই পাঁচ ভ্রাতার ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র শ্রুতসেন, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। এছাড়া যুধিষ্ঠিরের পত্নী পৌরবীর গর্ভে দেবক, ভীমের পত্নী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও অন্য পত্নী কালীর গর্ভে সর্বগতের জন্ম হয়। পর্বত কন্যা বিজয়ার গর্ভে সহদেবের সুহোত্র নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। করেনুমতীর গর্ভে নকুলের নরমিত্র নামে এক পুত্র হয়। নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান ও মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্রের জন্ম হয়। অর্জুনের পত্নী সুভদ্রার গর্ভে আপনার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয়েছে তাঁর পত্নী উত্তরার গর্ভে। আপনার পুত্র রূপে জনমেজয় শ্রুতসেন ভীমসেন ও উগ্রসেন বর্তমান। তক্ষকের দংশনে

আপনার মৃত্যু হলে জনমেজয় সর্প যজ্ঞের আগুনে সর্পদের আহুতি দেবেন। ইনি ভূমণ্ডল জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন।

জনমেজয়ের পুত্র শতানীক, তাঁর পুত্র সহস্রানীক, তাঁর পুত্র অশ্বমেধজ, তাঁর পুত্র অসীমকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র নেমিচক্রের রাজত্বকালে গঙ্গা হস্তিনীপুরী গ্রাস করলে ইনি কৌশাম্বীপুরীতে বাস করবেন। নেমিচক্রের পুত্র চিত্ররথ, তাঁর পুত্র শুচিরথ, তাঁর পুত্র বৃষ্টিমান, তাঁর পুত্র সুষেণ, তাঁর পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র নৃচক্ষু এবং তাঁর পুত্র সুখীনল। সুখীনলের পুত্র পরিপ্লব, তাঁর পুত্র সুনয়, তাঁর পুত্র মেধাবী, তাঁর পুত্র নৃপঞ্জয়, তাঁর পুত্র দুর্ব ও তাঁর পুত্র তিমি। তিমির পুত্র বৃহদ্রথ তাঁর পুত্র সুদাম, তাঁর পুত্র শতানীক, তাঁর পুত্র দুর্দমন ও তাঁর পুত্র মহীনর। মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি, তাঁর পুত্র নেমি ও তাঁর পুত্র ক্ষেমকের পরেই কলিযুগের অবসান হবে।

মগধের ভাবী রাজাদের কথাও বলছি। সহদেবের পুত্র মার্জারি, তাঁর পুত্র শ্রুতশ্রবা, তাঁর পুত্র অযুতায়ু ও তাঁর পুত্র নিরমিত্র। নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁর পুত্র বৃহৎসেন, তাঁর পুত্র কর্মজিৎ, তাঁর পুত্র সুতঞ্জয়, তাঁর পুত্র বিপ্র, ও তাঁর পুত্র শুচি। শুচির পুত্র ক্ষেম, তাঁর পুত্র সুব্রত, তাঁর পুত্র কর্মসূত্র, তাঁর পুত্র সম, তাঁর পুত্র দ্যুমৎ সেন, তাঁর পুত্র সুমতি ও তাঁর পুত্র সুবল, সুবলের পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র সত্যজিৎ, তাঁর পুত্র বিশ্বজিৎ ও তাঁর পুত্র রিপুঞ্জয়। এঁরা সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন।

অনু দ্রুহ্যু ও তুর্বসুর বংশ

শুক বললেন, অনুর পুত্র তিনজন। তাঁদের নাম সভানর চক্ষু ও পরেক্ষু। সভানরের পুত্র কালনর, তাঁর পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, তাঁর পুত্র মহাশাল, তাঁর পুত্র মহামনা, মহামনার দুই পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। শিবি বর কৃমি ও দক্ষ এই চারজন উশীনরের

পুত্র। শিবির পুত্র বৃষাদর্ভ সুবীর মদ্র ও কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তাঁর পুত্র হোম, তাঁর পুত্র সুতপা ও তাঁর পুত্র বলি। বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র ও ওড্র নামে ছয় জন রাজার জন্ম দেন। অঙ্গের পুত্র খলপান ও তাঁর পুত্র দিবিরথ। দিবিরথের পুত্র ধর্মরথ। তাঁর পুত্র চিত্ররথ রোমপাদ নামে নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর সখা রাজা দশরথ তাঁকে নিজের কন্যা শান্তাকে দান করেন। একবার তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হলে বারাঙ্গনারা হরিণীর গর্ভজাত মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে তপোবন থেকে রাজপুরীতে আনে। তিনি মরুৎ যজ্ঞ করে নিঃসন্তান রাজাকে সন্তান দান করেন। রাজা দশরথও এঁরই পুত্র যাগের ফলে চার পুত্র লাভ করেন।

রোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ, তাঁর পুত্র পৃথুলাঙ্গ, তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ বৃহৎকর্মা ও বৃহদভানু। বৃহদ্রথের পুত্র বৃহন্মনা এবং তাঁর পুত্র জয়দ্রথ। পত্নী সম্ভূতির গর্ভে জয়দ্রথের পুত্র বিজয়ের জন্ম। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তাঁর পুত্র ধৃতব্রত, তাঁর পুত্র সৎকর্মা এবং তাঁর পুত্র নিঃসন্তান অধিরথ গঙ্গাতীরে পেটিকায় পরিত্যক্ত কুন্তীর গর্ভজাত শিশুকে পেয়ে নিজের সন্তানের মতো পালন করেছিলেন। এঁরই নাম কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

দ্রুহ্যুর পুত্রের নাম বভ্রু, তাঁর পুত্র সেতু, তাঁর পুত্র আজ, তাঁর পুত্র গান্ধার, তাঁর পুত্র ধৃত, তাঁর পুত্র দুর্মদ এবং তাঁর পুত্র প্রচেতার একশো পুত্র উত্তরে ম্লেচ্ছদের রাজা হয়েছিলেন।

তুর্বসুর পুত্র বহ্নি, তাঁর পুত্র ভর্গ, তাঁর পুত্র ভানুমান, তাঁর পুত্র ত্রিভানু, তাঁর পুত্র করন্ধম, তাঁর পুত্র মরুও অপুত্রক ছিলেন বলে পুরুবংশের দুষ্যন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য লোভে পুনরায় পুরু বংশ আশ্রয় করেন।

যদুবংশ

এরপর যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশের কথা বলছি। যদুর সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু নল ও রিপু নামে চার পুত্র জন্মে। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, তাঁর তিন পুত্র মহাহয় বেণুহয় ও হৈহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, তাঁর পুত্র নেত্র, তাঁর পুত্র কুন্তি, তাঁর পুত্র মোহঞ্জি, তাঁর পুত্র মহিষ্মান ও তাঁর পুত্র ভদ্রসেন। দুর্মদ ও ধনক ভদ্রসেনের দুই পুত্র। ধনকের পুত্র কৃতবীর্য কৃষাগ্নি কৃতবর্মা ও কৃতৌজা। কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি অব্যাহত পরাক্রমে পঁচাশি হাজার বছর বিষয় ভোগ করেছিলেন। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পাঁচটি পুত্র বেঁচেছিল। তাঁদের নাম জয়ধ্বজ। শূরসেন বৃষভ মধু ও উর্জিত। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ, তাঁর একশো পুত্র। সগর রাজা এঁদের সংহার করেন। এঁদের জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র, তাঁর পুত্র মধু। মধুর একশো পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি জ্যেষ্ঠ। এঁদের নামেই মধুবংশ বৃষ্ণিবংশ ও যদুবংশ।

যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর বৃজিনবান নামে পুত্র জন্মে। তাঁর পুত্র স্বাহিত, তাঁর পুত্র চিত্ররথ, তার পুত্র শশবিন্দু সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন। তাঁর দশ হাজার পত্নী ও দশ লক্ষ সহস্র পুত্র। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। এঁদেরই একজন পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র উশনা একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচকের পুরুজিৎ রুক্ম রুক্মেষু পৃথু ও জ্যামঘ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। শৈব্যার পতি জ্যামঘ নিঃসন্তান হয়েও রাণীর ভয়ে অপর পত্নী গ্রহণ করেন নি। একবার শত্রু গৃহ থেকে ভোজ্যা নামে এক কন্যাকে হরণ করে আনলে তাঁকে রথের উপরে দেখেই শৈব্যা স্বামীকে বলেছিলেন, কে এই কন্যা? রাজা বলেছিলেন। এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ। শৈব্যা বলেছিলেন, আমি বন্ধ্যা, আমার কোনও সপত্নীও নেই। এই অবস্থায় এ আমার পুত্রবধূ হবে কেমন করে? রাজা বলেছিলেন, তোমার পুত্র হলে ইনি তার স্ত্রী হবেন। বিশ্বদেব ও

পিতৃগণ এই কথা অনুমোদন করলে শৈব্যা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রই বিদর্ভ নামে খ্যাত হয়েছিলেন এবং ঐ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম কুশ ক্রথ ও রোমপাদ। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, তাঁর পুত্র কৃতি, তাঁর পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি ও দমঘোষ প্রভৃতি। ক্রথের পুত্র কুন্তি, তাঁর পুত্র বৃষ্ণি, তাঁর পুত্র নির্বৃতি, তাঁর পুত্র দশাই, তাঁর পুত্র ব্যোম, তাঁর পুত্র জীমূত, তাঁর পুত্র বিকৃতি, তাঁর পুত্র ভীমরথ, তাঁর পুত্র নবরথ এবং তাঁর পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র শকুনি, তাঁর পুত্র করম্ভি, তাঁর পুত্র দেবরাত, তাঁর পুত্র দেবক্ষত্র। তাঁর পুত্র মধু ও কুরুবংশ, কুরুবংশের পুত্র অনু। অনুর পুত্র পুরুহোম, তাঁর পুত্র আয়ু, তাঁর পুত্র সাত্বত। সাত্বতের সাত পুত্র, তাঁদের নাম ভজমান ভজি দিব্য বৃষ্ণি দেবাবৃধ অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্নোচি কিঙ্কিণ ও ধৃষ্টি এবং অন্য পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দেববৃধের পুত্র বভ্রু। মহাভোজের বংশে ভোজদের উৎপত্তি। সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে বৃষ্ণির দুই পুত্র। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনামিত্র। অনামিত্রর পুত্র নিম্ন, তাঁর পুত্র সত্রাজিৎ ও প্রসেন। শিনির পুত্র সত্যক, তাঁর পুত্র যুযুধান, তাঁর পুত্র জয়, তাঁর পুত্র কুণি এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অপর পুত্র বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্ররথ নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্বফল্কের পত্নী গান্ধিনীর গর্ভে বারোটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের নাম অক্রূর আসঙ্গ সারমেয় মৃদুর মৃদুবিৎ গিরি ধর্মবৃদ্ধ সুকর্মা ক্ষত্রোপেক্ষ অরিমর্দন শত্রুঘ্ন ও গন্ধমাদ। তাঁদের ভগিনীর নাম সুচীরা। অক্রূরের দুই পুত্র দেবমান ও উপদেব। চিত্ররথের পুত্র পৃথু বিদূরথ প্রভৃতি। কুকুর ভজমান শুচি ও কম্বলবর্হিষ এই চারজন অন্ধকের পুত্র। কুকুরের পুত্র বহ্নি, তাঁর পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র কপোতরোমা তাঁর পুত্র অনু গন্ধর্ব তুম্বুরুর সখা ছিলেন। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, তাঁর পুত্র অবিদ্য ও তাঁর পুত্র পুনর্বসু। আহুক ও আহুকী পুনর্বসুর পুত্র ও কন্যা। আহুকের পুত্র দেবক ও

সেন। দেবকের চার পুত্রের নাম দেববান উপদেব সুদেব ও দেববর্ধন। তাঁদের সাত ভগিনীর নাম ধৃতদেবা শান্তদেবা উপদেবা শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা গৃহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সাতজনকেই বিবাহ করেছিলেন।

কংস সুনামা ন্যগ্রোধ কঙ্ক শঙ্কু সুহূ রাষ্ট্রপাল ধৃষ্টি ও তুষ্টি—এই নয়জন উগ্রসেনের পুত্র। তার পাঁচটি কন্যার নাম কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা। এঁরা বসুদেবের ছোট ভাইদের পত্নী ছিলেন। ভজমানের পুত্র বিদূরথ। তাঁর পুত্র শূর, তাঁর পুত্র ভজমান, তাঁর পুত্র শিনি, তাঁর পুত্র ভোজ ও হৃদীক। হৃদীকের পুত্র দেববাহু দেবমীঢ় শতধনু ও কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, মারীষা তাঁর পত্নীর নাম। এঁদের দশটি পুত্র বসুদেব দেবভাগ দেবশ্রবা আণক সৃঞ্জয় শ্যামক কঙ্ক শমীক বৎসক ও বৃক। বসুদেবকে আণক-দুন্দুভিও বলা হয়। পৃথা শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্তি শ্রুতশ্রবা ও রাজাধি-দেবী এই পাঁচজন বসুদেবদের ভগিনী। শূর তাঁর কন্যা পৃথাকে তাঁর অপুত্রক সখা কুন্তিকে সমর্পণ করেছিলেন। পৃথা দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করে দেবহূতি নামে এক বিদ্যা লাভ করেন। এই বিদ্যা পরীক্ষার জন্য তিনি সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন। সূর্য তাঁর গর্ভাধান করেছিলেন। তারপর সূর্যের মতো এক কুমার ভূমিষ্ঠ হলে লোকভয়ে ভীত কুন্তী তাকে জলে ত্যাগ করেছিলেন। পাণ্ডু এই কুন্তীকে বিবাহ করেন। বৃদ্ধসর্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, দন্তবক্র তাঁর সন্তান। ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেন, তাঁদের কেকয় নামে পরিচিত সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। রাজাধিদেবীর গর্ভে জয়সেনের বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র হয়। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেছিলেন, শিশুপাল তাঁদের পুত্র। কংসার গর্ভে দেবভাগের চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র হয়। কংসাবতীর গর্ভে দেবশ্রবার সুবীর ও ইষুমান নামে দুই পুত্র জন্মে। কঙ্কার গর্ভে কঙ্কের দুই পুত্র সত্যজিৎ ও পুরুজিতের জন্ম হয়। রাষ্ট্রপালীর গর্ভে

সঞ্জয়ের বৃষ দুর্মর্ষণ প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। শূরভূমির গর্ভে শ্যামকের পুত্র হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষর জন্ম হয়। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে বৎসকের বৃক প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। দুর্বাক্ষীর গর্ভে বৃকের তক্ষ পুষ্কর ও শাল প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। সুদামনীর গর্ভে শমীকের সুমিত্র অর্জুন ও পাল প্রভৃতি পুত্র জন্মে। কণিকার গর্ভে আণকের ঋতধাম ও অজয় নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবকীয়া সাত ভগিনী এবং পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ও ইলা বসুদেবের পত্নী। রোহিনীর গর্ভে বলদেব গদ সারণ দুর্মদ বিপুল ধ্রুব ও কৃত প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। পৌরবীর পুত্র সুভদ্র ভদ্রবাহু দুর্মদ ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি বারোটি পুত্র হয়। নন্দ উপনন্দ কৃতক ও শূর প্রভৃতি মদিরার পুত্র। কৌশল্যার কেশি নামে একটি পুত্র হয়। রোচনার গর্ভে হস্ত হেমাঙ্গদ প্রভৃতি এবং ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতির জন্ম হয়েছিল। ধৃতদেবার পুত্র বিপৃষ্ঠ, শান্তিদেবার পুত্র প্রশম প্রথিত প্রভৃতি, উপদেবার পুত্র রাজন্য কল্প বর্ষ প্রভৃতি, স্ত্রীদেবার পুত্র বসু হংস সংযশ প্রভৃতি ছয় জন। দেবরক্ষিতার গদ প্রভৃতি নটি পুত্র, সহদেবার প্রবর শ্রুতমুখ্য প্রভৃতি আটটি পুত্র এবং দেবকীর আটটি পুত্রের নাম কীর্তিমান সুষেণ ভদ্রসেন ঋজু সংমর্দন ভদ্র ও নগরাজ সঙ্কর্ষণ। হরি কৃষ্ণ রূপে তাঁদের অষ্টম পুত্র হয়েছিলেন। সুভদ্রা তাঁদের কন্যা। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে জন্মে মানুষের আকার ধারণ করেন, তিনি পৃথিবীর গুরুভার হরণ করে উদ্ধবকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দেন।

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত

দশম স্কন্ধ

পূর্বার্ধ

কৃষ্ণের জন্ম

সূত বললেন, পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কৃষ্ণ চরিত বলতে আরম্ভ করলেন। দৈত্য রাজাদের সেনার ভারে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর দুঃখের কথা শুনে ব্রহ্মা পৃথিবী ও দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গেলেন এবং জগন্নাথের স্তব করতে লাগলেন। সেই সময়ে তিনি আকাশবাণী শুনে দেবতাদের বললেন, ঈশ্বরেশ্বর পৃথিবীর সন্তাপের কথা জানেন। এই ভার হরণের জন্য তিনি যতকাল বিচরণ করবেন, ততকাল যেন দেবতারাও তাঁর পার্ষদ হয়ে থাকেন। তিনি ভগবান বসুদেবের গৃহে জন্ম নেবেন এবং তাঁর আগেই জন্ম নেবেন অনন্ত।

কয়েকদিন পর মথুরায় দেবকীকে বিবাহ করে বসুদেব নববধূকে নিয়ে রথে আরোহণ করলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস ভগিনীর স্নেহে রথের সারথি হলেন। এই সময়ে আকাশবাণী হল, যাকে তুমি পতিগৃহে নিয়ে যাচ্ছ, তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করবে। কংস এই কথা শুনেই খড়্গ হাতে নিয়ে ভগিনীকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তাই দেখে বসুদেব বললেন, মৃত্যু তো অনিবার্য! এই মৃত্যুর ভয়ে বিবাহের উৎসবে ভগিনীকে বধ করা সঙ্গত নয়। কিন্তু এই কথায় কংস নিবৃত্ত হলেন না দেখে বললেন, দেবকী তো তোমার ভয়ের কারণ নয়। তাঁর পুত্র জন্মাবামাত্র আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দেব। বসুদেবের এই কথায় কংস নিবৃত্ত হলেন।

যথা সময়ে দেবকীর পুত্র হল এবং বসুদেব মিথ্যাকে ভয় করতেন বলে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য প্রথম জাত পুত্র কীর্তিমানকে কংসের

হাতে অর্পণ করলেন। বসুদেবের সত্য নিষ্ঠা দেখে কংস বললেন, তোমাদের অষ্টম পুত্র থেকেই আমার মৃত্যুভয়, তাই এই বালক গৃহে ফিরে যাক। পুত্রকে নিয়ে বসুদেব গৃহে ফিরলেন।

একদিন নারদ এসে কংসকে বললেন, দৈত্য বিনাশ করে পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই দেবতারা এই উদ্যোগ করেছেন। এই কথা শুনে কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁদের পুত্র জন্মাবামাত্র বধ করতে লাগলেন। পূর্বে বিষ্ণু কালনেমি নামে যে অসুরকে বধ করেছিলেন, তাঁরই জন্ম হয়েছিল কংস নামে। তাঁর পিতা উগ্রসেন যদু ভোজ ও অন্ধকদের অধিপতি ছিলেন। কংস তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে নিজেই শূরসেন প্রভৃতি দেশ ভোগ করতে লাগলেন। প্রলম্ব বক চানুব তৃণাবর্ত অঘাসুর মুষ্টিক বৃষভানুর দ্বিবিদ পূতনা কেশী ধেনুক বাণ নরক প্রভৃতি অসুর রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ও মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে বলবান হয়ে যাদবদের সঙ্গে বিরোধ করতে লাগলেন এবং যাদবরা পীড়িত হয়ে নানা দেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করতে গেলেন। কেবল অক্রূর প্রভৃতি কয়েকজন চতুর ভাবে কংসকে বশীভূত করে মথুরাতেই বাস করতে লাগলেন।

এই ভাবে দেবকীর ছয়টি পুত্র নিহত হলে সপ্তম গর্ভে এলেন কৃষ্ণের অংশ সঙ্কর্ষণ। ভগবান যোগমায়াকে বললেন যে এই গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করতে হবে। যোগমায়া তাই করলেন। লোকে ভাবল যে কংসের ভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। এর পর তাঁর অষ্টম গর্ভ হলে কংস ভাবলেন যে গর্ভস্থ সন্তান বধে তাঁর যশ নষ্ট হবে এবং এই গর্ভপাতের সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত হলেন।

কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হলে স্বর্গে দুন্দুভি বাজল, কিন্নর ও গন্ধর্বরা গুণগান করলেন। এবং বিদ্যাধর ও অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন। দেবতা ও ঋষিরা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। অন্ধকার অর্ধরাতে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। বসুদেব শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুকে পুত্ররূপে জন্মাতে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

পিতা মাতার স্তব শোনবার পর ভগবান শিশুরূপ ধারণ করে বললেন, কংসের ভয় থাকলে আমাকে নন্দের গৃহে রেখে যশোদার কন্যারূপে জাত আমার মায়াকে এখানে আন। বসুদেব দেখলেন যে তাঁর পায়ের নিগড় খসে পড়েছে। তিনি একটি বস্ত্রাবৃত পেটিকায় পুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। জনমোহিনী মায়ায় দ্বারপাল ও পুরবাসীরা নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিল। কীলক ও শৃঙ্খলে বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। বাহিরে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। বসুদেবের মাথার উপরে ফণা তুলে চললেন অনন্ত। তরঙ্গায়িত যমুনা বসুদেবকে পথ প্রদান করলেন। বসুদেব পথ জানতেন না। দৈবের প্রভাবে নন্দের ভবনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন গোপরা নিদ্রামগ্ন। দ্বার উন্মুক্ত পেয়ে নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় শুইয়ে তাঁর কন্যাকে নিয়ে ফিরে এলেন। তার পর সেই কন্যাকে শয্যার উপরে রেখে পুনরায় নিগড় বদ্ধ হয়ে পড়ে রইলেন।

এইবারে বালিকা রোদন করতে আরম্ভ করতেই প্রহরীরা গিয়ে কংসকে সংবাদ দিল। এ কথা শুনেই তিনি অবিলম্বে সূতিকা গৃহে এলেন। তাঁকে দেখে দেবকী করুণ ভাবে বললেন, এই কন্যাকে বধ কোরো, না এ তোমার পুত্রবধূ হবে। তুমি তো আমার অনেক সন্তান বধ করেছ, এই কন্যাটি আমাকে দাও। কিন্তু কংস তাঁকে তিরস্কার করে সেই কন্যা দেবকীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিলেন এবং তার পা ধরে শিলার উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেই কন্যা অষ্টভূজা দেবী মূর্তি ধারণ করে আকাশ থেকে বললেন, পূর্বজন্মে যিনি তোমাকে বধ করেছেন, এজন্মেও তিনি তোমাকে বধ করবেন বলে আমি কিছু করলাম না। দেবকী ও তাঁর পতিকে আর বৃথা কষ্ট দিও না। দেবীর এই কথা শুনে বিস্ময়াপন্ন কংস দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে বললেন, এতদিন জানতাম যে মানুষই বোধহয় মিথ্যা বলে। কিন্তু এখন দেখছি যে দেবতারাও মিথ্যা বলে থাকেন। দৈববাণী বিশ্বাস করেই আমি ভগিনীর শিশুসন্তান বধ করেছি। আমি নিতান্তই

পাপিষ্ঠ। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। বলে তাঁদের পা ধরলেন।

দেবকী কংসকে ক্ষমা করলেন এবং সন্তানের জন্য শোকও পরিত্যাগ করলেন। রাত্রি অতিবাহিত হলে কংস তাঁর মন্ত্রী প্রলম্ব কেশী চানুর প্রভৃতিকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তাহলে আমরা পুর গ্রাম ও ব্রজ প্রভৃতি স্থানের দশদিন বা তার অধিক বয়স্ক সমস্ত শিশুকে আজই বিনাশ করব। দুর্মতি কংস মন্ত্রীদের কথায় ব্রহ্ম হিংসাকেই হিতজনক ভেবে সাধুলোকের পীড়নের জন্য দানবদের চারিদিকে পাঠালেন।

শুক বললেন, নন্দ পরমানন্দে পুত্রের জাতকর্ম করালেন। গোপরা বিবিধ উপায়ন নিয়ে নন্দের গৃহে আসতে লাগলেন। অপুত্রা যশোদার পুত্র জন্মেছে শুনে গোপীরা আনন্দ করতে লাগলেন। সূতিকায় এসে 'চিরজীবী হও' বলে বালককে আশীর্বাদ করলেন।

এর পরে নন্দ রাজধানীতে এসে কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করেছেন শুনে বসুদেব তাঁর নিকটে এসে বললেন, ভাই, তুমি অপুত্রক ছিলে এবং বৃদ্ধ বলে সন্তানের আশা ছিল না। তাই তোমার পুত্র হয়েছে জেনে আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে। ব্রজে আমার পুত্র তার মা রোহিণীর সঙ্গে কুশলে আছে তো? না, কংসের ভয়ে অন্য কোথাও গেছে? নন্দ বললেন, ব্রজের কুশল আর কী বলব! তোমার দুঃখেই আমরা দুঃখী। কংসের জন্য দেবকীর গর্ভজাত তোমার অনেক সন্তান নিহত হয়েছে, এবারে কন্যাটিও গেল। অদৃষ্টই সব। এর পর বসুদেব যা বলতে এসেছিলেন তাই বললেন, এখানে আর বেশিক্ষণ থেকো না, গোকুলে বিবিধ উৎপাত হচ্ছে। এই কথা শুনেই নন্দ গোপদের নিয়ে বৃষ যোজিত শকটে আরোহণ করে গোকুলে ফিরে গেলেন।

পূতনা বধ

শুক বললেন, বসুদেবের কথায় উৎপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে নন্দ গৃহে ফিরে গেলেন। ক্রূর স্বভাব পূতনা তখন নানা স্থানে ঘুরে শিশু হত্যা করছিল। একদিন সে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে গোকুলে প্রবেশ করল এবং সেই বালঘাতিনী রাক্ষসী নন্দের গৃহে কৃষ্ণকে শয্যায় দেখল। তখনই তাকে কোলে তুলে নিয়ে দুর্জয় বিষলিপ্ত স্তন পান করতে দিল। কৃষ্ণ তার স্তন প্রাণের সঙ্গে পান করতে শুরু করলে সে 'ছাড়ো ছাড়ো' বলে আর্তনাদ করে উঠল এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় মায়া ভুলে নিজ মূর্তিতে প্রাণত্যাগ করল। মৃত্যুর পূর্বে সে তার বিরাট দেহ নিয়ে লাফিয়ে গ্রামের বাইরে গিয়ে পড়েছিল। বালককে অপহৃত হতে দেখে যশোদা ও রোহিণী মূর্ছিত হয়েছিলেন। কিন্তু গোপীরা গিয়ে বিস্ময় ও হর্ষভরে দেখলেন যে কৃষ্ণ রাক্ষসীর বক্ষে অকুতোভয়ে ক্রীড়া করছেন। তাঁরা যথানিয়মে তাঁর রক্ষা বিধান করলেন। পূতনার দেহ দাহ করবার সময় ব্রজবাসীরা দেখলেন যে সুগন্ধ ধূম উত্থিত হচ্ছে। কৃষ্ণের স্পর্শে তার দেহ নিষ্পাপ হয়েছিল।

শকট ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত বধ

শুক বললেন, তিন মাস বয়সে উত্তানশায়ী বালকের তির্যগ ভাবে শয়নের সামর্থ্য হল। ঐ দিন জন্ম নক্ষত্র রোহিণী যোগ হওয়ায় পুরস্ত্রীরা নন্দের গৃহে সমবেত হলেন। নানাবিধ গীত বাদ্য ও মন্ত্র পাঠ করে বালকের অভিষেক করা হল। তারপর বেশভূষা করে খাইয়ে বালককে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি শকটের নিচে পালঙ্কে শোয়ানো হল। পুত্র যে এক সময় স্তনপানার্থী হয়ে রোদন করতে করতে পা সঞ্চালন করছিলেন, সমাগত ব্রজবাসীদের পরিচর্যারত যশোদা তা শুনতে বা দেখতে পান নি। সহসা ঐ শকট উল্টে গিয়ে তার উপরের পাত্রগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হল এবং শকটও

ভেঙে গেল। এই বিপর্যয় দেখে সবাই ব্যাকুল হয়ে ভাবলেন, কেমন করে এ রকম হল? সেখানকার বালকেরা বলল, এই শিশুর পাদ চালনায় শকট উল্টে গেছে। গোপদের একথা বিশ্বাস হল না। তাঁরা কোন দৈত্য বা দুষ্ট গ্রহের কর্ম মনে করে স্বস্ত্যয়ন করালেন।

বালক এক বৎসর বয়সে পদার্পণ করলে একদিন যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে যখন আদর করছিলেন, তখন সহসা তিনি তাঁর ভার গ্রহণে অসমর্থ হন এবং তাঁকে ভূমিতে নামিয়ে দেন। এমন সময় কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত নামে দৈত্য ঘূর্ণ বায়ুর মতো এসে ধূলায় গোকুল আচ্ছন্ন করে বালককে হরণ করে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না, এমন কি জনরবও শোনা যাচ্ছিল না। পুত্রকে দেখতে না পেয়ে যশোদা বিলাপ করতে লাগলেন। ধূলি বর্ষণের বেগ নিবৃত্ত হলে গোপীরা এসেও কৃষ্ণকে না দেখে রোদন করতে লাগলেন। এদিকে তৃণাবর্তের বেগও কৃষ্ণের ভারে শান্ত হল এবং সে দূরে যেতে পারল না। বালকেরা ভয়ে যেমন দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণও ঠিক তেমনি করে তৃণাবর্তের গলা ধরেছিলেন। তাতে সে হাত পা ক্ষেপণে অসমর্থ হল এবং তার নেত্রদ্বয় বহির্গত হল। অস্ফুট শব্দে প্রাণত্যাগ করে সে ব্রজেই উত্তানশায়ী হয়ে পতিত হল। যশোদারা দৈত্যকে আকাশ থেকে পড়তে দেখলেন। তার দেহ চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে কৃষ্ণ তার বক্ষে সুরক্ষিত আছেন।

গোপরাজ নন্দ মহাবনে বার বার এই রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ভাবলেন যে বসুদেব তাঁকে ঠিক কথাই বলেছিলেন। কৃষ্ণ মায়ের স্তন পানের পর হাই তুলতেই যশোদা তাঁর মুখের ভিতরে আকাশাদি দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে দু চোখ বন্ধ করলেন।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা

বসুদেবের কথায় তাঁর পুত্রদের নামকরণের জন্য যদু কুলের পুরোহিত গর্গ এসে উপস্থিত হলেন। নন্দ তাঁকে প্রণাম করে পুত্রদ্বয়ের সংস্কার কার্য সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করলেন। গর্গ বললেন, আমি যদু বংশীয়দের আচার্য। আমি তোমার পুত্রদের সংস্কার করলে পাপাত্মা কংস তাঁদের দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে। আপনার সঙ্গে বসুদেবের মিত্রতা কংস ভাল ভাবেই জানে। আমি সংস্কার করার জন্য যদি সে তোমার পুত্রের উপরে অত্যাচার করে তাহলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। নন্দ বললেন, আপনি এই গোশালায় একান্ত নির্জনে গোপনে দ্বিজাতির যোগ্য সংস্কার করুন। গর্গ তাই করলেন, বললেন যে রোহিণীর পুত্রের নাম হবে রাম বা সঙ্কর্ষণ এবং তোমার পুত্রের নাম কৃষ্ণ হবে।

এর পর কিছুকাল গত হলে রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন। অল্প কাল পরেই তাঁরা পায়ের উপরে ভর করে বিচরণ করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা ব্রজ বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। একদিন গোপীরা এসে যশোদাকে বললেন, তোমার ছেলে দুধ দুইবার আগেই বাছুর ছেড়ে দেয়, দই ননী চুরি করে খায়, বাঁদরকে দেয়, ভাঁড় ভাঙে, নানা উপায়ে শিকে থেকে জিনিস নামায়। ঘরের ভিতর মলমূত্রও ত্যাগ করে। অথচ তোমার সামনে কেমন সাধু সেজে বসে আছে। কিন্তু মা যশোদা তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন না।

একদিন বলরাম যশোদাকে বললেন, মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। মায়ের ভর্ৎসনা শুনে কৃষ্ণ বললেন. এরা মিথ্যা কথা বলছে। মা বললেন, মুখ হাঁ কর দেখি। একথা বলতেই কৃষ্ণ হাঁ করলেন। যশোদা সেই মুখের মধ্যে আবার আকাশাদি সমগ্র বিশ্ব দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন। ভাবলেন, এ কি স্বপ্ন, না ভগবানের মায়া?

না আমারই বুদ্ধির বিপর্যয়? সন্তানের কোন ঐশ্বর্য নয় তো! তারপরেই বৈষ্ণবী মায়ায় তিনি এ কথা ভুলে গেলেন।

একদিন যশোদা গান গাইতে গাইতে দই মন্থন করছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ এসে মন্থন দণ্ড হাতে নিয়ে তাঁকে নিবারণ করার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে স্তন্য পান করাতে লাগলেন। অন্য দিকে আগুনে দুধ উথলে পড়বার উপক্রম হলে পুত্রকে নামিয়ে সেদিকেই ছুটে গেলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে একটি শিলা খণ্ড দিয়ে দধি মন্থনের ভাণ্ড ভেঙে ফেলে ননী খেতে লাগলেন। ফিরে এসে পুত্রের এই কাণ্ড দেখে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন যে উদুখল উল্টে তার ওপরে চড়ে শিকের ননী তিনি বাঁদরদের দিচ্ছেন। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য একটা লাঠি নিয়ে আসতেই কৃষ্ণ পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যশোদা ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। উদুখলের সঙ্গে ছেলেকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে দেখেন যে দড়ি দু আঙুল ছোট। অন্য দড়ি জুড়েও দেখেন যে ছোট। এই ভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে তাঁকে উদুখলের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

যমলার্জুন উদ্ধার

এই ভাবে বেঁধে রেখে মা গৃহকাজে গেলে কৃষ্ণ পূর্বজন্মের দুই যক্ষকে দেখলেন যে তাঁরা অর্জুন নামে দুটি বৃক্ষের আকারে অবস্থিত। তাঁরা নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে ঐশ্বর্যশালী যক্ষ ছিলেন। দেবর্ষি নারদের শাপে তাঁদের এই অবস্থা হয়েছিল।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুক তাঁদের শাপের কথা বললেন, মহাদেবের অনুচর হয়ে কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব মদিরা পান করে কৈলাসে মন্দাকিনীর জলে অপ্সরাদের সঙ্গে জলবিহার করছিলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদকে দেখে অপ্সরারা শীঘ্র বস্ত্র পরিধান করল, কিন্তু যক্ষেরা বিবস্ত্র রয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁদের অনুগ্রহ করবার জন্য বললেন, ঐশ্বর্য যেমন বুদ্ধি ভ্রংশ

করে রজোগুণ তেমন পারে না। সম্পদের অভিমান সহজেই স্ত্রী দ্যূত ও মদ প্রভৃতি অধর্মে লিপ্ত করে।—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ॥ ১০।১০ ৮

এরা বৃক্ষ হোক এবং এদের পূর্ব স্মৃতি থাক। শত বৎসর পর বাসুদেবের স্পর্শে এরা আবার স্বর্গে ফিরবে। এঁরাই দুজন ব্রজ-মণ্ডলে যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মেছেন। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বৃক্ষ দুটির মাঝখানে যেতেই উদুখল উল্টে গেল। কৃষ্ণ তাঁর কটিতে আবদ্ধ উদুখলটি আকর্ষণ করতেই মূল উৎপাটিত হয়ে বৃক্ষদ্বয় ভূতলে পড়ল। দৈব পুরুষেরা কৃষ্ণের স্তব করে প্রস্থান করলেন।

যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ের পতনের শব্দে গোপরা এসে তার কারণ অনুসন্ধান করলেন। বালকেরা তা কৃষ্ণের কীর্তি বললে কেউ বিশ্বাস করলেন না। নন্দ তাঁকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন।

বৎসাসুর বকাসুর ও অঘাসুর বধ

মহাবনে পূতনা বধ যমলার্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাত দেখে নন্দ প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ গোপরা ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত হলে এক সভায় মিলিত হয়ে ব্রজের হিতের জন্য মন্ত্রণা করতে লাগলেন। উপনন্দ নামে জ্ঞানে ও বয়সে প্রবীণ এক গোপ বললেন, এখানে বালকদের ওপর বারবার নানা রকমের উৎপাত দেখা যাচ্ছে। কাজেই আমাদের অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। অরিষ্টাসুরের ভয়ে আমরা আমাদের প্রাচীন রাজধানী নন্দীশ্বর থেকে পালিয়ে এই মহাবনে এসেছি। তারই জন্য সেখানে এখনও ফেরা সম্ভব নয়। আর এই ব্রজ ভূমিও আমরা ছেড়ে যেতে চাই না। নন্দীশ্বর ও মহাবনের মধ্যবর্তী বৃন্দাবন নামে যে বন আছে, তা আমাদের সকলেরই বাসোপযোগী। চল, আজই আমরা সেখানে যাই। শকট যোজনা কর এবং গাভীদের আগে পাঠাও।

উপনন্দের এই কথায় সাধুবাদ দিয়ে সকলেই তাঁদের গাভী একত্র করে শকটের উপরে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে যাত্রা করলেন। বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা শকটে উঠলেন, গোধন রক্ষার জন্য হাতে শরাসন নিয়ে শৃঙ্গধ্বনি করে সঙ্গে চললেন গোপরা। রাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে যশোদা ও রোহিণী একই শকটে উঠলেন। এইভাবে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে তাঁরা বাসস্থান নির্মাণ করলেন। ক্রমে রাম ও কৃষ্ণ উপযুক্ত বয়সে বৎস পালক হয়ে উঠলেন। ক্রীড়ার নানা সামগ্রী নিয়ে তাঁরা গোপবালকদের সঙ্গে বৎসচারণ করতে লাগলেন।

একদিন যমুনার তীরে তাঁরা বৎসচারণ করছেন, এমন সময় এক দৈত্য এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণ বৎস রূপে বৎস যূথের মধ্যে প্রবেশ করে অসুরকে দেখে ইঙ্গিতে বলদেবকে জানিয়ে তার নিকটে গেলেন। তারপর তার পিছনের দুই পায়ের সঙ্গে লেজ ধরে তাকে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার প্রাণবায়ু বহির্গত হলে তাকে একটি কপিত্থ অর্থাৎ কদবেলের গাছের উপরে নিক্ষেপ করলেন। গাছের সঙ্গে সেই মহাকায় বৎসাসুর নিচে পড়লে বালকেরা বিস্মিত হল।

আর একদিন তাঁরা নন্দীশ্বর গিরির পূর্বদিকে বকস্থলের নিকটবর্তী জলাশয়ে জলপান করবার পর বকরূপ ধারী এক অসুরকে দেখতে পেলেন। বকাসুর নিকটে এসে কৃষ্ণকে গ্রাস করল। কিন্তু কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যে থেকে অগ্নির মতো দহন করতে থাকলে অসুর অবিলম্বে তাকে বমন করে ফেলল। তার পরই কৃষ্ণ তার দুই চঞ্চু ধরে অবলীলাক্রমে তাকে বিদারণ করে ফেললেন।

এর পর অঘাসুর বধের কথা। গোপবালকেরা নানা রকমের খেলা খেলছিলেন। তাই দেখে পূতনা ও বকাসুরের ছোট ভাই অঘাসুর ভাবলেন যে কৃষ্ণের সঙ্গে এদের সকলকে বিনাশ করে তার নহত ভাই-বোনের প্রেত তর্পণ করবে। এই ভেবে সে একটা বিরাট সর্পদেহ ধারণ করে তাদের গ্রাস করবার জন্য শুয়ে রইল। তার অধর মাটিতে ও ওষ্ঠ আকাশে এবং মুখগহ্বর গিরিগুহার মতো

অন্ধকার। বালকরা ভাবল, সাপের মুখ এত বড় হয় না। গর্তে নিশ্চয়ই কোন আশ্চর্য জিনিস আছে। এই ভেবে তারা অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অঘাসুর মুখ বন্ধ না করে পুতনা ও বকাসুর হত্যাকারী কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণও তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তার গলদেশে সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। তাতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে দুই চক্ষু বহির্গত হল এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণবায়ু নির্গত হল। কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে অঘাসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন।

ব্রহ্মমোহন কাহিনী

অঘাসুর বধের পর কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে যমুনা পুলিনে এসে বললেন, এসো, এখানেই আমরা আহার করি। এই বলে তাঁরা ভোজন করতে বসলে গোবৎসরা বনে প্রবেশ করল। বালকদের উদ্বেগ দেখে কৃষ্ণ বললেন, তোমরা খেতে থাকো, আমি বাছুরগুলো নিয়ে আসছি। বলে তাদের খুঁজতে গেলেন। এই অবসরে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা দেখবাব জন্য গোবৎস ও বালকদের অন্যত্র রেখে চোরের মতো অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণ বৎসদেরও দেখতে পেলেন না, বালকদেরও না। এ কাজ ব্রহ্মার বুঝতে পেরে নিজেকেই বৎস ও বালক রূপে রচনা করে বেণু বাজিয়ে ব্রজে প্রবেশ করলেন। যার যেখানে যাবার কথা সে সেখানেই গেল। এই ভাবে এক বৎসর কেটে গেল।

ব্রহ্মা নিজের ত্রুটিকাল অর্থাৎ পৃথিবীর এক বৎসর পর ফিরে এসে দেখলেন যে কৃষ্ণ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে আগের মতোই ক্রীড়া করছেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে যতগুলি বালক ও বৎস শয়ান আছে, ঠিক ততগুলি বালক ও বৎস এখনও বিরাজমান। কারা প্রকৃত ও কারা কৃষ্ণের সৃষ্ট তা বুঝতে পারলেন না। কৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া অপসারণ করলে ব্রহ্মা বহির্দৃষ্টি

লাভ করে হংস পৃষ্ঠ থেকে উঠে বিশ্বদর্শন করলেন। তিনি তাঁকে স্তব করে বললেন, আমার অহংকার দূর হয়েছে। আপনি অনুমতি দিলেই আমি ফিরে যাই। বলে প্রত্যাগমন করলেন।

শুক বললেন, ব্রহ্মা ফিরে যাবার পর কৃষ্ণ সবাইকে যমুনা পুলিনে নিয়ে এলেন। এক বৎসর অতীত হয়ে গেলে যোগমায়ায় মোহিত বালকেরা তাকে ক্ষণ কাল মনে করে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র বাছুরগুলো নিয়ে ফিরে এসেছ। তোমাকে ফেলে আমরা একটি গ্রাসও খাই নি। এসো, এবারে সবাই মিলে খাই। বাড়ি ফিরে তারা মায়েদের কাছে বলল, কৃষ্ণ আজ একটা প্রকাণ্ড সাপ মেরে আমাদের রক্ষা করেছে।

ধেনুকাসুর বধ

শুক বললেন, ছয় বৎসর বয়স হলে তাঁরা পশুপালনের কাজ পেলেন। কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বয়স্য পরিবৃত হয়ে বেণু বাজিয়ে গাভীদের নিয়ে বনে প্রবেশ করলেন। শ্রীদাম সুবল ও স্তোক কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপরা বললেন, এই গোবর্ধন পর্বতের অনতিদূরে তালগাছের এক বন আছে। সেখানে অনেক তাল পড়ছে ও পড়ে আছে। কিন্তু সবই দুরাত্মা ধেনুকাসুরের করায়ত্ত। গর্দভ রূপধারী সেই অসুর তাঁর জ্ঞাতিদের নিয়ে সেখানে থাকে। সেই তালের গন্ধে আমাদের লোভ হচ্ছে, একটা কিছু কর। এই কথা শুনে সকলে মিলে সেই তালবনে গেলেন এবং বনে প্রবেশ করে বলরাম দু হাতে গাছ ঝাঁকিয়ে তাল পাড়তে লাগলেন। তাল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভের আকৃতি ধেনুকাসুর ছুটে এসে পিছনের দুই পা দিয়ে বলরামের বুকে আঘাত করল। পুনরায় পদাঘাতের জন্য পিছনের দুই পা তুলতেই বলরাম তার পা ধরে চারি দিকে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার প্রাণ বিয়োগ হলে দেহটা তালগাছের উপরের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই দেহের আঘাতে একটা তাল গাছ ভেঙে পড়ল, তার

আঘাতে আর একটা এবং এমনি ভাবে আরও গাছ ভেঙে পড়তে লাগল।

ধেনুক বধের পর তার জ্ঞাতিরা ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সগর্জনে কৃষ্ণ ও বলরামের দিকে ধাবিত হল। তাঁরা তীর বেগে সেই অসুরদের পিছনের পা ধরে অবলীলাক্রমে তাল গাছের উপরের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অসুরদের মৃতদেহে ভূমি আচ্ছন্ন হল। ধেনুকাসুর নিহত হয়েছে জেনে পুলিন্দ জাতের লোকেরা নির্ভয়ে তাল ফল খেতে লাগল। কৃষ্ণ বলরাম বয়স্যদের সঙ্গে ব্রজে ফিরে এলে গোপীরা তাঁদের সম্বর্ধনা করলেন।

কালিয়দমন

একবার নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্য বয়স্যে পরিবৃত হয়ে গোচারণ করতে করতে যমুনার কূলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আতপে পীড়িত গাভী ও গোপরা যমুনার জল পান করে বিগতপ্রাণ হল। কৃষ্ণ তাঁর অমৃতবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের জীবিত ও সুস্থ করলেন।

শুক বললেন, কালিয়র বিষে যমুনার জল দূষিত হয়েছে দেখে কৃষ্ণ তাকে সেখান থেকে তাড়িয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ বললেন, কালিয় কেন সেখানে বাস করত এবং কৃষ্ণ কী ভাবে তাকে নিগৃহীত করলেন সেই কথা বলুন। শুক বললেন, যমুনায় কালিয় নাগের বিষাগ্নিতে পূর্ণ এক হ্রদ ছিল। বিষে সেই জল এমনই উত্তপ্ত ছিল যে তার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাবার সময় বিষের প্রভাবে নিচে পড়ত। আর তীরের বৃক্ষ ও প্রাণীও বাতাসের স্পর্শে প্রাণত্যাগ করত। এই কালিয়কে তাড়ানো কর্তব্য মনে করে কৃষ্ণ তাঁর কটিবসন বেঁধে এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করে সেই বিষাক্ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই শব্দ পেয়ে কালিয় এসে কৃষ্ণের মর্ম স্থানে দংশন করে তাঁকে বেষ্টন করল। তাই দেখে গোপরা কাঁদতে লাগলেন। ব্রজে নানা রকম উৎপাত দেখে নন্দ প্রভৃতি গোপ ও গোপীরা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে

যমুনার তীরে এলেন। এসেই কালিয় হ্রদে সর্প বেষ্টিত কৃষ্ণকে নিশ্চেষ্ট দেখে মূর্ছা গেলেন। মোহের উপশম হলে নন্দ প্রভৃতি গোপরা হ্রদের জলে নামতে উদ্যত হলে বলরাম বাধা দিয়ে বললেন, আপনারা ধৈর্য ধরুন। এর পরেই কৃষ্ণ কালিয়র বন্ধন থেকে উত্থিত হলেন এবং কালিয় কুপিত হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করল। কালিয়র ফণা থেকে আগুনের' মতো বিষ নিঃসৃত হচ্ছিল এবং কৃষ্ণ গরুড়ের মতো তাকে বেষ্টন করে ঘুরতে লাগলেন। এই ভাবে পরিভ্রমণে হতবল কালিয়র উন্নত ফণা এক হাতে অবনত করে কৃষ্ণ তার মস্তকে আরোহণ করে নৃত্য করতে লাগলেন। কালিয় রক্ত বমি করে মোহগ্রস্ত হল। সে তার সহস্র ফণার যেটি উন্নত করল, কৃষ্ণ তারই উপরে নৃত্য করে পদাঘাতে তা অবনত করলেন। এই ভাবে সহস্র মুখে রক্ত বমি করে কালিয় পরম পুরুষের শরণাপন্ন হল। তার পত্নীরা শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণের নিকটে এসে তাঁর স্তুতি করে বলল, আপনি নাগরাজের যে দণ্ড বিধান করলেন তা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, কিন্তু আমরা কী করব বলুন। এই কথা শুনেই কৃষ্ণ কালিয়র মাথার উপর থেকে নেমে পড়লেন। সংজ্ঞা লাভ করে কালিয় বলল, আমরা জন্মাবধি খল ও ক্রোধী স্বভাবের, কিন্তু এর জন্য দোষ তো আমাদের নয়। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন। কালিয়র এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, তোমার বিষে এই নদীর জল অব্যবহার্য হয়েছে। তাই তোমার পরিবারবর্গকে নিয়ে এই স্থান তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। গরুড়ের ভয়ে তুমি যে রমণক দ্বীপ ত্যাগ করে এসেছ, সেখানেই তুমি ফিরে যাও। গরুড় তোমাকে ভক্ষণ করবে না। কালিয় ও তার পত্নীরা কৃষ্ণের পূজা করে সবান্ধবে রমণক নামে সমুদ্র দ্বীপে চলে গেল।

পরীক্ষিৎ বললেন, কালিয় রমণক দ্বীপ কেন পরিত্যাগ করে এসেছিল? শুক বললেন, পুরাকালে সেই রমণক দ্বীপ নাগদের অধিকারে ছিল। নাগরা অনিয়মিত ভাবে মানুষ ভক্ষণ করত বলে

তাদের উপদ্রব নিবারণের জন্য মানুষরা প্রতি মাসে অশ্বত্থ গাছের নিচে নাগদের খাদ্য রাখত। নাগরাও তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রতি পঞ্চদশীতে এই খাদ্যের ভাগ গরুড়কে দিত। কিন্তু এই কালিয় গরুড়কে গণ্য না করে নিজেই সমস্ত বলি ভোজন করত। এই কথা জেনে গরুড় এসে উপস্থিত হলে কালিয় তাকে আক্রমণ করে এবং গরুড়ের পাখায় আহত হয়ে কালিয় এই কালিন্দীর হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল। গরুড় এই হ্রদে আসতে পারে না। তার কারণ এখানে মাছ ধরতে এলে সৌভরি মুনি তাকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে একটি বড় মাছ হরণ করলে মাছদের দুঃখ দেখে মুনি শাপ দিয়েছিলেন যে এর পর গরুড় এখানে এলে তার মৃত্যু হবে। কালিয় এই সাপের কথা জানত।

কৃষ্ণ যমুনার জল থেকে উঠে এলে সবাই তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সেই রাত্রে তাঁরা যমুনার তীরে বাস করলেন। নিশীথ রাতে শুষ্ক অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠল। সেই দাবাগ্নি নিদ্রিত ব্রজবাসীদের চারিদিক থেকে দগ্ধ করবার উপক্রম করলে তাঁরা ব্যাকুল চিত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। কৃষ্ণ সেই ভীষণ দাবানল পান করলেন।

প্রলম্বাসুর বিনাশ

এর পর গ্রীষ্ম এলেও তা বসন্ত ঋতুর মতো মনে হতে লাগল। রাম ও কৃষ্ণ গোপদের সঙ্গে গোচারণ করতে লাগলেন। এমন সময় প্রলম্ব নামে এক অসুর রাম ও কৃষ্ণকে হরণ করবার জন্য গোপের রূপ ধারণ করে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণ বললেন, আজ আমরা দুই দল হয়ে খেলব। এই কথা শুনেই গোপরা রাম ও কৃষ্ণকে দলপতি করে দুই দলে ভাগ হয়ে গেলেন এবং পরাজিত গোপ জয়ী গোপকে কাঁধে করে বহন করতে লাগলেন। এই ভাবে তাঁরা ভাণ্ডীর বটের নিকট উপস্থিত হলেন। বলদেবের পক্ষে শ্রীদাম ও বৃষভ প্রভৃতি জয়ী হলে

কৃষ্ণ ও তাঁর দলের গোপরা তাদের বইতে লাগলেন। কৃষ্ণ শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব বলদেবকে বহন করছিলেন। কৃষ্ণকে দূরে রাখবার জন্য প্রলম্ব বৃন্দাবনের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং বলদেবের গুরুভারে পীড়িত হয়ে সে ভীষণ দর্শন অসুর মূর্তি ধারণ করল। বলদেব তার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তার মস্তকে এমন মুষ্ট্যাঘাত করলেন যে সে রক্ত বমন করতে করতে বিগতপ্রাণ হয়ে ভীষণ শব্দে বজ্রাহত গিরির মতো ভূতলে পতিত হল। গোপরা বলদেবকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়ে তাঁকে সাধুবাদ করে আলিঙ্গন করলেন।

বৃন্দাবনে ঋতু পরিবর্তন ও বস্ত্রহরণ লীলা

শুকদেব বললেন, একবার গোপরা খেলায় মেতে উঠলে গাভীরা তৃণলোভে দুর্গম বনে প্রবেশ করল। তাদের দেখতে না পেয়ে সবাই হায় হায় করতে লাগলেন। পশুই গোপদের জীবিকা, তাই তাঁরা অনেক অনুসন্ধানের পর শ্রান্ত ও তৃষিত হয়ে পথভ্রষ্ট গোধন শরবনে দেখতে পেলেন। গাভীদের একত্র করে যখন তাঁরা বন থেকে বেরোবেন, তখন অকস্মাৎ চারিদিক থেকে দাবানল ঘিরে ফেলল। সভয়ে গোপরা বললেন, কৃষ্ণ, এই বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা কর। কৃষ্ণ বললেন, তোমরা ভয় পেও না, চোখ বন্ধ কর। গোপরা চোখ বন্ধ করতেই কৃষ্ণ সেই দাবানল পান করে বললেন, এইবারে চোখ খোলো। তাঁরা চোখ মেলে নিজেদের দাবাগ্নিমুক্ত দেখে বিস্মিত হলেন।

গোপরা গৃহে ফিরে বলরামের প্রলম্বাসুর বধের কথা এবং কৃষ্ণের দাবানল পানের কথা মায়েদের বললেন। এইভাবে গ্রীষ্মকাল গিয়ে বর্ষা এল। কার্তিক থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সূর্য তাঁর রশ্মি দিয়ে পৃথিবীর যত জল পান করেছিলেন, তা সেচন করতে আরম্ভ করলেন। তারপর মেঘশূন্য শরৎকাল সমাগত হল। পক্ক শস্যে পৃথিবী অপরূপ শোভা ধারণ করল। কৃষ্ণ বলরাম ও গোপদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গোচারণে বেরিয়ে বেণুধ্বনি করতে লাগলেন। এই ধ্বনি শুনে

ব্রজস্ত্রীরা পরোক্ষে নিজেদের সখীদের নিকটে তার বর্ণনা করতে লাগলেন।

হেমন্তের প্রথম মাসে ব্রজের কুমারীরা হবিষ্য করে কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ করলেন। অরুণোদয়ের সময় তাঁরা স্নান করে যমুনার তীরে বালির প্রতিমা স্থাপন করে নানা উপচার দিয়ে কাত্যায়নী পূজা করতে লাগলেন। তাঁদের জপের মন্ত্র—নন্দ গোপের পুত্রকে আমার পতি করুন। কৃষ্ণে আসক্ত কুমারীরা এক মাস ধরে এই সংকল্প নিয়ে ভদ্রকালীর অর্চনা করলেন। তাঁরা ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে সবাইকে ডাকাডাকি করে তুলে হাত ধরাধরি করে যমুনায় স্নান করতে যাবার সময় কৃষ্ণের গুণগান করতেন। অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় এই ব্রত পূর্ণ হবার দিন যমুনার তীরে এসে অন্য দিনের মতো তীরে বসন রেখে তাঁরা কৃষ্ণের নাম গান করে জলক্রীড়া করছিলেন। তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরে কৃষ্ণ তাঁর বয়স্যদের নিয়ে সেখানে এলেন এবং সত্বর সেই বসন নিয়ে একটি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করে বললেন, তোমরা এইখানে এসে তোমাদের বসন নাও। এই কথা শুনে তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন, তুমি যাও। কিন্তু কেউই গেলেন না। কুমারীরা ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে বলতে লাগলেন, এমন অন্যায্য কাজ কোরো না। শীতে আমরা কাঁপছি, আমাদের বস্ত্র দিয়ে দাও। আমরা তোমার দাসী, যা বলবে তাই করব। আমাদের বস্ত্র ফেরত দাও, নইলে আমরা রাজাকে বলব। কৃষ্ণ বললেন, তোমরা যদি আমার দাসী হও তো এখানে এসে তোমাদের কাপড় নাও। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার আর কী করবেন! শীতার্ত কন্যারা দু হাতে লজ্জা নিবারণ করে জল থেকে উঠে এলেন। কৃষ্ণ তাঁদের দেখে সহাস্যে বললেন, ব্রতের সময়ে বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমে তোমরা দেবতাকে অবহেলা করেছ, এইবারে মাথার উপরে অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম করে তোমাদের অধো বসন নাও। বিবস্ত্র স্নানকে ব্রতভঙ্গের কারণ মনে করে ব্রজবালারা কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। তাদের অবনত

দেখে কৃষ্ণ সমস্ত বসন প্রত্যর্পণ করলেন। বললেন, আমার প্রতি আসক্তি কাম ভোগের জন্য নয়। এখন তোমরা ব্রজে যাও, শারদ রাতে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করবে।

দ্বিজপত্নী সংবাদ

এর পর নিদাঘের সময় কৃষ্ণ বলরাম ও গোপ পরিবৃত হয়ে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে এলেন। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষরাজি দেখে কৃষ্ণ বললেন, এরা পরোপকারের জন্য জন্মেছে, এদের জন্ম সার্থক। যমুনায় জল পান করে গোপরা বললেন, আমাদের ক্ষুধার শান্তি কর। কৃষ্ণ বললেন, ব্রাহ্মণরা আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞ করছেন, তোমরা সেখানে গিয়ে আমাদের নাম করে অন্ন যাজ্ঞা কর। গোপরা যজ্ঞস্থলে গিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বললেন, গোচারণ করে ক্ষুধার্ত হয়ে রাম ও কৃষ্ণ আপনাদের নিকটে অন্ন চেয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণের যাজ্ঞা শুনেও শুনলেন না। তাঁরা হাঁ না কিছুই বললেন না দেখে গোপরা নিরাশ হয়ে ফিরে কৃষ্ণকে সব জানালেন। কৃষ্ণ হেসে বললেন, তোমরা আবার গিয়ে দ্বিজপত্নীদের বল, কিছু চেয়ো না। তাঁরা নিজেরাই দেবেন। গোপরা পত্নী-শালায় গিয়ে দ্বিজপত্নীদের প্রণাম করে বললেন, কৃষ্ণ আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা ব্রজ থেকে দূরে এসে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণের লীলার কথা তাঁরা আগেই শুনেছিলেন এবং তাঁকে দেখবার জন্য তাঁরা উৎসুক ছিলেন। তিনি এখন নিকটে এসেছেন শুনে তাঁরা আনন্দিত হলেন। তাঁরা বহু ভোজন পাত্রে চতুর্বিধ অন্ন নিয়ে পতি ভ্রাতা ও বন্ধুদের নিষেধ অমান্য করে কৃষ্ণের কাছে এলেন। কৃষ্ণ বললেন, আপনারা আমার কাছে এসেছেন, কিন্তু আমি আপনাদের কোন প্রত্যুপকার করতে পারব না। আপনাদের কাছে আমি ঋণীই রইলাম। পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ, তাঁর চেয়ে

আর কে প্রিয় হতে পারে। আপনাদের পতি ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য ধর্ম পরায়ণ, তাঁরা আপনাদের সঙ্গে একত্র হয়ে যজ্ঞ সমাপ্ত করবেন। দ্বিজপত্নীরা বললেন, আমরা তাঁদের নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন করে আপনার কাছে এসেছি। তাঁরা আর আমাদের গ্রহণ করবেন না। কৃষ্ণ বললেন, আপনারা ফিরে যান। আমি বলছি যে তাঁরা আপনাদের দোষ দেবেন না। কৃষ্ণের এই কথা শুনে তাঁরা যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গে একত্র হয়ে যজ্ঞ সমাপন করলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে যেতে দেন নি। তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছিলেন বলে ব্রাহ্মণরা অনুতাপ করতে লাগলেন।

ইন্দ্রযাগ ভঙ্গ

শুকদেব বললেন, কৃষ্ণ গোপদের ইন্দ্রযাগের জন্য উদ্যোগ দেখতে পেয়ে বিনয়াবনত হয়ে নন্দ প্রভৃতি গোপদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ কোন্ দেবতার উদ্দেশে এবং এর ফল কী? এ শাস্ত্র বিহিত, না লৌকিক প্রথা মাত্র? না বুঝে কোন কাজ করলে তা সিদ্ধ হয় না। আপনারা কি এ বিষয়ে বিচার করেছেন? উদাসীন ব্যক্তিই শত্রু এবং সুহৃদরা আত্মবৎ। তাই মন্ত্রণার জন্য তাদের পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কাজেই আমার এই কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। নন্দ বললেন, ইন্দ্র বর্ষার দেবতা, মেঘ তাঁর প্রিয় মূর্তি। মেঘ থেকে ত্রিবর্গের ফল পাওয়া যায় বলে আমরা তাঁর অর্চনা করি। যারা কাম লোভ ভয় বা বিদ্বেষের জন্য পরম্পরাগত ধর্ম বিসর্জন দেয়, তাদের মঙ্গল হয় না।—

য এবং বিসৃজেদ্ধর্মং পারম্পর্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্ দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥ ১০।২৪।১১

কৃষ্ণ এই কথা শুনে ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করবার জন্য বললেন, কর্মেই

জীবের জন্ম এবং কর্মেই তার বিলয়। কর্মের দ্বারাই লাভ হয় সুখ দুঃখ ভয় ও ক্ষেম।—

কর্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ১০।২৪।১৩

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎ সৃজতি কর্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১০।২৪।১৭

কর্মের দ্বারাই জীব উচ্চ নীচ দেহ ধারণ করে ও তা ত্যাগ করে। কর্মেই তারা শত্রু মিত্র বা উদাসীন হয়। কর্মই গুরু, ঈশ্বরও কর্ম। যার কৃপায় জীব জীবিকার্জন করে, তার নিকট সে-ই দেবতা। আমাদের বৃত্তি গো পালন, কাজেই গরুই আমাদের কাছে দেবতার মতো পূজ্য। মেঘ রজোগুণেই চালিত হয়ে বারি বর্ষণ করে। ইন্দ্র কী করতে পারেন! আমাদের কোন দেশ নেই, গৃহ পর্যন্ত নেই। আমরা বনে ও পর্বতে বাস করি। গাভী আমাদের জীবিকার উপায়, গোবর্ধন পর্বত তাদের তৃণ ও জল দেয়। কাজেই ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য যে সব দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে, তা দিয়ে তাদের পূজা বা যাগ করুন। নন্দ প্রভৃতি গোপরা কৃষ্ণের কথা মেনে নিয়ে ইন্দ্র যাগের দ্রব্য দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করে গোবর্ধন পর্বত প্রদক্ষিণ করলেন।

নিজেব পূজা বন্ধ হবার জন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর আদেশে বন্ধন মুক্ত মেঘ প্রবল বারি বর্ষণ করে ব্রজধাম বিপর্যস্ত করল। গোপরা পশুদের নিয়ে কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণ তাঁদেব আশ্বাস দিয়ে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মতো ধারণ করে বললেন, আপনারা সকলে এর নিচে আশ্রয় নিন। গোপরা গোধন নিয়ে সপ্তাহ কাল পাহাড়ের নিচে রইলেন এবং আকাশ মেঘশূন্য হবার পর কৃষ্ণের কথায় বেরিয়ে এসে তাঁকে আদর ও আশীর্বাদ করলেন।

সাত বৎসরের বালককে এই ভাবে পর্বত ধারণ করে থাকতে

দেখে বিস্মিত গোপরা নন্দকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এই সঙ্গে পূর্বের ঘটনাবলীও স্মরণ করিয়ে দিলেন। এর উত্তরে নন্দ বললেন, গর্গ আমাকে বলেছেন যে এই বালকের অন্য যুগে শুক্ল রক্ত ও পীত বর্ণ ছিল, দ্বাপরে কৃষ্ণ বর্ণ হয়েছে বলেই এর কৃষ্ণ নাম। কোন সময় বসুদেবের পুত্র ছিল বলে নাম বাসুদেব হবে। ইনি সমস্ত ব্রজবাসীর ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করবেন। এখন আমি কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলে মনে করছি।

শুকদেব বললেন, গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণ ব্রজ রক্ষা করলে গোলক থেকে ইন্দ্র ও সুরভি কৃষ্ণের নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, আমি আপনার মাহাত্ম্য জানতাম না বলেই অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। কৃষ্ণ বললেন, আপনি দেবরাজ বলে অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিলেন, তাই আপনার যজ্ঞ বন্ধ করেছি। আমি যে দণ্ড ধারণ করে আছি, ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হয়ে থাকলে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই যাকে আমি অনুগ্রহ করতে চাই, তাকে আগেই সম্পদ ভ্রষ্ট করি।—

মামৈশ্বর্য শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।

তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্‌॥ ১০।২৭।১৬

সুরভি কৃষ্ণকে গো ধনের ইন্দ্র রূপে অভিষেক করলেন। তাঁর নাম হল গোবিন্দ।

কৃষ্ণ বরুণ সাক্ষাৎকার

শুক বললেন, একবার নন্দ একাদশীতে উপবাস করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই যমুনায় স্নান করতে নেমেছিলেন। কোন অসুর আসুরীবেলা অনাদর করে নিশীথে জলে নেমেছে ভেবে বরুণের এক ভৃত্য তাঁকে বরুণের নিকটে নিয়ে গেল। নন্দের রক্ষকরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল। কৃষ্ণ এই ডাক

শুনে জলে লাফিয়ে পড়ে বরুণের নিকটে উপস্থিত হলেন। বরুণ তাঁর স্তব করে নন্দকে ফিরিয়ে দিলেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই কৃষ্ণ তাঁর পিতাকে নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন।

রাসলীলা

শুক বললেন, শরতের এক রাতে উৎফুল্ল মল্লিকা দেখে কৃষ্ণের ক্রীড়ার বাসনা হল। আকাশে চাঁদ উঠল। কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করলেন। সেই অনঙ্গবর্ধন গীত শুনে ব্রজ স্ত্রীরা গৃহের সমস্ত কাজ ফেলে সেখানে ছুটে এলেন। তাঁদের পিতা পতি ভ্রাতা ও বন্ধুরা বারণ করেও তাঁদের বিরত করতে পারলেন না। যাঁরা কোন রূপেই বহির্গত হতে পারলেন না, তাঁরা দু চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণ-ভাবনায় নিমগ্ন হলেন। গোপীদের দেখে কৃষ্ণ বললেন, তোমরা কেন এখানে এসেছ বল। ব্রজের কুশল তো? এখন ঘোর রাত্রি। এই সময়ে স্ত্রীলোকের এই বনে থাকা উচিত নয়। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের পতি পুত্র বা পিতারা তোমাদের দেখতে না পেয়ে নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা এখানে এসে যদি তোমাদের আমার সঙ্গে দেখতে পান তো আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। এই কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছে। তোমরা তো বনের শোভা দেখলে, এই বারে ফিরে যাও। দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগী নির্ধন ও অপাতকী পতিকে স্ত্রীদের কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়।—

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপস্সুভির পাতকী॥ ১০।২৯।২৫

কৃষ্ণের এই কথা শুনে গোপীরা বিষণ্ণ হয়ে বললেন, আমাদের উপরে এত নিষ্ঠুর হয়ো না। পতিকে আমরা ত্যাগ করে এসেছি, তুমি আমাদের পরিত্যাগ কোরো না। তোমার ধর্মের উপদেশ তোমারই থাক। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও এতকাল

আমাদের যে চিত্ত গৃহ কাজে নিবিষ্ট ছিল, তুমি তা অপহরণ করেছ। আমাদের পা আর নড়ছে না, ব্রজে আমরা আর ফিরে যেতে পারব না। তোমার অধরামৃতে আমাদের কামনার অগ্নি উপশম কর, নচেৎ আমরা তোমার বিরহের আগুনে পুড়ে ধ্যানে তোমাকে পাবার চেষ্টা করব। গোপীদের এই কথা শুনে কৃষ্ণ নিজেই বিহারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের সঙ্গে গান করে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলে গোপীরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে সন্তাপ করতে লাগলেন। তাঁরা মিলিত হয়ে কৃষ্ণের গান করতে করতে উন্মত্তের মতো বনে বনান্তরে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কখনও তাঁরা কৃষ্ণের লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, আমিই কৃষ্ণ, তোমরা আমাকে দেখ। এইভাবে বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ লতাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বনের এক জায়গায় কৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন। সেই চিহ্ন দেখে অগ্রসর হয়ে কোন বধূর পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে তাঁরা বলতে লাগলেন, বল এই পায়ের চিহ্ন কার? সেই নারী নিশ্চয়ই দেবতার আরাধনা করেছিলেন। তাই গোবিন্দ আমাদের ত্যাগ করে তাঁকে নিয়ে নির্জনে গেছেন।

এদিকে কৃষ্ণ অন্য গোপীদের বনে পরিত্যাগ করে যে গোপীকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। অনেক দূর এগিয়ে এসে সগর্বে বললেন, আমি শ্রান্ত, আর চলতে পারছি নে। তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানে তুমি আমাকে কোলে করে নিয়ে চল। কৃষ্ণ বললেন, তুমি আমার কাঁধে ওঠ। বলেই অন্তর্হিত হলেন এবং তাই দেখে সেই বধূ বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের অন্বেষণে অন্যান্য গোপীরা সেখানে এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর সম্মান ও অপমানের কথা বললেন। বিস্মিত হয়ে সবাই জ্যোৎস্নালোকিত বনের অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। তার পর যমুনা পুলিনে মিলিত হয়ে কৃষ্ণের গান করতে লাগলেন। তাঁরা

বললেন, হে প্রিয়, তোমার জন্মে এই ব্রজ বৈকুণ্ঠের চেয়েও জয়যুক্ত হয়েছে। তুমিই আমাদের জীবন। বন ভ্রমণে বিরত হয়ে তুমি আমাদের সামনে এসো।

সহসা এই রোদনরতা ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন এবং গোপীরা নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। এর পর পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গোবিন্দ গোপীমণ্ডল মণ্ডিত রাসলীলায় প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণ তুজন করে গোপীর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠ ধারণ করলেন এবং সকলেই মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর কাছেই আছেন। গোপীরা নৃত্য গীত করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের অতুল আনন্দে বিবাশস্ত্রিয় হলেন। এইভাবে তাঁরা দীর্ঘ রাত্রি বিহার করলেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, ধর্মসেতুর রক্ষক হয়ে কৃষ্ণ কেন পরদার অভি-মর্ষণের মতো ধর্মের প্রতিকূল আচরণ করলেন? কেন তিনি এ রকমের নিন্দিত কাজ করলেন, তা আমাদের বলুন।

শুক বললেন, সর্বভুক হয়েও বহ্নির যেমন দোষ হয় না, তেমনি ঈশ্বরের ধর্ম ব্যতিক্রমও সাহস পরিদৃষ্ট। যিনি সবার অন্তরে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করেন, তিনিই ক্রীড়ার জন্য দেহ ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রজবাসীরা পত্নীদের নিজের পাশেই অবস্থিত দেখে কৃষ্ণের উপরে ক্রুদ্ধ হন নি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত সমাগত হলে গোপীবা কৃষ্ণের কথায় আপন আপন গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

অজগর ও শঙ্খচুড়

একদা দেবযাত্রা উপলক্ষে নন্দ প্রভৃতি গোপরা শকটে আরোহণ করে অম্বিকা বনে গেলেন। সেখানে সরস্বতী নদীতে স্নান করে পশুপতি ও অম্বিকার পূজা করলেন। কিঞ্চিৎ জল পান করে তাঁরা শিবরাত্রিতে সেই নদীর তীরে রাত্রিবাস করলেন। হঠাৎ একটি সর্প এসে নিদ্রিত নন্দকে গ্রাস করতে আরম্ভ করল। নন্দ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে

ডাকতেই গোপরা এসে জলন্ত কাঠ দিয়ে সর্পের পুচ্ছে আঘাত করলেও সর্প নন্দকে পরিত্যাগ করল না। কিন্তু কৃষ্ণের পাদস্পর্শে সেই সর্প তার দেহ ত্যাগ করে বিদ্যাধর পূজ্য দুর্লভ রূপ পেল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে এবং কেন এই সর্পের রূপ পেয়েছিলে? সর্প বললেন, আমি সুদর্শন নামে বিদ্যাধর। নিজের রূপে গর্বিত হয়ে একদিন তপঃক্লিষ্ট বিকৃতাকার আঙ্গিরার গোত্রের এক ঋষিকে উপহাস করে-ছিলাম। ঋষির শাপে আমি সর্প হয়েছিলাম, আপনার পাদস্পর্শে নিষ্পাপ হলাম। বলে সুদর্শন কৃষ্ণকে বন্দনা করে স্বর্গে গেলেন এবং ব্রজবাসীরা পুনরায় ব্রজে ফিরে এলেন।

শিবরাত্রির পর একদিন রাতে গোবিন্দ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে ব্রজনারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের গীত শুনে গোপীরা মূর্ছিত হয়েছিলেন। এমন সময়ে শঙ্খচূড় নামে কুবেরের এক অনুচর এসে সেখানে উপস্থিত হল এবং লাঠি ঘুরিয়ে প্রমদাদের ভয় দেখিয়ে উত্তর দিকে নিয়ে গেল। 'রাম কৃষ্ণ' বলে তাঁরা রোদন করছেন শুনে 'তোমাদের ভয় নেই' বলে রাম ও কৃষ্ণ শাল গাছ হাতে নিয়ে শঙ্খচূড়ের নিকটে উপস্থিত হলেন। ভয়ে ভীত শঙ্খচূড় নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ তার মাথার ভাস্বর মণি অপহরণ করবার জন্য শঙ্খচূড়ের পিছনে ধাবিত হলেন এবং বলরাম স্ত্রীদের রক্ষা করতে লাগলেন, কৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করে তার প্রদীপ্ত শিরোমণি নিয়ে অগ্রজ বলরামকে দিলেন।

দিনের বেলায় কৃষ্ণ যখন বনে যেতেন, তখন গোপীরা তাঁর লীলা গান করতে করতে অতি দুঃখে দিন যাপন করতেন।

অরিষ্টাসুর বধ

শুক বললেন, আর এক দিন বৃষভাকৃতি অরিষ্টাসুর পৃথিবী কাঁপিয়ে গোষ্ঠে এসে উপস্থিত হন। তাঁর ভয়ঙ্কর শব্দ ও ককুদের বিরাট আকার দেখে গোপরা ভীত হয়ে পড়লেন। পশুরা পলায়ন করছে দেখে তাঁরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে গোবিন্দের শরণাপন্ন হলেন। 'ভয় পেও না' বলে কৃষ্ণ অসুরকে নিকটে আহ্বান করলেন। অরিষ্ট তেড়ে তাঁর দিকে এলে কৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধরে আঠারো হাত দূরে ঠেলে দিলেন। অরিষ্ট পুনরায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে তিনি তার দুই শৃঙ্গ উৎপাটিত করে তারই আঘাতে তাকে বধ করলেন।

নারদ কংস ও অক্রূর সংবাদ

দেবর্ষি নারদ কংসের নিকটে এসে বললেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভ নামে প্রচারিত কন্যা আসলে যশোদার এবং রোহিণীর পুত্ররূপে পরিচিত বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনে দেবকীরই পুত্র। তোমার ভয়ে বসুদেব তাঁদের মিত্র নন্দের নিকটে রেখেছেন। তুমি মূর্খ, তাই এ কথা জানতে পার নি যে তারাই তোমার লোকদের মেরেছে।

এ কথা শুনেই ভোজপতি কংস বসুদেবকে বধের জন্য শাণিত খড়্গ গ্রহণ করল, কিন্তু নারদ বাধা দিলে তিনি সস্ত্রীক বসুদেবকে লৌহপাশে আবদ্ধ করলেন। এবং তিনি ফিরে যেতেই রাম ও কৃষ্ণকে বধের জন্য কেশীকে পাঠালেন। তার পর তিনি মুষ্টিক চাণূর শল তোশল প্রভৃতি অমাত্য ও হস্তীপালকদের ডেকে বললেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম যে বসুদেবের পুত্র রাম ও কৃষ্ণ ব্রজে বাস করছে এবং তারাই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের তোমরা মল্ললীলায় হত্যা কর। মল্লদের রঙ্গের চারিদিকে মঞ্চ নির্মাণ করে দাও পৌরজনের এই মল্ল যুদ্ধ দেখবার জন্য। মহামাত্র, তুমি রঙ্গদ্বারেই কুবলয়পীড় নামে হাতী নিয়ে আগেই তাদের বিনাশের চেষ্টা কোরো। এর জন্য চতুর্দশীতে ধনুর্যাগ আরম্ভ কর।

অনুচরদের এই আদেশ দেবার পর তিনি অক্রূরকে ডেকে তাঁর দু হাতঃধরে বললেন, ভোজ ও বৃষ্ণি বংশে আপনার মতো হিতকারী আমার আর কেউ নেই। আপনি নন্দ ব্রজে গিয়ে এই নূতন অলঙ্কৃত রথে বসুদেবের দুই পুত্রকে অবিলম্বে মথুরায় আনুন। তাদের একজনা আমার মৃত্যুর কারণ বলে দুজনকেই আমি হাতী দিয়ে হত্যা করাব, না পারলে মল্লরা তাদের বিনাশ করবে। তারা নিহত হলে বৃষ্ণি ভোজ ও দশাইদেরও বধ করব, রাজ্যকামুক আমার স্থবির পিতা উগ্রসেন তাঁর ভ্রাতা দেবক ও অন্যান্য বিদ্বেষীদেরও বাদ দেব না। জরাসন্ধ আমার গুরু, দ্বিবিদ সখা। শম্বর নরক বাণ প্রভৃতি অসুরদের সঙ্গে মিত্রতা করে সুরপক্ষীয় কৌরবাদি রাজাদের বিনাশ করে আমি নিষ্কণ্টক পৃথিবী ভোগ করব। যদুপুরের শোভা ও ধনুর্যজ্ঞ দেখবার জন্য আপনি রাম ও কৃষ্ণকে এখানে আনুন।

কংসের কথা শুনে অক্রূর বললেন, মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনি ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এর জন্য উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। কারণ কর্মের ফল দৈবের অধীন। মানুষ অনেক উচ্চাশা করে, কিন্তু বাদ সাধে দৈব। তবু আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করব। এই বলে অক্রূর নিজের গৃহে গেলেন এবং কংসও তাঁর মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে স্বগৃহে প্রবেশ করলেন।

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

শুক বললেন, কেশী বৃহৎকায় অশ্বের আকার ধারণ করে হ্রেষা ধ্বনিতে বিশ্ব ভয়াকুল করে নন্দব্রজে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণই আগে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে নিকটে ডাকলেন। কেশী কাছে এসে যে পায়ে তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হল, কৃষ্ণ সেই পদদ্বয় ধরে তাকে ঘুরিয়ে শতধনু দূরে নিক্ষেপ করলেন। সংজ্ঞা লাভ করে কেশী আবার ফিরে আসতেই কৃষ্ণ তার মুখে বাম বাহু ঢুকিয়ে দিয়ে তার দাঁত ভেঙে দিলেন। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কেশীর প্রাণ বিয়োগ হল। -

দেবর্ষি নারদ নির্জনে কৃষ্ণের নিকটে এসে বললেন, আপনি মহাপুরুষ ঈশ্বর। অক্রূর এসে আপনাকে মথুরায় নিয়ে যাবেন। আপনি সেখানে হস্তী ও মল্লদের বিনাশ করে কংস বধ করবেন। আমি সেই লীলা দেখব। আরও কী করবেন সেসব কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

এর পরে গোপ বালকরা গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে নিলায়ন নামে খেলা খেলছিলেন। কেউ চোর কেউ রক্ষক হলেন। এই সময় ময় পুত্র ব্যোম এসে মেষরূপী গোপ বালকদের অপহরণ করে নিয়ে যেতে লাগল এবং তাদের একটি গুহায় নিক্ষেপ করে গুহার দ্বার শিলা দিয়ে বন্ধ করে দিল। গোপ বালকদের চার পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট রইল। কৃষ্ণ এই সংবাদ পেয়ে ব্যোমাসুরকে দুই হাতে ধরে যজ্ঞের পশু বধের মতো তার শ্বাস রোধ করে হত্যা করলেন। তারপর গুহার আবরণ ভেদ করে গোপ বালকদের উদ্ধার করলেন।

বৃন্দাবনে অক্রূর

পরদিন প্রভাতে অক্রূর রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুল যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে মহামতি অক্রূর ভাবলেন, আমি এমন কী শুভ কাজ করেছি যে কৃষ্ণের দর্শন পাব। কৃষ্ণকে নমস্কার করতে পারব, এই জন্য আমার জন্ম সার্থক মনে হচ্ছে। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি যখন গোকুলে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সূর্য অস্তমিত হলেন। .গা দোহন স্থানে তিনি দুই কিশোর কৃষ্ণ ও বলরামের দেখা পেলেন। রথ থেকে অবতরণ করে অক্রূর তাঁদের চরণে পতিত হলেন। কৃষ্ণ তাঁকে আকর্ষণ করে আলিঙ্গন করলেন। বলরামও তাঁকে আলিঙ্গন করে গৃহে নিয়ে এলেন এবং শ্রান্ত অতিথির পরিচর্যা করে অন্ন পরিবেশন করলেন। নন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কংসের কাছে তোমরা কেমন

করে জীবিত আছ? আর কৃষ্ণ বললেন, কংস আমাদের মাতুল, কিন্তু আমার জন্যই পিতামাতার কত ক্লেশ হচ্ছে! এইবারে আপনার আগমনের কারণ বলুন। এর উত্তরে অক্রূর যে ধনুর্যজ্ঞের ছলে তাঁদের মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য কংসের দূত হয়ে এসেছেন এবং তাঁদের বধ করবার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে সমস্ত কথাই বললেন। কৃষ্ণ বলরাম হেসে কংসের আদেশের কথা নন্দকে জানালেন। আগামী কাল নন্দ সবরকম গব্য উপায়ন নিয়ে কংসের পর্ব দেখতে মধুপুরী যাত্রা করবেন, এই কথা গোকুলে ঘোষণা করে দিলেন। গোপীরা এই কথা জেনে ব্যথিত হলেন এবং নানা ভাবে বিলাপ করলেন।

অকালে সূর্য উদিত হলে রোদনরত রমণীদের অনাদর করে রথ চালিয়ে দিলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপরা কুম্ভে দধি দুগ্ধাদি উপায়ন নিয়ে শকটে তাঁদের পিছনে যাত্রা করলেন। গোপীরা কৃষ্ণকে দেখবার জন্য কিছু দূর এগিয়ে ফিরে গেলেন।

রাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে বাতাসের মতো বেগবান রথে যমুনার নিকটবর্তী হলেন। তাঁরা যমুনার জল পান করে রথে আরোহণ করলেন। অক্রূর মধ্যাহ্নের সন্ধ্যা বন্দনার জন্য যমুনা হ্রদে স্নান করে জলমগ্ন হয়ে প্রণব মন্ত্র জপ করবার সময় রাম কৃষ্ণকে জলের মধ্যে দেখতে পেলেন। তবে কি তাঁরা রথে নেই? এই কথা ভেবে জল থেকে উঠে গিয়ে দুজনকেই রথের উপরে দেখতে পেলেন। তবে কি আমি জলে তাঁদের দেখি নি? এই ভেবে পুনরায় যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে রাম ও কৃষ্ণকে আর দেখতে পেলেন না। তাঁদের বদলে দেখলেন অহীশ্বর মোষের কোলে পীত কৌষেয় বসন পরিহিত এক শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ পুরুষ, সিদ্ধ চারণেরা অবনত হয়ে তাঁর স্তুতি করছেন। অক্রূরের দেহে রোমাঞ্চ হল, আর্দ্র হল দুই নয়ন। কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি স্তব করতে লাগলেন,

হে প্রভু, তোমাকে নমস্কার। তোমার পাদপদ্মে আমি শরণ নিচ্ছি, সংসার থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর।

এই মূর্তি অন্তর্হিত হবার পর অক্রূর তাঁর ক্রিয়া শেষ করে রথে ফিরে এলেন। কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মনে জলে স্থলে বা আকাশে আপনি কোন আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন? অক্রূর বললেন, আশ্চর্য কিছুই নয়। সবই তো আপনাতে বর্তমান। আমি আপনাকেই দেখেছি। এই বলে অক্রূর রথ চালিয়ে দিলেন এবং দিবাবসানে মথুরায় পৌঁছলেন।

মথুরায় কৃষ্ণ ও বলরাম

ব্রজবাসী গোপরা মথুরার সমীপস্থ বনে রাম ও কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। সেখানে পৌঁছে কৃষ্ণ অক্রূরের হাত ধরে বললেন, আপনি রথে নিজের গৃহে যান। আমরা এই উপবনে বিশ্রাম করে মথুরাপুরী দর্শন করব। অক্রূর বললেন, আপনাদের ছেড়ে আমি যাব না। কৃষ্ণ বললেন, কংসকে বধ করেই আমি আপনার গৃহে যাব। অক্রূর কিছু অসন্তুষ্ট হয়েই নিজের গৃহে চলে গেলেন।

পরে কৃষ্ণ বলরাম ও বয়স্য গোপদের সঙ্গে মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলেন। পরিখায় দুর্গম, উদ্যান ও উপবনে শোভিত পুরীর দ্বার স্ফটিকের, সোনার কপাট ও তোরণ, সুবর্ণময় চতুষ্পদ ধনীদের গৃহ ও আরাম, শিল্পোপজীবীদের উপবেশন স্থান, রাজপথ, দোকান অঙ্গন ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রভৃতি দেখতে দেখতে তাঁরা অগ্রসর হলেন। পুরস্ত্রীরা তাঁদের দেখবার জন্য বেরিয়ে এলেন। প্রাসাদের শিখর থেকে তাঁরা বলরাম ও কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণ এক রজককে দেখে তার কাছে নিজেদের বর্ণের উপযোগী বস্ত্র চাইলেন। রজক বলল, তোমরা বনে ও পাহাড়ে বিচরণ কর, তোমরা রাজার বস্ত্র চাইছ কেন? এ রকম কাজ আর কেরো না, রাজপুরুষেরা এই রকম দর্পিত ব্যক্তিকে বন্ধন ও প্রহার

করে, সম্পত্তি হরণও করে। কৃষ্ণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে করাতে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। তার সেবকরা বস্ত্রকোষ পরিত্যাগ করে পলায়ন করলে কৃষ্ণ ও বলরাম পীত ও নীলবস্ত্র পরিধান করে অবশিষ্ট বস্ত্র গোপদের মধ্যে বিতরণ করলেন। পরিধানের অযোগ্য বস্ত্রগুলি সেখানেই পড়ে রইল।

এর পর এক তন্তুবায় তাদের বিচিত্র বর্ণের চেলির কাপড় পরিয়ে মল্লোচিত বেশভূষা করে দিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে নিজের সারূপ্য প্রদান করে সুদাম নামে এক মালাকারের গৃহে গেলেন। মালাকার তাঁদের মালা দিয়ে পূজা করলেন এবং পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে সেই বর দিয়ে সেখান থেকে বহির্গত হলেন।

পথ চলতে চলতে কৃষ্ণ এক বরাঙ্গনা কুব্জা যুবতীকে দেখতে পেলেন। তিনি অঙ্গ বিলেপনের পাত্র নিয়ে কংসের গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কার জন্যে এই অঙ্গলেপন নিয়ে যাচ্ছ? এই অনুলেপন কি আমাদের অঙ্গে দেবে না? এতে তোমার মঙ্গলই হবে। ত্রিবক্রা নামের সেই সৈরিন্ধ্রী বললেন, আমি কংসের দাসী, এই অনুলেপন তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু ত্রিবক্রা কৃষ্ণ ও বলরামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সেই অনুলেপন দিলেন। তাঁরা সেই অঙ্গরাগে অনুরঞ্জিত হয়ে আরও সুন্দর হলেন। তারপর কুব্জাকে সরলাঙ্গী করবার ইচ্ছায় তাঁর দুই পায়ের উপরে নিজের পা রেখে দুই আঙুলে তাঁর চিবুক ধরে তাঁকে উন্নত ও ঋজু করে দিলেন। ত্রিবক্রা তাঁর উত্তরীয় ধরে সহাস্যে কটাক্ষ করে বললেন, তোমাকে আমি রাজপথেই পরিত্যাগ করতে পারছি না, আমার গৃহে চল। কৃষ্ণ বললেন, কংস বধের পর আমি তোমার গৃহে যাব। বলে তাঁকে বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণ পুরবাসীদের নিকটে ধনুর স্থান জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে সেই অদ্ভুত ধনু দর্শন করলেন। রক্ষীদের বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি সবলে ধনু গ্রহণ করলেন। বাম হাতে ধনু নিয়ে নিমেষে তাতে জ্যা

আরোপ করে দর্শকদের সামনেই আকর্ষণ করে দু টুকরো করলেন। সেই শব্দে চারিদিক পূর্ণ হল এবং ভীত হলেন কংস। ধনু রক্ষীরা তাঁদের বেষ্টন করে ফেলল। রাম ও কৃষ্ণ ধনুর দুই খণ্ড নিয়ে তাদের প্রহার করতে লাগলেন এবং কংসের সৈন্যদের বিনাশ করে পুরীর মধ্যে ভ্রমণ শেষ করে নিজেদের শকট-মোচন স্থানে ফিরে গেলেন। তাঁরা ভোজন করে সুখে রাত্রি যাপন করলেন। কিন্তু কংস ঘুমোতে পারলেন না, জাগরণে ও স্বপ্নে নানা দুর্নিমিত্ত দেখে রাত কাটালেন।

কংস বধ

রাত্রি প্রভাত হলে সূর্য উঠলেন এবং কংস মল্ল ক্রীড়ার আদেশ দিলেন। কংসের ভৃত্যেরা মল্ল ক্রীড়ার স্থলে মঙ্গল কলস স্থাপন করে তুরী ও ভেরী বাজাতে লাগল। তোরণ পতাকা ও মালা দিয়ে সাজানো হল উৎসবের স্থান। দেশান্তর থেকে আগত রাজারা সিংহাসনে বসলেন এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি পুরবাসী ও বিদেশীরা বসলেন মঞ্চে। মন্ত্রী পরিবৃত হয়ে কংস রাজ মঞ্চে উপবেশন করলেন। তারপর চাণূর মুষ্টিক কুট শল তোশল প্রভৃতি মল্লরা সেখানে প্রবেশ করল। তারপর নন্দ প্রভৃতি গোপরাও কংসকে উপঢৌকন দিয়ে যথাস্থানে বসলেন।

কৃষ্ণ ও বলরামও মল্ল যুদ্ধ দেখবার জন্য সেখানে এসে রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তীকে দেখলেন। কৃষ্ণ তাঁর কটিবন্ধন করে মাহুত হস্তিপককে ডেকে বললেন, এই হাতীকে সরিয়ে আমাদের পথ ছেড়ে দাও, তা না করলে এই হাতীর সঙ্গে তোমাকেও যমালয়ে পাঠাব। হস্তীপক এই তিরস্কার শুনে হাতীকে উত্তেজিত করে কৃষ্ণের দিকে চালিয়ে দিল। হাতী তার শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে ধরলে তিনি ছাড়িয়ে এসে হাতীর পায়ের মধ্যে লুকোলেন। তার পর ঘ্রাণে তাঁর সন্ধান পেয়ে আর একবার শুঁড় দিয়ে জড়াতেই কৃষ্ণ তার লেজ ধরে পঁচিশ ধনু টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর ডান থেকে বামে বাম থেকে ডানে

ছুটোছুটি করিয়ে তার দন্ত উৎপাটন করে তারই আঘাতে সেই হাতী ও মাহুতকে বধ করলেন।

কৃষ্ণ বাম হাতে সেই হাতীর দাঁত নিয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলে কংস অত্যন্ত ভীত হলেন। দর্শকরা তাঁদের দেখে যখন আনন্দ করছিলেন, তখন চাণূর রাম ও কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বাহু যুদ্ধে কুশল জেনে রাজা তোমাদের যুদ্ধ দেখবার জন্য ডেকেছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমরা রাজার বনচর প্রজা এবং তোমরা পুরবাসী। কাজেই আমরা তোমাদের আজ্ঞা পালন কববই। তবে আমরা বালক, তাই আমাদের সমান মল্লের সঙ্গে যুদ্ধ হলে কোন অধর্ম হবে না। চাণূর বললেন, তুমি ও বলরাম বালক নও, কিশোরও নও। কারণ তোমরা একটা হাতীকে অবলীলায় বিনাশ করেছ। তোমরা আমাদের সঙ্গেই যুদ্ধ কর। তাতে কোন অধর্ম হবে না। কৃষ্ণ, তুমি আমার সঙ্গে এসো, আর বলরাম যাক মুষ্টিকের সঙ্গে। এই কথায় কৃষ্ণ চাণূরেব এবং বলরাম মুষ্টিকের নিকটবর্তী হলেন। তাঁরা হাত পা বন্ধন করে পরস্পরকে জয় করবার জন্য আকর্ষণ করতে লাগলেন।

বালকদের সঙ্গে বলশালী মল্লদের যুদ্ধ করতে দেখে স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করতে লাগলেন, এ কী অধর্ম! এই অপ্রাপ্ত যৌবন সুকুমার অঙ্গের কিশোরদের সঙ্গে পর্বতের মতো বজ্র কঠিন মল্লদের যুদ্ধ রাজাকে বলে বন্ধ না করিয়ে রাজার সভাসদরা নিজেরাই তা উপভোগ করছেন। যেখানে এই অধর্ম, সেখানে আমাদের থাকা উচিত হচ্ছে না।

কৃষ্ণের সঙ্গে যেমন চাণূর তেমনি বলরামের সঙ্গে মুষ্টিক ভীষণ যুদ্ধ করছিলেন। কৃষ্ণের প্রহারে চাণূর ভগ্নাঙ্গ হয়ে কষ্ট পেতে লাগলেন। তিনিও ক্রুদ্ধ হয়ে বাসুদেবের বক্ষে আঘাত করলেন। কৃষ্ণ বেগে চাণূরের দুই বাহু ধরে তাকে বারংবার ঘুরিয়ে বিগতপ্রাণ করে স্রস্ত বেশে ভূপাতিত করলেন। এদিকে মুষ্টিক বলরামের প্রহারে রক্ত-

বমন করে বাতাহত বৃক্ষের মতো ভূতলে পতিত হল। মুষ্টিক নিহত হবার পর তার পিছনে দণ্ডায়মান কূটকে বলরাম বাম মুষ্টির আঘাতে বিনাশ করলেন। সেই সময়েই কৃষ্ণের পদাঘাতে শল ও তোশলক নিহত হলেন। অন্য মল্লরা প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করল।

তূর্যের বাজনা আরম্ভ হলে রাম ও কৃষ্ণ গোপদের নিয়ে মল্লদের মতো বিহার করতে লাগলেন। কংস বাজনা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এই দুর্বৃত্ত রাম ও কৃষ্ণকে পুর থেকে বার করে দাও, গোপদের ধন অপহরণ কর ও দুর্বুদ্ধি নন্দ দুরাত্মা বসুদেব ও আমার পিতা উগ্রসেনকেও বিনাশ কর। এই কথা শুনেই কৃষ্ণ কুপিত হয়ে এক লাফে কংসের মঞ্চে আরোহন করলেন। কংস তাই দেখে আসন থেকে উঠে অসি ও চর্ম গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ কংসের কেশ ধরে মঞ্চ থেকে তাঁকে রঙ্গভূমির উপরে ফেলে দিয়ে তাঁর উপর নিপাতিত হলেন। সেই পতনের ভারেই মৃত কংসকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করছেন দেখে দর্শকদের মধ্য থেকে হাহাকার শব্দ উত্থিত হল।

কঙ্ক ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের আটজন অনুজ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হলেন। বলরাম পরিঘ দিয়ে সকলকেই বধ করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন। কংস প্রভৃতির পত্নীরা এসে বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বাস দিয়ে সকলের সৎকার করালেন। তারপর তাঁদের পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মুক্ত করে তাঁদের প্রণাম করলেন। বললেন, শত বর্ষেও জনক-জননীর ঋণ শোধ হয় না। আপনাদের পূজায় বিমুখ হয়ে এতদিন আমাদের নিষ্ফলে গেছে। গুপ্তভাবে বাস করার জন্যই আমরা আপনাদের ক্লেশ লাঘব করতে পারি নি। আমাদের ক্ষমা করুন। এই কথায় বসুদেব ও দেবকী তাঁদের কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

এর পর কৃষ্ণ তাঁদের মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন এবং কংসের ভয়ে ভীত জ্ঞাতিদের প্রচুর বিত্ত দিয়ে মহোৎসব করলেন।

নন্দের নিকটে গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন, পরের সন্তানকে যাঁরা নিজের সন্তানের মতো পালন করেন, তাঁরাই পিতামাতা। আপনারা ব্রজে যান, আমরা স্থানীয় মিত্রদের সুখ বিধান করে পরে আপনাদের কাছে আসব। এই কথা শুনে নন্দ তাঁদের আলিঙ্গন করে গোপদের নিয়ে ব্রজে ফিরে গেলেন।

বলরাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন ও বিদ্যাধ্যয়ন

অতঃপর বলরাম ও কৃষ্ণ উপনয়ন সংস্কার লাভ করে যদুকুলের আচার্য গর্গঋষির নিকটে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেন এবং গুরুকুলে বাসের জন্য অবন্তীপুর নিবাসী কশ্যপ গোত্রজ সান্দীপনি ঋষির নিকটে গেলেন। গুরু তাঁদের ষড়ঙ্গ উপনিষদের সঙ্গে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করালেন। এ ছাড়াও সরহস্য ধনুর্বেদ মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র ন্যায়পথ আন্বীক্ষিকী ও ষড়বিধ রাজনীতি বিদ্যাও শিক্ষা দিলেন। গুরুর মুখে একবার শুনেই তাঁরা সমস্ত শিখতে লাগলেন। তাঁরা চৌষট্টি দিনে চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। তারপর দক্ষিণা গ্রহণে অনিচ্ছুক গুরুকে গুরু দক্ষিণা গ্রহণে রাজী করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা ও অমানুষিক বুদ্ধি দেখে সান্দীপনি ঋষি তাঁর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভাস ক্ষেত্রের মহাসাগরে নিজেদের মৃত পুত্রকে চাইলেন।

রাম ও কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে প্রভাসের সমুদ্র তীরে পৌঁছে উপবেশন করলেন। সমুদ্র তাঁদের অমূল্য রত্নাদি দিয়ে পূজা করলেন। কৃষ্ণ সমুদ্রকে বললেন, আমাদের গুরুপুত্রকে তুমি গ্রহণ করেছ, তাকে অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। সমুদ্র বললেন, আমি তাকে অপহরণ করি নি পঞ্চজন নামে এক দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে এবং শঙ্খের রূপ ধারণ করে জলের মধ্যে বিচরণ করছে। এই কথা শুনে কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অসুরকে বিনাশ করে তার উদরে বালককে পেলেন না, তার দেহ থেকে উৎপন্ন পাঞ্চজন্য নামে এক শঙ্খ নিয়ে ফিরে এলেন।

তারপর তিনি বলরামের সঙ্গে যমের সংযমনী পুরীতে গিয়ে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করলেন। এই শঙ্খধ্বনি শুনে যমরাজ এসে মহাসমারোহে তাঁদের পূজা করলেন। কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে গুরু-পুত্রকে নিয়ে গুরুকে এনে দিলেন। গুরু আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাদের কীর্তি অক্ষয় হোক। তোমরা স্বগৃহে যাও।

বলরাম ও কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে মথুরায় ফিরে এলেন।

উদ্ধব সংবাদ

শুক বললেন, বৃষ্ণিদের মন্ত্রী বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব কৃষ্ণের সখা ছিলেন। একদিন কৃষ্ণ নির্জনে তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি একবার ব্রজে গিয়ে আমার পিতা মাতা নন্দ ও যশোদার প্রীতি বর্ধন কর এবং আমার বিয়োগে গোপীদের দুঃখ দূর কর। কৃষ্ণের এই কথায় উদ্ধব রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গেলেন। নন্দ তাঁকে আপ্যায়িত করে জিজ্ঞাসা করলেন, বসুদেব ভাল আছেন তো? কৃষ্ণ আমাদের সকলের কথা মনে রেখেছেন কী? উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণ অল্পকাল পরেই ব্রজে এসে আপনাদের প্রিয় সাধন করবেন। তিনি শুধু আপনাদেরই পুত্র নন, তিনি সকলের আত্মজ পিতা মাতা ও ঈশ্বর।

রাত্রি প্রভাত হলে গোপীরা প্রদীপ জ্বেলে দেহলী প্রভৃতির অর্চনা করে দধি মন্থন করতে লাগলেন এবং কৃষ্ণের নাম গান করতে লাগলেন। সূর্যোদয় হলে ব্রজবাসীরা যখন রথ দেখে 'এ কার রথ' বলে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তখন উদ্ধব স্নান সেরে ফিরলেন। ব্রজস্ত্রীরা দূর থেকে তাঁকে দেখে বিস্মিত হলেন এবং তাঁকে বেষ্টন করলেন। বললেন, আপনাকে কৃষ্ণের সেবক বলে জানতে পেরেছি। গুরুকুল থেকে ফিরে কৃষ্ণ কি এখন মধুপুরীতে বাস করছেন? এখনও কি তিনি এখানকার কথা স্মরণ করেন? উত্তরে উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণের বার্তা নিয়েই আমি আপনাদের নিকটে এসেছি। তিনি বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আপনাদের বিচ্ছেদ হয় নি। তিনি মথুরায় আছেন বলে

মনে করবেন না যে তিনি এখানে নেই। কিন্তু এ কথায় গোপীদের শোক নিবৃত্ত হল না এবং তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, তাঁর সুখেই আমাদের মঙ্গল। কেউ বললেন, এখন তো তিনি পুরস্ত্রীদের মনোরঞ্জন করছেন। তিনি কি এখনও আমাদের স্মরণ করেন? বৃন্দাবনের সেই সব রমণীয় রাত্রির কথা কি তাঁর মনে পড়ে? তিনি কি আবার কখনও ব্রজে আসবেন? শত্রু বিনাশ করে তিনি রাজ্য পেয়েছেন, রাজকন্যা বিবাহ করে বন্ধুদের সঙ্গে সুখে থাকবেন। তিনি আর এখানে আসবেন কেন? এই সব কথা বলে তাঁরা কিছুকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে থাকবার পর কিছু ধৈর্য অবলম্বন করে সুস্থ হলেন। কৃষ্ণের সংবাদে তাঁদের সন্তাপ অপগত হল। উদ্ধব যে আত্মজ্ঞান দিলেন, সেই আত্মাকে কৃষ্ণ মনে করে উদ্ধবকে তাঁরা সম্মান ও পূজা করলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কয়েক মাস ব্রজে বাস করে কৃষ্ণের গোকুল ও মথুরার লীলার কথা গান করে গোকুলবাসী সবাইকে সুখী করলেন। তারপর তিনি রথে আরোহণ করে মথুরাপুরীতে ফিরে এলেন এবং নন্দের উপঢৌকন সবাইকে বিতরণ করলেন।

কুব্জার মনোরথ পূরণ

কৃষ্ণ একদিন উদ্ধবের সঙ্গে কুব্জার গৃহে গেলেন। সেই সৈরিন্ধ্রী সম্ভ্রম সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। উদ্ধবকে আসন দিলেও তিনি আসনে উপবেশন না করে তা স্পর্শ করে ভূমিতে বসলেন। কৃষ্ণ বসলেন পর্যঙ্কে। বসন ভূষণ ও অনুলেপনে সজ্জিতা সৈরিন্ধ্রী লজ্জা সহকারে কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ নব-সঙ্গম লজ্জায় ভীত কান্তার কঙ্কনে অলঙ্কৃত কর গ্রহণ করে শয্যায় উপবেশন করিয়ে তাঁর সঙ্গে রমণ করলেন। সৈরিন্ধ্রী বললেন, আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারছি না। এই গৃহে তুমি আমার সঙ্গে বাস কর

ও কয়েকদিন রমণ কর। কৃষ্ণ তাঁকে কাম বর দিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন।

হস্তিনাপুরে অক্রূর

কৃষ্ণ অক্রূরের গৃহেও যাবেন বলেছিলেন। তাই একদিন বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে পাণ্ডবদের সংবাদ জানবার জন্য অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাবার ইচ্ছা নিয়ে তাঁর গৃহে গেলেন। অক্রূর তাঁদের অভিনন্দন করে বললেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। কৃষ্ণ বললেন, তাত, আপনি আমাদের পিতৃব্য ও পরম বন্ধু। আমরা আপনার পুত্রস্থানীয়, তাই শত্রু যাতে আমাদের অনিষ্ট করতে না পারে তার জন্য আপনার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। জলময় তীর্থ বা পাথরের দেবতা মানুষকে পবিত্র করেন বিলম্বে, কিন্তু সাধুরা পবিত্র করেন দর্শন মাত্রেই।—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৪৮।৩১

পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনায় আপনি একবার হস্তিনাপুরে গিয়ে তাঁদের কথা জেনে আসুন। পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাইকে ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুরী হস্তিনায় এনেছেন। কিন্তু তাঁরা জননী কুন্তীর সঙ্গে অতি কষ্টে কালাতিপাত করছেন বলে শুনতে পেয়েছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাঁর কুপুত্র দুর্যোধন প্রভৃতির বশীভূত হয়ে হিতাহিত বিবেচনাতেও অন্ধ হয়েছেন। পাণ্ডবরা কী ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছেন, তাই জেনে আসুন। তাঁদের মঙ্গলের জন্য আমরা যত্ন করব। অক্রূরকে এই কথা বলে কৃষ্ণ ফিরে এলেন।

শুক বললেন, অক্রূর হস্তিনাপুরে উপনীত হয়ে ভীষ্মের সহিত একত্র উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও পৃথা কুন্তীকে দেখলেন। সেখানে বাহ্লীক সোমদত্ত দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও অন্যান্য সুহৃদদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন। তিনি কয়েক মাস হস্তিনাপুরে

অবস্থান করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পাণ্ডবদের প্রতি যেসব দুর্বৃত্তাচরণ করেছিলেন, বিদুর ও কুন্তী তা অক্রূরকে জানালেন। কুন্তী বললেন, ভাই, বাবা মা কি আমাকে আর কন্যা বলে মনে করেন? কৃষ্ণ ও বলরাম কি পাণ্ডবদের পিসির পুত্র বলে মনে করেন? কৃষ্ণকেই আমি আশ্রয় বলে গ্রহণ করলাম।

মথুরায় প্রত্যাগমনের পূর্বে অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়ে বললেন, আপনার ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির থাকতেই আপনি সিংহাসনে বসেছেন। নিজের পুত্রদের সঙ্গে ভ্রাতার পুত্রদের প্রতি সমান ভাবে আচরণ করলে আপনি ধর্মের ফল পাবেন, কিন্তু বিপরীত আচরণ করলে নিন্দিত হয়ে নরকে যাবেন। নিজের দেহের সঙ্গেই নিজের সম্বন্ধ যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে কেন, কারও সঙ্গেই সম্বন্ধ নিত্যকালের হয় না। জীব একাকীই আসে, একাকীই যায়, আপন সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলও ভোগ করে একাকী।—

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ১০।৪৯।২১

এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র অক্রূরকে বললেন, আপনি হিতকর কথাই বলেছেন। কিন্তু পুত্রদের প্রতি অনুরাগে আমার চিত্ত নিতান্তই ব্যাকুল। তাই আপনার কথায় তৃপ্তি পাচ্ছি না।

অক্রূর এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রের মনের অভিপ্রায় জেনে সকলের সম্মতি নিয়ে যদুপুরী মথুরায় ফিরলেন এবং কৃষ্ণকে সব জানালেন।

দশম স্কন্ধে পূর্বার্ধ সমাপ্ত

দশম স্কন্ধ

উত্তরার্ধ

মথুরায় জরাসন্ধ

শুক বললেন, কংসের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই পত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে কাতর হয়ে তাঁরা তাঁদের পিতা জরাসন্ধের গৃহে গেলেন। কন্যাদের বৈধব্যের কথা জেনে জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ বধ ও পৃথিবী যাদবশূন্য করার জন্য তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে মথুরাপুরী অবরোধ করলেন। কৃষ্ণ যখন নিজের কর্তব্যের বিষয় চিন্তা করছিলেন তখন নানা অস্ত্রে সজ্জিত দুখানি রথ আকাশ থেকে অবতরণ করল। বলরাম ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করে মথুরার বাহিরে গেলেন। জরাসন্ধ তাঁদের দেখে বললেন, কৃষ্ণ, আমি বীর হয়ে তোমার মতো বালকের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করব! আত্মরক্ষার জন্য তোমারই এখন অন্যের সাহায্য দরকার। তবে বলরাম যদি যুদ্ধ করতে চাও তো এগিয়ে এসো। কৃষ্ণ এই কথা শুনে বললেন, বীর পুরুষ যিনি, তিনি কথায় শ্লাঘার পরিচয় দেন না; কাজেই তিনি নিজের পৌরুষ প্রকাশ করেন।—

ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্। ১০।৫০।১৯

এর পর জরাসন্ধ তাঁর সেনা সঞ্চালন করে রাম কৃষ্ণকে আবৃত করে ফেললেন। কিন্তু তাঁদের উদ্যম কার্যকরী হল না। বলরাম জরাসন্ধকে আক্রমণ করে তাঁকে বন্ধন করলে কৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করতে বললেন। এই অবমাননার পর জরাসন্ধ লজ্জিত হয়ে তপস্যার জন্য বনে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা তাঁকে বললেন, একজন সমকক্ষের নিকটে পরাজিত হলে আপনার অবমাননা হত ঠিকই, কিন্তু তুচ্ছ কৃষ্ণের নিকট পরাজয় আপনার পাপের লিখন। এদের জয়ে যেমন আপনার গৌরব বাড়ে না, তেমনি পরাজয়েও কোন নিন্দা নেই। এই সান্ত্বনায় জরাসন্ধ তাঁর সেনাবল হারিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে মগধে ফিরে গেলেন।

এইভাবে জরাসন্ধ সতেরো বার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু প্রতি বারেই তিনি পরাজিত হয়ে মগধে ফিরে গিয়েছিলেন এবং অষ্টাদশবার যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন।

কালযবন ও মুচুকুন্দের উপাখ্যান

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ গিয়েছিলেন কালযবনের নিকটে। তাঁর মতো বীর সে সময়ে কেউ ছিলেন না। নারদকে দেখে কালযবন নিজের তুল্য যোদ্ধার কথা জানতে চাইলে তিনি বৃষ্ণিবংশীয় বীরদের কথা বললেন। তাই শুনে কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করলেন।

কৃষ্ণ বলরামকে বললেন, আজ কালযবন এসেছে, কাল জরাসন্ধ এসে পড়বে। আমরা যদি এখন এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হই তো জরা-সন্ধ এসে হয় সবাইকে বধ করবে নয় বন্দী করে মগধে নিয়ে যাবে। কাজেই আমাদের এমন একটি অগম্য দুর্গ নির্মাণ করা দরকার যেখানে আমরা জ্ঞাতিদের রেখে এসে যুদ্ধ করতে পারি। এই পরামর্শ করে কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে এক দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং তাব মধ্যে বারো যোজন বিস্তৃত এক মনোরম নগর নির্মাণ করলেন বিশ্বকর্মা। তিনি এই নগর নির্মাণে তাঁর বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় দিলেন। স্বর্গ থেকে ইন্দ্র পাঠালেন সুধর্মা নামের সভা ও পারিজাতের গাছ। অন্যান্য দেবতারাও নানা দ্রব্য দিলেন। কৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বজনবর্গকে মথুরা থেকে এই দুর্গে আনলেন এবং তারপর গলায় পদ্মের মালা ধারণ করে একাকী বিনা অস্ত্রে মথুরার দ্বার দিয়ে নির্গত হলেন।

নারদ যে সব লক্ষণ বলেছিলেন তা মিলিয়ে কালযবন কৃষ্ণকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত্র দেখে ভাবলেন যে তিনিও পদব্রজে নিরস্ত্র হয়েই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। এই ভেবে তাঁর

পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হয়েছেন, এই ভাবে পলায়ন করতে লাগলেন এবং প্রতিপদে তাঁর হাতে ধরা পড়বেন এই প্রলোভন দেখিয়ে দূরবর্তী এক গিরি কন্দরে তাঁকে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণের পিছনে কালযবনও সেই পর্বতকন্দরে প্রবেশ করে অকাতরে নিদ্রিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন যে কৃষ্ণই সাধুর মতো নিদ্রার ভান করছেন। তাই তাঁকে পদাঘাত করলেন। এই পদাঘাতে সেই নিদ্রিত পুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ হল এবং তিনি চারি দিকে তাকাতেই কালযবনকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর ক্রোধ বহ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।'

এ কথা শুনেই পরীক্ষিৎ কালযবনের পরিচয় জানতে চাইলেন। শুক বললেন, ইনি ইক্ষ্বাকু বংশজাত রাজা মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। ইন্দ্রাদি দেবতাকে ইনি বহুকাল অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে কার্তিকেয়কে স্বর্গের পালকরূপে পেয়ে দেবতারা বললেন, অপনি আমাদের রক্ষার জন্য বহুকাল কষ্ট স্বীকার করেছেন, এইবারে বিশ্রাম করুন। আপনার পুত্র কলত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেউ তো আর জীবিত নেই, আপনাকে আমরা কী বর দেব বলুন। মুচুকুন্দ বললেন, কেউ আমার নিদ্রা ভঙ্গ করলে সে যেন আমার দৃষ্টিপাতেই ভস্মীভূত হয়। দেবতারা বলেছিলেন, তথাস্তু। আর মুচুকুন্দ এই গুহায় প্রবেশ করে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে ছিলেন।

কালযবন ভস্মীভূত হবার পর কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন। মুচুকুন্দ তাঁর রূপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? কৃষ্ণ বললেন, আমার অসংখ্য নাম। এখন আমি বাসুদেব নামে পরিচিত। আপনি আমার নিকটে বর নিতে পারেন। কৃষ্ণের এই পরিচয়েই মুচুকুন্দের মনে পড়ল স্বর্গের কথা। তিনি বলেছিলেন অষ্টাবিংশতি যুগে ভগবান বসুদেবের গৃহে জন্ম নেবেন। এই কথা মনে পড়তেই তিনি কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করে বললেন, এই বিপন্ন ব্যক্তিকে আপনি সংসারের দুঃখ থেকে ত্রাণ করুন। কৃষ্ণ বললেন, মৃগয়াকালে আপনি

অনেক প্রাণী বধ করেছেন, তপস্যায় সেই পাপক্ষয় করুন। পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে আপনি পরম ব্রহ্ম লাভ করবেন।

মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে প্রণাম করে গুহা থেকে নির্গত হয়ে মানুষ পশু ও বৃক্ষাদিকে ক্ষুদ্র কলেবর দেখে বুঝতে পারলেন যে কলিযুগ সমাগত হয়েছে। তিনি তপস্যাব জন্য উত্তর দিকে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন এবং নারায়ণের আলয় বদরিকাশ্রমে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন।

কৃষ্ণের মথুরা ত্যাগ

কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে কালযবনের ম্লেচ্ছ সৈন্য ধ্বংস করলেন। তিনি যখন তাদের ধন সামগ্রী দ্বারকায় পাঠাবাব উদ্যোগ করছিলেন, তখন জরাসন্ধ অকস্মাৎ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হলেন। শত্রুপক্ষের দারুণ যুদ্ধোদ্যম দেখে কৃষ্ণ ও বলরাম ধনরত্নাদি পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগলেন। জরাসন্ধ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁরা এক পর্বতে আরোহণ করলেন। জরাসন্ধ সর্বত্র অন্বেষণ করেও তাঁদের দেখতে না পেয়ে পর্বতের চারিদিক ঘিরে আগুন ধরিয়ে দিলেন। পর্বতের পাদদেশ যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন তাঁরা উল্লম্ফন করে জরাসন্ধের অবরোধ অতিক্রম করে গেলেন। জরাসন্ধ বা তাঁর সৈন্যসামন্ত জানতেও পারলেন না যে কৃষ্ণ ও বলরাম পালিয়ে দ্বারকায় পৌঁছে গেছেন। আগুনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়েছেন মনে করে জরাসন্ধ তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে মগধ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রুক্মিণী হরণ

আনর্তের অধিপতি রৈবত ব্রহ্মার উপদেশে বলরামের সঙ্গে নিজের কন্যা রেবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে শিশুপালের পক্ষের রাজাদের পরাস্ত করে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে বিবাহ করেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, কৃষ্ণ রাক্ষস বিবাহ বিধানে কেন রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন তা শোনবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।

শুক বললেন, ভীষ্মকের পাঁচটি পুত্র ও একটি রূপলাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। পুত্রদের নাম রুক্মী রুক্মরথ রুক্মবাহু রুক্মকেশ ও রুক্মমালী এবং রুক্মিণী এঁদের ভগিনী। রুক্মিণী কৃষ্ণের রূপ গুণ ঐশ্বর্য ও সামর্থ্যের কথা শুনে মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে কৃষ্ণও জনগণের মুখে রুক্মিণীর অলোকসামান্য রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁকেই বিবাহ করতে চান। কৃষ্ণের প্রতি রুক্মীর বিদ্বেষ ছিল বলে তিনি চেদিরাজ শিশুপাল ভগিনীর বর হবেন বলে ঠিক করেন। এই কথা জেনে রুক্মিণী মর্মাহত হয়ে একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে গোপনে পাঠালেন কৃষ্ণকে আনবার জন্য। ব্রাহ্মণ এসে কৃষ্ণকে বললেন, রুক্মিণী আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছেন ও মনে মনে তাঁর দেহ আপনাকে সমর্পণ করেছেন। তাই চেদিরাজ শিশুপাল যেন তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। রুক্মিণী আরও বলেছেন, আমাদের বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। আপনি অন্যের অলক্ষিতে বিদর্ভপুরে উপস্থিত হবেন এবং পরে সৈন্য সামন্ত নিয়ে শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্য বিধ্বস্ত করে রাক্ষস বিধানে আমার পাণিগ্রহণ করবেন। আমার রক্ষক আত্মীয় স্বজন বধ করবার দরকার হবে না। বিবাহের আগের দিন কুলদেবতার দর্শনের প্রথা আছে, এই সময়ে নববধূ পুরের বাহিরে অবস্থিত পার্বতীকে দর্শন করতে যায়। সেই সময়ে আপনি আমাকে হরণ করবেন, আপনার আশা আমি কখনও পরিত্যাগ করব না। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।

এই কথা শুনে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের হাত ধরে বললেন, আমার চিত্তও রুক্মিণীর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। সে জন্য রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না। আমি জানি রুক্মী আমার বিদ্বেষী ও সেই জন্যই সে আমাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক। কিন্তু আমিও বলছি যে নরাধম রাজাদের পরাজিত করে

রুক্মিণীকে আমি আনব। পরদিন রাত্রে রুক্মিণীর বিবাহ হবে জেনে কৃষ্ণ দারুককে দ্রুতগামী রথ তৈরি করতে বললেন এবং ব্রাহ্মণকে রথে তুলে সেই রাত্রেই আনর্ত থেকে যাত্রা করে পরদিন প্রভাতে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হলেন।

পুত্রবৎসল রাজা কুণ্ডিলপতি ভীষ্মক পুত্রের কথায় শিশুপালের হাতেই কন্যা সম্প্রদানের আয়োজন করেছিলেন। চেদিপতি রাজা দমঘোষ ও পুত্র শিশুপালকে নিয়ে কুণ্ডিল নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরেই শাল্ব জরাসন্ধ দন্তবক্র বিদূরথ ও পৌণ্ড্রকাদি বরপক্ষের রাজারাও এলেন। এঁরা সকলেই কৃষ্ণের বিদ্বেষী এবং কৃষ্ণও যদি রুক্মিণীকে হরণ করবার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁরা একত্র হয়ে যুদ্ধ করবেন বলে স্থির করেই এলেন। কৃষ্ণ একা রুক্মিণী হরণের জন্য গেছেন শুনে বলরামও কলহের আশঙ্কায় সৈন্য পরিবৃত হয়ে ত্বরায় যাত্রা করলেন।

রুক্মিণী প্রতিমুহূর্তেই কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন এবং বার্তাবহ ব্রাহ্মণও ফিরছেন না দেখে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ এসে সংবাদ দিলেন যে কৃষ্ণ ও বলরাম এসে পৌঁছে গেছেন এবং কৃষ্ণ তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সে কথাও বললেন। রুক্মিণীর আনন্দের আর সীমা রইল না। রাজা ভীষ্মক সাদরে বলরাম ও কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে আনলেন।

পুরবাসীরা যখন আলোচনা করছেন যে রাজকন্যার সঙ্গে কৃষ্ণেরই বিবাহ হওয়া ভাল, তখন রুক্মিণী সেনা পরিবৃত হয়ে অম্বিকালয়ে যাত্রা করলেন। মহাদেবীর নিকটে উপনীত হয়ে রুক্মিণী প্রার্থনা করলেন, কৃষ্ণ যেন আমার পতি হন। রুক্মিণী তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। যে রাজারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর রূপ লাবণ্য দেখে মূর্ছাগ্রস্ত হলেন। রুক্মিণী তাঁর আঙুল দিয়ে অলক অপসরণ করতেই কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন এবং তিনি রথে আরোহণের উদ্যোগ করছেন দেখেই কৃষ্ণ সমস্ত রাজাদের সামনে

তাঁকে হরণ করলেন। নিজের গরুড়ধ্বজ রথে রুক্মিণীকে তুলে রাজাদের ব্যূহ ভেদ করে অকুতোভয়ে প্রস্থান করলেন।

জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বললেন, সিংহের ভাগ মৃগ এসে হরণ করছে! আমাদের মতো তেজস্বী রাজারা থাকতে একজন গোপ এসে রুক্মিণীকে নিয়ে গেল! এই বলে তাঁরা যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয়ে যাদব সেনার সম্মুখীন হলেন। ভীষণ যুদ্ধে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা বিধ্বস্ত ও পরাস্ত হয়ে ফিরে এসে শিশুপালকে বললেন, বিষন্ন হবার কোন কারণ নেই, তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। কাঠের তৈরি মেয়ে পুতুল যেমন নাচিয়ের ইচ্ছায় নাচে, মানুষও তেমনি সুখদুঃখের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের অধীন বলে সবাই যে যার রাজ্যে ফিরে গেলেন।—

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।

এবমীশ্বর তন্ত্রোঽয়মী-হতে সুখ-দুঃখয়োঃ ॥১০।৫৪।১২

কিন্তু রুক্মী সহ্য করতে না পেরে এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কৃষ্ণকে বিনাশ করে রুক্মিণীকে পুনরুদ্ধার না করে কুণ্ডিলপুরে ফিরবেন না। ভীষণ যুদ্ধে রুক্মীকে বধ করবার জন্য কৃষ্ণ যখন অসি হাতে নিলেন, তখন রুক্মিণী ভয় পেয়ে তাঁকে বললেন, আমার ভাইকে বধ কোরো না। এই কথায় কৃষ্ণ নিবৃত্ত হলেন এবং রুক্মীকে বন্ধন করে তাঁর মাথার কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে তাঁকে বিরূপ করে দিলেন। যাদব সেনাও রুক্মীর সেনাদল বিধ্বস্ত করে দিল।

বলরাম রুক্মীর এই দশা দেখে দুঃখিত হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, কৃষ্ণ, সুহৃৎকে বিরূপ করতে নেই। সুখ দুঃখ অপর কেউ দেয় না, মানুষ নিজের কর্ম ফলই ভোগ করে। বন্ধু বধযোগ্য দোষ করলেও তাকে বধ করা যায় না, শুধু ত্যাগ করা যায়। আর যে নিজের দোষেই হত, তাকে বধ করবে কেন!—

সুখ দুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান। ১০।৫৪।৩৮

বন্ধুর্বধার্হ দোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ॥ ১০।৫৪।৩৯

এতে রুক্মীর অপমানের আর সীমা রইল না। তিনি আর গৃহে প্রত্যাগমন করতে পারলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকাপুরে এনে যথাবিধানে তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। এই বিবাহে প্রতি গৃহে আনন্দোৎসব হয়েছিল।

প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুর বধ

শুক বললেন, রুদ্রের কোপানলে ভস্মীভূত হবার পর কামদেব কৃষ্ণকে আশ্রয় করে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হলেন। রূপে তিনি কৃষ্ণের মতোই হলেন। শম্বর নামে এক অসুর কামদেবকে শত্রু ভাবত বলে মায়ামূর্তি ধারণ করে সকলের অজ্ঞাতসারে দশ দিনেরও কম বয়স্ক প্রদ্যুম্নকে সূতিকা গৃহ থেকে অপহরণ করে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। যে বৃহৎ মৎস্যটি তাঁকে গ্রাস করে সেটি ধীবরের জালে আবদ্ধ হয়ে শম্বরের নিকটে আসে। পাচকরা তার উদরে একটি শিশুকে পেয়ে মায়াবতীকে দেয়। মায়াবতী নারদের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারেন। কামের পত্নী রতিই মায়াবতী নামে শম্বরের পাকশালায় নিযুক্ত ছিলেন। শিশুকে কামদেব জেনে তিনি যত্নে ও স্নেহে লালন করতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনে পদার্পণ করলে মায়াবতী সুরত প্রার্থনায় তাঁর নিকটে এলেন। প্রদ্যুম্ন বললেন, মাতৃভাব বিসর্জন করে তুমি কুলটা কামিনীর মতো আমার নিকটে এসেছ! রতি বললেন, তুমি কামদেব, কৃষ্ণের পুত্র হয়ে জন্মেছ। আর আমি তোমার পত্নী রতি। শম্বরাসুর তোমাকে হরণ করেছিল। তুমি অবিলম্বে তাকে বধ কর। এই বলে রতি প্রদ্যুম্নকে মহামায়া বিদ্যাদান করলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বরকে তিরস্কার করে যুদ্ধার্থে আহ্বান করলেন। শম্বর বিবিধ মায়ার প্রয়োগে প্রদ্যুম্নকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রদ্যুম্ন সমস্ত মায়া বিনাশ

করলেন এবং শম্বরের মস্তক ছেদন করলেন। তারপর তিনি রতিকে নিয়ে আকাশ পথে দ্বারকাপুরে উপনীত হলেন। রুক্মিণী তাঁকে দেখে ভাবলেন যে তাঁর পুত্র অপহৃত না হলে এতদিনে হয়তো এই রকমই হতেন। এমন সময় দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণও সেখানে এলেন। এই সময়েই দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে প্রদ্যুম্নের সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করলেন। দম্পতিকে আলিঙ্গন করে সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন।

স্যমন্তক উপাখ্যান

শুকদেব বললেন, ভক্ত সত্রাজিৎকে সূর্য সখার মতো ভাল বাসতেন এবং একদিন সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে স্যমন্তক নামে মণি দিলেন। সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করে দ্বিতীয় সূর্যের মতো তিনি দ্বারকাপুরে নিজের বাসস্থানে এলেন। দ্বারকাবাসী স্তম্ভিত হয়ে অক্ষক্রীড়ারত কৃষ্ণকে বললেন, সূর্য আপনাকে দেখবার জন্য আসছেন। কৃষ্ণ হেসে বললেন, না, উনি সূর্য নন। স্যমন্তক মণি ধারণ করে সত্রাজিৎ আসছেন। সত্রাজিৎ দেবমন্দিরে সেই মণিকে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তা নিত্য আট ভার সোনা প্রসব করতে লাগল। এই মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ রোগ শোক বা কোন প্রকার ভয় থাকে না। তাই এই মণি রাজা উগ্রসেনের নিকটেই রাখা কর্তব্য। এই বিবেচনা করে কৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকটে মণিটি চাইলেন। কিন্তু অর্থের লোভে সত্রাজিৎ তা দিলেন না।

একদিন সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন অশ্বারোহণে মৃগয়ার জন্য বনে গেলেন। একটি সিংহ তাঁকে অশ্বের সঙ্গে বধ করে মণি নিয়ে পর্বতের গুহায় প্রবেশ করল। ঋক্ষরাজ জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করে মণি আত্মসাৎ করে নিজের বাসভবন এক গিরিগুহায় বালককে তা খেলার জন্য দিলেন।

সত্রাজিৎ বললেন, কৃষ্ণ যখন এই মণি চেয়েছিলেন, তখন আমি তাঁকে এই মণি দিই নি। তিনিই আমার ভাই প্রসেনকে বধ করে

মণি আত্মসাৎ করেছেন। জনসাধারণের মুখ থেকে এই কথা কৃষ্ণের কানে গেল। তিনি লজ্জিত হয়ে এই অপযশ অপনোদনের জন্য অনেক লোক নিয়ে প্রসেনের অনুসন্ধানে বেরোলেন। বনের মধ্যে কিছু দূর গিয়েই সিংহের হাতে নিহত প্রসেন ও তাঁর অশ্বের মৃতদেহ দেখতে পেলেন এবং পর্বতে জাম্ববানের হাতে নিহত সিংহও সবাই দেখলেন। কৃষ্ণ তাঁর লোকজন গুহার বাহিরে রেখে একাকী ঋক্ষরাজের সেই অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করলেন এবং একটি বালককে সেই মণি নিয়ে খেলা করতে দেখে তার দিকে অগ্রসর হলেন। তার ধাত্রী চিৎকার করে উঠতেই জাম্ববান ছুটে এলেন এবং দুজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। আটাশ দিন তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর শ্রান্ত জাম্ববান বললেন, আমি বুঝতে পারছি যে আপনিই আদি পুরুষ বিষ্ণু। কৃষ্ণ তাঁকে মণির সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন, মণি হরণের অপবাদ দূর করার জন্যেই আমি এসেছি। জাম্ববান এই কথা শুনে সানন্দে সেই মণির সঙ্গে নিজের কন্যা জাম্ববতীকেও কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন।

এদিকে কৃষ্ণের লোকজন বারোদিন গুহার বাহিরে অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ গুহা থেকে নির্গত হন নি শুনে কৃষ্ণের আত্মীয় বন্ধুরা মা দুর্গার আরাধনা করলেন। তারপর জাম্ববতী ও স্যমন্তক মণি নিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে সকলে আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনের সভায় সত্রাজিৎকে ডেকে মণি সংগ্রহের বিবরণ জানিয়ে মণিটি তাঁকে ফেরত দিলেন। কৃষ্ণকে চুরির অপবাদ দেবার জন্য সত্রাজিৎ লজ্জিত হয়ে মণি নিয়ে অধোবদনে ফিরে গেলেন। তার পর নিজে উদ্যোগী হয়ে স্যমন্তক মণির সঙ্গে নিজের কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন। সত্যভামার রূপ-গুণের জন্য কৃতবর্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি অনেক যুবক তাঁর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। সত্রাজিৎ তাঁদের প্রার্থনা উপেক্ষা করলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করলেন, কিন্তু স্যমন্তক মণি নিলেন না। বললেন,

আপনার আর কোন সন্তান নেই বলে আমরাই যখন সব কিছুর উত্তরাধিকারী, তখন এ মণি আপনার কাছেই থাক।

শুক বললেন, পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়েছেন শুনে কৃষ্ণ যখন বলরামের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন, তখন অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধন্বার নিকটে এসে বললেন, সত্রাজিৎ সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে দিয়ে আমাদের অবমাননা করেছে, এই সুযোগে তাকে বধ করে তুমি মণি কেড়ে নিচ্ছ না কেন ? পাপমতি শতধন্বা মণির লোভে নিদ্রিত সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি নিয়ে পালালেন। পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর সত্যভামা হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃষ্ণকে এই সংবাদ দিলেন। শতধন্বাকে বধ করবার জন্য তাঁরা দ্বারকায় ফিরে এলেন। শতধন্বা জীবন রক্ষার জন্য কৃতবর্মার সাহায্য চাইলেন, কিন্তু কৃতবর্মা তা উপেক্ষা করলেন। শতধন্বা অক্রূরের সাহায্য চেয়েও নিরাশ হলেন। শেষ পর্যন্ত অক্রূরের নিকটে স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রেখে প্রাণভয়ে অশ্বারোহণে পলায়ন করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণও রথে আরোহণ করে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মিথিলার এক উপবনে প্রবেশ করে শতধন্বার শ্রান্ত অশ্ব মারা গেল এবং শতধন্বা পদব্রজে পালাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণও পদব্রজে তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু চক্রে তাঁর মস্তক ছেদন করেও তাঁর বস্ত্রের মধ্যে মণি পেলেন না। ফিরে এসে অগ্রজকে এই কথা বললে বলরাম তাঁকে দ্বারকায় গিয়ে মণি অন্বেষণ করতে বললেন এবং নিজে তাঁর প্রিয় জনকরাজার সাক্ষাতে গেলেন। তিনি যখন মিথিলাপতির আদরে বাস করছিলেন, তখন এই সুযোগে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সুযোধন বলরামের নিকটে গদা যুদ্ধ শিক্ষা করলেন।

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে সত্যভামাকে শতধন্বার নিধনবার্তা দিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্মা এই সংবাদ জেনে দেশান্তরে পলায়ন করলেন। অক্রূর দ্বারকা ত্যাগ করতেই নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ হল। অনাবৃষ্টি দেখে তত্ত্বদর্শীরা বিচার করলেন যে কাশী দেশে অনাবৃষ্টি

আরম্ভ হলে রাজা শ্বফল্ককে নিজের দেশে এনে নিজের কন্যা গান্দিনীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন এবং তার পর থেকেই প্রচুর বারি বর্ষণ হয়। অক্রূর এই শ্বফল্কের পুত্র এবং তাঁরই মতো প্রভাবশালী বলেই তাঁর অবর্তমানে এই অনাবৃষ্টি চলছে। প্রাচীনদের এই বিচার শুনে কৃষ্ণ দূত পাঠিয়ে অক্রূরকে ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, আমার অনুমান যে শতধন্বা পলায়ন করবার সময় স্যমন্তক মণি আপনার নিকটে গচ্ছিত রেখে গেছেন। এ মণি যদিও সত্যভামার পুত্রদের সম্পত্তি, তথাপি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক বলে এ মণি আপনার নিকটেই থাক। তবে আমার অগ্রজ এ কথায় বিশ্বাস করছেন না বলে আপনি একবার সবাইকে মণিটি দেখান। আপনার এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখেই আমি আমার অনুমানের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি। এই কথা শুনে অক্রূর তাঁর বস্ত্রের ভিতর থেকে মণিটি বার করে কৃষ্ণের হাতে দিলেন। কৃষ্ণ তা বলরাম প্রভৃতি জ্ঞাতিদের দেখিয়ে তাঁর মিথ্যা অপবাদ দূর করে সবার সামনে অক্রূরকেই আবার ফিরিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণের বহু বিবাহ

শুক বললেন, পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং দ্রুপদ রাজার গৃহে বাস করছেন জেনে কৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণে পরিবৃত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। কৃষ্ণ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম ও সমবয়সী অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন এবং কনিষ্ঠ নকুল ও সহদেব তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। নববধূ সুন্দরী দ্রৌপদীও লজ্জাবনত মুখে তাঁকে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ তাঁর পিসি কুন্তীকে প্রণাম করলে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না।

অর্জুন একদিন কৃষ্ণের সঙ্গে মৃগয়ার জন্য বনে গেলেন। যজ্ঞের জন্য মৃগ বধ করে কিঙ্করদের হাতে তা যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাঠিয়ে তাঁরা শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে যমুনার তীরে এলেন এবং যমুনায় স্নান ও

জলপান করে যখন তীরে উঠছিলেন তখন এক সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণের কথায় অর্জুন তাঁর পরিচয় জানতে গিয়ে শুনলেন যে তিনি সূর্যের কন্যা কালিন্দী, বিষ্ণুকে পতি রূপে পাবার জন্য এখানে উৎকট তপস্যা করছেন। তাঁরা সেই কন্যাকে রথে তুলে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আনলেন।

পাণ্ডবদের অনুরোধে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে একটি নগর নির্মাণ করিয়ে কৃষ্ণ কিছুকাল সেখানে বাস করলেন। অগ্নি যখন খাণ্ডব বন দগ্ধ করছিলেন তখন তিনি অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন এবং খাণ্ডব বাসী ময় দানব কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা করিয়ে দেন। এই ময় দানব পাণ্ডবদেব জন্য এমন এক অপূর্ব সভা নির্মাণ করেন যে দুর্যোধনের মতো বিচক্ষণ রাজারও জলে স্থল ভ্রম ও স্থলে জল ভ্রম হয়েছিল। এব পরে কৃষ্ণ যাদবদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে যথাবিধানে কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করেন।

এদিকে অবন্তীর রাজকন্যা মিত্রবিন্দা স্বয়ম্বরে কৃষ্ণকে বরণ করবার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পিসি রাজাধিদেবীর কন্যা কিন্তু দুর্যোধনের পরামর্শে তাঁর দুই ভাই বিন্দু ও অসবিন্দু বাধা দিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণ রাজাদের সামনেই সবলে মিত্রবিন্দাকে হরণ করেন।

কোশল রাজ্যের রাজা নগ্নজিৎ অযোধ্যায় বাস করতেন। তাঁর কন্যা সত্যা নাগ্নজিতী নামে অভিহিত ছিলেন। সাতটি গো বৃষকে পরাজিত করে তাঁর পাণিগ্রহণ করতে হবে। এই পণের কথা শুনে স্বয়ম্বর সভার কোন রাজা তাতে সক্ষম হলেন না। এই কথা শুনে কৃষ্ণ এসে রাজাকে বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাচ্ঞা করা নিন্দিত কর্ম, তবু আমরা শুল্ক প্রদানে বিবাহ করি না বলে আপনার কন্যাকে আমি যাচ্ঞা করছি। রাজা নগ্নজিৎ বললেন, এই সাতটি দুর্দান্ত গো বৃষকে আয়ত্ত করতে না পেরে অনেক রাজপুত্র হতমান হয়েছেন। এদের যদি আপনি নিগৃহীত করতে পারেন, তবেই আপনি কন্যার

বর নিরূপিত হবেন। কৃষ্ণ রাজার এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনেই এক সঙ্গে সাতটি বৃষকে আক্রমণ করলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাদের বন্ধন করে টেনে আনলেন। রাজা তাঁর কন্যা সত্যাকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন এবং কৃষ্ণ তাঁকে বিধিবৎ বিবাহ করলেন। রাজা তাঁকে দশ হাজার ধেনু ও তিন হাজার যুবতী দাসী উপহার দিলেন। এ ছাড়াও তাঁকে অসংখ্য হাতী ঘোড়া রথ ও সৈন্য দিয়ে দম্পতিকে বিদায় দিলেন। কৃষ্ণ বধূর সঙ্গে এত ঐশ্বর্য নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করছেন শুনে হতমান রাজারা পথে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন। বন্ধু অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনু নিয়ে ভয় দেখাতেই রাজারা পলায়ন করলেন।

কৃষ্ণ তাঁর পিসি শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকেও তাঁর ভাই সন্তর্দন প্রভৃতির অনুরোধে বিবাহ করেন। ইনি কেকয় দেশে জন্মেছিলেন বলে কৈকেয়ী নামে অভিহিত হতেন। তিনি মদ্র দেশের রাজকন্যা লক্ষণাকেও স্বয়ম্বর সভা থেকে একাকী হরণ করেছিলন এবং ভূমির পুত্র নরকাসুরকে বধ করে তাঁর অন্তঃপুর থেকে সহস্র বণিতা সংগ্রহ করেছিলেন।

নরকাসুর বধ

পরীক্ষিৎ বললেন, যে নরকাসুর এত রাজকন্যা এনে নিজের অন্তঃপুরে রেখেছিল, তাকে কৃষ্ণ কী ভাবে বধ করেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

শুক বললেন, ভৌম নরকাসুর বরুণের ছত্র, অদিতির কুণ্ডল ও অমরাদ্রি হরণ করেছেন, ইন্দ্রের নিকটে এই কথা জেনে কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে তাঁর রাজধানী প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে এলেন। সেখানে তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনে পরিখার জল থেকে মুর নামের পঞ্চশির দৈত্য উত্থিত হয়ে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্রে সবকটি মস্তক ছেদন করলেন। পিতার মৃত্যুর পর তার সাতটি পুত্র নরকাসুরের আদেশে

চমূপতি পীঠকে অগ্রবর্তী করে যুদ্ধ করতে এল। কৃষ্ণ তাদের সকলকে যমালয়ে পাঠালেন। এরপর ক্রুদ্ধ নরকাসুর নিজে কৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ তাঁর চক্রে নরকের মস্তকও ছেদন করলেন।

নরকের জননী ভূমি বরুণের ছত্র অদিতির কুণ্ডল প্রভৃতি কৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর স্তব করলেন, বললেন, ভৌমের পুত্র ভগদত্ত আপনার ভয়ে নিতান্ত কাতর হয়েছে। আপনি তাকে প্রতিপালন করুন। কৃষ্ণ ভগদত্তকে অভয় দিয়ে ভৌমের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং নরকাসুর যে সব রাজকন্যাকে এনে নিজের গৃহে অবরুদ্ধ রেখেছিল, সেই ষোল হাজার একশো রাজকন্যাকে দেখলেন। কৃষ্ণকে কারাগৃহে দেখে রাজকন্যারা তাঁকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের দ্বারাবতীতে পাঠালেন।

পারিজাত হরণ

এরপর কৃষ্ণ অমরাবতী পুরীতে গিয়ে দেবমাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল প্রদান করলেন। শচীর সঙ্গে ইন্দ্র তাঁর পূজা করলেন। কিন্তু সত্যভামার অনুরোধে তিনি যখন পারিজাতের গাছটি উপড়ে গরুড়ের পিঠে রাখলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে বিষম বিবাদ বাধল। কিন্তু তিনি সকলকে পরাজিত করে পারিজাতের গাছটি দ্বারকায় আনলেন এবং সত্যভামার গৃহে উদ্যানে রোপণ করলেন। তিনি এখানে এসেই সেই ষোল হাজার একশো নারীর পাণিগ্রহণের জন্য সকলের গৃহে উপস্থিত হয়ে যথাবিধানে বিবাহ করেন।

রুক্মিণী ও কৃষ্ণের প্রণয় কলহ

শুক বললেন, একদিন রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ পালঙ্কের উপরে শুয়ে ছিলেন এবং সখী পরিবৃত রুক্মিণী চামর হাতে তাঁকে বীজন করছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ বললেন, অনেক রাজা তোমাকে পেতে চেয়েছিলেন এবং তোমার ভাই ও পিতাও তাঁদের হাতে তোমাকে দিতে রাজী

ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে উপেক্ষা করে আমার মতো অনুপযুক্ত লোককে কেন বরণ করলে? জরাসন্ধের ভয়ে আমি দেশ ত্যাগ করে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে বাস করছি, বলবানদের সঙ্গে কলহ করে চিরকাল রাজ্যচ্যুত রইলাম। আমাদের কোন ধন সম্পত্তি নেই, নিঃস্ব ব্যক্তির সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক। সমকক্ষের মধ্যেই বিবাহ সম্পর্ক ভাল। আমার মনে হয় কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কেই তোমার পতি রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। দুষ্টের অসঙ্গত তেজ আমি সহ্য করতে পরি না বলেই তোমাকে হরণ করে এনেছি। ভোগ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বলে নারী লাভের কামনা নিয়ে তোমাকে আনি নি।

কৃষ্ণের সঙ্গলাভে রুক্মিণী কিছু অভিমানিনী হয়েছিলেন, নিজেকে তিনি অন্যের চেয়ে কৃষ্ণের বেশি প্রিয় পাত্রী বলে ভাবতেন। তাঁর এই অভিমান চূর্ণ করবার জন্যই কৃষ্ণ এই পরিহাস করলেন। কিন্তু রুক্মিণী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমাব কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি কী বল তাই শোনবার জন্য আমি পরিহাস করছিলাম। আমি তোমার প্রণয় কোপে মুখের শোভা দেখতে চেয়েছিলাম।

রুক্মিণী তখন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার কোন অংশে তুলনা হয় না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার মতো প্রণয়ী পত্নী আমি আর দ্বিতীয় দেখি না।

রুক্মী বধ

শুক বললেন, কৃষ্ণের পত্নীরা প্রত্যেকে দশটি করে পুত্র প্রসব কবেছিলেন। তাঁরা রূপে ও গুণে পিতার মতোই ছিলেন। কৃষ্ণের নিকটে পরাস্ত হয়ে যে রুক্মী ভোজকট নামে পুবীতে বাস করছিলেন, তাঁর কন্যা রুক্মবতীর সঙ্গে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। অনিরুদ্ধ এঁদের পুত্র।

পরীক্ষিৎ বললেন, রুক্মী তাঁর শত্রু কৃষ্ণের পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ কেন দিয়েছিলেন ?

শুক বললেন, নিজের ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতি বর্ধনের জন্যই এই বিবাহ দিয়েছিলেন। কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় রুক্মবতী প্রদ্যুম্নকে পতিত্বে বরণ করলে অন্যান্য রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁদের পরাজিত করে রুক্মবতীকে হরণ করেন। রুক্মিণীর কন্যা চারুমতীর বিবাহ হয় কৃতবর্মার পুত্র বলীর সঙ্গে। রুক্মী তাঁর ভগিনীর মঙ্গল ও তুষ্টির জন্য নিজের পৌত্রী রোচনাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের হাতে সম্প্রদান করেন। এই বিবাহের উৎসবে রুক্মিণী বলরাম কৃষ্ণ সাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবরা অনেকেই ভোজকটপুরে গিয়েছিলেন। বিবাহের উৎসব শেষ হলে কলিঙ্গের রাজা প্রভৃতি কয়েকজন গর্বিত রাজা ইঙ্গিতে রুক্মীকে বলেন দ্যূতক্রীড়ায় বলরামকে পরাজিত করতে। বলরাম পাশা খেলায় অনভিজ্ঞ হলেও খুব উৎসাহী ছিলেন এবং প্রথমে শত সহস্র ও পরে হাজার ও দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পণ রেখে হারতে থাকেন। এর জন্য কলিঙ্গের রাজা দাঁত বার করে বলরামকে উপহাস করেন। এই হাসি সহ্য করতে না পেরে বলরাম একসঙ্গে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ রেখে জয়লাভ করেন, কিন্তু রুক্মী শঠতা করে বলেন যে তাঁরই জয় হয়েছে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম দশ কোটি মুদ্রা পণ রেখে খেলেন এবং তাঁরই জয় হয়। কিন্তু এবারেও রুক্মী ছলনা করে বলেন যে তাঁরই জয় হয়েছে এবং পার্শ্বিকগণকে সাক্ষী মানে। রুক্মীর কথা শেষ হতেই আকাশবাণী হয় যে বলরামেরই জয় হয়েছে এবং রুক্মীর কথা মিথ্যা। কিন্তু রুক্মী দুষ্ট রাজাদের কুপরামর্শে বলরামকে উপহাস করে বলেন, অক্ষ রাজার খেলা এবং তাঁরাই অক্ষ দিয়ে ক্রীড়া ও বাণ দিয়ে বিক্রম প্রকাশ করেন। আপনারা তো বনবাসী পশু পালকের জাত, এ খেলায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রুক্মীর এই তিরস্কারে ও রাজাদের উপহাসে ক্রুদ্ধ

বলরাম তাঁর লোহার পরিখ দিয়ে রাজসভার মধ্যেই রুক্মীকে বধ করলেন এবং পলায়নপর কলিঙ্গ রাজাকে আক্রমণ করে তাঁর দাঁত ভেঙে মাটিতে ফেললেন। অন্যান্য রাজারাও আহত হয়ে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করলেন। কৃষ্ণ ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভাল বললে রুক্মিণীর দুঃখ হবে এবং মন্দ বললে বলরাম ক্ষুণ্ন হবেন। তাই তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন। অনিরুদ্ধ ও নববধূ চারুমতীকে নিয়ে তাঁরা ভোজকটপুর থেকে রথারোহণে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, শুনেছি অনিরুদ্ধ বাণ রাজার কন্যা ঊষাকে বিবাহ করেন এবং এর জন্য হরি-হরের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

শুক বললেন, বলির একশো পুত্রের মধ্যে বাণই জ্যেষ্ঠ। তিনি মহাদেবের পরম ভক্ত, সত্য পরায়ণ ও দৃঢ়ব্রতধারী বলে পরিচিত ছিলেন। শোণিতপুরে তাঁর রাজ্য ছিল এবং মহাদেব যখন তাণ্ডব নৃত্য করতেন, তখন বাণ তাঁর সহস্র হাতে বাদ্যধ্বনি করতেন। একদিন তিনি মহাদেবকে বললেন, আপনার প্রসাদে আমি সহস্র বাহু হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধের সাধ আমার মেটে নি। আপনি অনুগ্রহ করে একদিন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। বাণের এই গর্বোক্তি শুনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার তুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হবে।

বাণের এক কন্যা ছিল, তার নাম ঊষা। বিবাহের পূর্বে ঊষা একদিন স্বপ্নে এক অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষের সঙ্গে রতি লাভ করেন এবং স্বপ্নেই তিনি 'কান্ত, কোথায় গেলে' বলে জেগে উঠেই সখীদের দেখে লজ্জিত হলেন। মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা সখী চিত্রলেখা বললেন, তোমার কান্তকে তো আমরা চিনি না। আমি ছবি আঁকছি, তুমি তোমার বর চিনে নাও। বলে দেবতা গন্ধর্ব ও মানুষের মধ্যে কৃষ্ণ

প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রভৃতি অনেকের প্রতিকৃতি আঁকলেন। অনিরুদ্ধের ছবি দেখে তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, স্বপ্নে আমি এঁকেই দেখেছি। চিত্রলেখা তাঁকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বলে জেনে যোগবলে আকাশপথে দ্বারকা গিয়ে অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে এনে উষাকে দেখালেন। উষা তাঁকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রেখে তাঁর সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন। কিছুকাল পর একদিন অন্তঃপুর রক্ষীরা উষার গর্ভধারণের লক্ষণ দেখে তাঁর কল্যাণব্রত ভঙ্গ হয়েছে বুঝতে পেরে রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা বাণ উদ্বিগ্ন হয়ে কন্যার ভবনে গিয়ে অনিরুদ্ধকে উষার সঙ্গে পাশা খেলতে দেখলেন। বাণের সঙ্গে সৈন্য দেখে অনিরুদ্ধ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাণ নাগপাশে অনিরুদ্ধকে বন্ধন করলেন।

এদিকে অনিরুদ্ধকে না দেখে তাঁর আত্মীয়রা বর্ষার জন্য চার মাস গৃহে অপেক্ষা করলেন। তারপর নারদের মুখে তাঁর সংবাদ পেয়ে শোণিতপুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন সাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ বারো অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে শোণিতপুর অবরোধ করলেন। বাণের সাহায্যের জন্য সপুত্র রুদ্র যুদ্ধ স্থলে এলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে রুদ্রের, প্রদ্যুম্নের সঙ্গে কার্তিকেয়র এবং সাত্যকির সঙ্গে বাণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। পরে বাণ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং এক সময়ে পলায়ন করলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রজ্বরের উৎপাদন করতে সেই ত্রিশির ও ত্রিপাদ রুদ্রজ্বর কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। কৃষ্ণ তাই দেখে বিষ্ণুজ্বর উৎপাদন করে যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন। বিষ্ণুজ্বরের নিকটে মাহেশ্বরজ্বর পরাজিত হয়ে কৃষ্ণের স্তব করল। কৃষ্ণ বললেন, তোমার আর ভয় নেই। তারপর বাণ আবার যুদ্ধ করতে এলে কৃষ্ণ তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করলেন এবং তাঁর মস্তক ছেদন করবার জন্য যখন বাণকে অন্বেষণ করছেন তখন, ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য মহাদেব কৃষ্ণের সামনে এসে স্তব করে বললেন, বাণ আমার অনুগত সেবক, তাকে আমি অভয়

দিয়েছি। আপনি এর প্রতি প্রসন্ন হলে আমার অভয় বর সত্য হয়। কৃষ্ণ বললেন, আমি আপনার প্রিয় সাধনই করব। বাণ অসুর হলেও তার আর কোন ভয় নেই, এখন থেকে সে নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করবে। অভয় লাভ করে বাণ অনিরুদ্ধ ও উষাকে রথে চড়িয়ে কৃষ্ণের নিকটে আনলেন। কৃষ্ণ তাঁদের নিয়ে দ্বারকাপুরে যাত্রা করলেন।

রাজা নৃগের উপাখ্যান

শুক বললেন, একদিন প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবংশের বালকেরা ক্রীড়ার সময়ে উপবনের একটি জনশূন্য কূপের মধ্যে একটি বৃহৎ কৃকলাস দেখতে পান। অনেক চেষ্টা করেও তা কূপ থেকে তুলতে না পেরে তাঁরা কৃষ্ণকে এই কথা বলেন। কৃষ্ণ তাকে বাম হাতে উপরে তুলতেই কৃকলাস এক সুপুরুষে পরিণত হল। কৃষ্ণ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা নৃগ। পৃথিবীতে যত বালুকণা বা আকাশে যত তারা অথবা বৃষ্টিধারার মতো অসংখ্য গাভী আমি ব্রাহ্মণকে, দান করেছিলাম। একবার এক ব্রাহ্মণের একটি গাভী বন্ধন মুক্ত হয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে আমার গাভীর সঙ্গে মিলে যায় এবং তা অন্যের গাভী বলে না জেনে আমি আর একজন ব্রাহ্মণকে তা দান করি। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ যখন সেটি নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই গাভীর প্রকৃত স্বামী বলেন যে সেটি তাঁর। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বলেন যে এই গাভী রাজা আমাকে দিয়েছেন। তাই এতে আমার অধিকার। তাঁরা পরস্পর বিবাদ, করে আমার নিকটে এলে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। একজনের গাভী অপরকে দান করলে অপহরণ করা হয়, আবার দান করে ফিরিয়ে নেওয়াও দোষের। তাই তাঁদের বললাম, এর পরিবর্তে আমি লক্ষ গাভী দিচ্ছি। আমি না জেনে এই কাজ করেছি, আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করুন। ব্রাহ্মণেরা ভাবলেন যে গোদান গ্রহণ অবিধেয় এবং তার পরিবর্তে অন্য গাভী গ্রহণ আরও

দোষের। বিক্রীত গাভী বিক্রয়কারীকে রৌরব নরকে নিপাতিত করে। তাই গো-স্বামী বললেন, গাভীর বিনিময়ে লক্ষ গাভী আমি নিতে পারি না। বলে নিজের গাভী নিয়ে তিনি চলে গেলেন। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বললেন, যে গাভী আমাকে দান করেছেন, তার বিনিময়ে গাভী নিলে আমার গো-বিক্রয়ের পাপ হবে। বলে তিনিও চলে গেলেন। এর পর আমার মৃত্যু হলে যমদূতেরা আমাকে যম-রাজের নিকটে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার পাপ সামান্য, কিন্তু পুণ্য অনেক। তুমি আগে কার ফল ভোগ করতে চাও? আমি আগে পাপের ফল ভোগ করলে কৃকলাস হয়ে জন্মালাম। কিন্তু আমার পূর্ব স্মৃতি লুপ্ত হয় নি বলে আপনার দর্শনের জন্যই এই কূপে পড়েছিলাম। আপনার স্পর্শে আজ আমার মুক্তি হল। এই বলে তিনি বিমানে স্বর্গে গেলেন।

কৃষ্ণ তাঁর পরিজনদের বললেন, ব্রহ্মস্ব হরণ খুবই গর্হিত কাজ। বিষের মতো তার কোন প্রতিকার নেই।

বলরামের যমুনা আকর্ষণ

শুক বললেন, বলরাম নন্দ প্রভৃতি আত্মীয়দের দেখবার জন্য রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গেলেন। তাঁরা তাঁকে পেয়ে প্রেমে মুগ্ধ হলেন। বলরাম নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ নিলেন। তারপর একে একে সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সুখে আছ তো? আমাদের কি আর মনে পড়ে! গোপীরা বললেন, কৃষ্ণ কুশলে আছেন তো? তাঁর কথা বিশ্বাস করেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

বলরাম রাত্রে গোপীদের প্রীতি বর্ধন করে মধু ও মাধব অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ মাস ব্রজপুরেই কাটালেন। বরুণ তাঁর কন্যা বারুণীকে সেখানে পাঠালেন। বারুণী মদিরা রূপে বৃক্ষের কোটর থেকে ক্ষরিত হয়ে সমস্ত উপবন আমোদিত করলেন। গোপীদের সঙ্গে বলরাম

পর্যাপ্ত মদিরা পান করে জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে নিজের নিকটে ডাকলেন। যমুনা তাঁকে মত্ত মনে করে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তিনি ক্রোধে তাঁর হলাগ্রে যমুনাকে আকর্ষণ করে বললেন, তোমার স্রোত আমি শতধা বিভক্ত করব। যমুনা সভয়ে তাঁর নিকটবর্তী হলে গোপী পরিবৃত হয়ে তিনি জলক্রীড়া করলেন। সেই অবধি যমুনার স্রোত দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে।

পৌণ্ড্রক বধ ও বারাণসী দহন

শুক বললেন, বলরাম যখন নন্দব্রজে গেছেন, তখন করূষ দেশের রাজা পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন যে তিনিই জগতের জীবকে অনুগ্রহ করবার জন্য বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কৃষ্ণকে এই নাম পরিত্যাগ করতে হবে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন ত্যাগ না করলে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। কৃষ্ণ পরিহাস ছলে দূতকে বললেন যে তাঁর সব চিহ্নই তিনি পরিত্যাগ করাবেন। বলে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পৌণ্ড্রক তখন কাশীতে ছিলেন। দূতের মুখে এই উত্তর শুনে তিনি দুই অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। কাশীপতিও তাঁকে সাহায্যের জন্য তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে অনুসরণ করলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌণ্ড্রককে বাসুদেব মূর্তিতে সজ্জিত দেখলেন। তাঁর সেনা নানাবিধ অস্ত্রে কৃষ্ণকে প্রহার করতে আরম্ভ করল। কৃষ্ণ সবাইকে বিপন্ন করে পৌণ্ড্রককে বললেন, তুমি আমাকে যে অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করতে বলেছিলে, তা আমি তোমার উপরেই প্রয়োগ করছি। এই বলে চক্রে তাঁর মস্তক ছেদন করলেন এবং তাঁর মিত্র কাশীরাজের মস্তক বাণে ছিন্ন করে কাশীতে নিপাতিত করলেন। তারপর দ্বারকায় ফিরে গেলেন। পৌণ্ড্রক শত্রু ভাবে নিত্য কৃষ্ণের চিন্তা করতেন বলে মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুলোকে গেলেন।

এদিকে কাশীর দ্বারদেশে রাজার ছিন্ন মস্তক দেখে পুরবাসী

রোদন করতে লাগল। তাঁর পুত্র সুদক্ষিণ পিতার ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে পিতৃহন্তাকে বধ করে পিতৃঋণ মুক্ত হবার প্রতিজ্ঞা করলেন। আরাধনায় মহাদেবকে তুষ্ট করে এই বর চাইলে তিনি বললেন, শত্রু মারণোক্ত প্রণালী অনুসরণ করে ঋত্বিকের সাহায্যে দক্ষিণাগ্নির আরাধনা কর, কিন্তু ব্রহ্মণ্য জনে তা প্রয়োগ করলে বিপরীত ফল হবে। এই আদেশ পেয়ে সুদক্ষিণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। অগ্নিকুণ্ড থেকে শ্মশ্রুধারী হুতাশন উত্থিত হলেন এবং প্রমথ পরিবৃত হয়ে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ তখন সভায় বসে পাশা খেলছিলেন। জনগণের ব্যাকুল ধ্বনি শুনে তিনি বললেন, ভয় নেই এবং সুদর্শন চক্রকে আদেশ করতে তা কৃত্যাগ্নিকে প্রতিহত করল। কৃত্যাগ্নি বারাণসীতে ফিরে এসে সুদক্ষিণ ও তাঁর ঋত্বিকদের দগ্ধ করলেন। সুদর্শন চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করে সমস্ত ভস্মসাৎ করল।

বলরামের দ্বিবিদ বিনাশ

পরীক্ষিৎ বললেন, বলরামের কীর্তি শোনবার জন্যেও আমার আগ্রহ হচ্ছে।

শুক বললেন, নরকাসুরের সখা দ্বিবিদ নামে এক বানর সুগ্রীবের সচিব ছিল। সে নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আগুন দিয়ে দেশ ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে লাগল। দ্বারকার নিকটবর্তী আনর্ত প্রভৃতি গ্রাম বিনষ্ট করল। রৈবতক পর্বতে গান শুনে সে সেখানে গিয়ে ললনা পরিবৃত বলরামকে দেখতে পেল। তিনি বারুণী মদিরা পান করে মত্ত হয়ে গান করছিলেন। সেই বানর বলরামের তরুণী পত্নীদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে পাথর ছুঁড়লেন। কিন্তু দ্বিবিদ কৌশলে মদিরার কলস নিয়ে পলায়ন করল এবং দূরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল। তারপর ফিরে এসে নারীদের পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে ছিঁড়ে বিব্রত করতে লাগল।

বলরাম তাঁর মুষল ও হল নিয়ে দাঁড়াতেই দ্বিবিদ একটা শালগাছ নিয়ে তাঁর মাথায় আঘাতের চেষ্টা করল। দুজনের তুমুল যুদ্ধ হল এবং যুদ্ধে রক্ত বমন করে বানর নিহত হল।

বলরামের হস্তিনাপুর আকর্ষণ

শুক বললেন, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর সভায় জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব সর্বসমক্ষে লক্ষণাকে স্ববলে হরণ করেন। দুর্যোধন কুপিত হয়ে বললেন, এই দুর্বিনীত বালক কন্যার অনিচ্ছায় তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। একে বন্ধন কর। পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি ছয়জন সাম্বকে বন্ধন করতে যাত্রা করলেন। সাম্ব কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হলেন। কিন্তু ছয়জন তাঁকে রথচ্যুত করে বন্ধন করলেন এবং লক্ষণার সঙ্গে সাম্বকে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

দেবর্ষি নারদ এসে সাম্বের বন্ধন বার্তা বৃষ্ণিদের দিলেন। উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে বৃষ্ণিগণ যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু কলহের উপশম করাই বলরামের স্বভাব। তিনি তাঁদের নিরস্ত্র করে নিজে রথে আরোহণ করে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। হস্তিনাপুরে এসে অকস্মাৎ শত্রুপুরীতে প্রবেশ না করে কৌরবদের অভিপ্রায় জানবার জন্য উদ্ধবকে পাঠালেন। উদ্ধব গিয়ে বলরামের আগমন বার্তা জানালেন। তাঁরা উপায়ন হাতে বলরামের নিকটে এসে অর্ঘ্যাদি দিলেন। বলরাম বললেন, রাজা উগ্রসেন বলেছেন যে আপনারা ছয়জন মিলিত হয়ে একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং অধর্মাচরণ করে বালক সাম্বকে বন্ধন করেছেন। কুরু ও যাদব কুলের মধ্যে বন্ধুতা রক্ষা হোক, এই আমার অভিপ্রায়। তাই বলছি যে সাম্বকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। বলরামের এই কথা শুনে কুরুগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, পায়ের জুতোও দেখছি মাথায় উঠতে চাইছে। কুন্তীর বিবাহে বৃষ্ণিদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়েছে,

এখন এরা আমাদের সমকক্ষ ভাবছে! এই ভাবে কটু কথা বলে তাঁরা পুরীতে প্রবেশ করলেন এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন বলরাম। ভাবলেন যে আজই তিনি পৃথিবী কৌরব শূন্য করবেন। এই ভেবে হস্তিনাপুর নগরকে উৎপাটন করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করবার অভিপ্রায়ে তিনি লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে আকর্ষণ করলেন। এই আকর্ষণে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত ও জলযানের মতো ঘূর্ণায়মান হস্তিনানগরকে অবলোকন কবে কৌরবগণ ভয়ে কাতর হলেন এবং জীবন রক্ষার জন্য নববধূ লক্ষণার সঙ্গে সাম্বকে বলরামের নিকট এনে তাঁর স্তব করে বললেন, আমরা আপনার শরণাগত, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। বলরাম বললেন, তোমাদের আর ভয় নেই। এর পর দুর্যোধন বারো শো হাতী অযুত ঘোড়া ছ' হাজার রথ ও সহস্র দাসী উপায়ন রূপে প্রদান করলে বলরাম সবাইকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। হস্তিনাপুর এখনও গঙ্গার দিকে দক্ষিণ ভাগে উন্নত দেখা যায়।

কৃষ্ণের গার্হস্থ্য লীলা

শুক বললেন, একটি মাত্র দেহ নিয়ে কৃষ্ণ কীভাবে তাঁর ষোল হাজার স্ত্রীর সঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করছেন, তা দেখবার জন্য দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় এলেন। কৃষ্ণের অন্তঃপুর রচনায় বিশ্বকর্মা অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নারদ কৃষ্ণের একজন পত্নীর গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে রুক্মিণী কৃষ্ণকে বীজন করছেন। দেবর্ষিকে দেখতে পেয়েই কৃষ্ণ উঠে তাঁকে প্রণাম করলেন। বললেন, আপনার কী কাজ করতে পারি বলুন। নারদ বললেন, আপনার চরণে যেন আমার স্মৃতি থাকে। বলে অন্য এক পত্নীর গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে কৃষ্ণ অন্য এক স্ত্রীকে নিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। নারদকে আসতে দেখে এই যেন প্রথম দেখা হল এমনি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন, আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন এবং

আপনার অভিপ্রায় জানিয়ে আমাদের জন্ম সার্থক করুন। নারদ বিস্মিত হয়ে তুষ্ণীম্ভাবে অন্য গৃহে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ এক এক গৃহে এক এক ভাবে বিচরণ করছেন দেখে নারদ বিস্মিত হলেন। বললেন, আজ আমি আপনার যোগৈশ্বর্য প্রত্যক্ষ করলাম। আপনি অনুমতি দিন, আমি আপনার লীলা গান করে ত্রিভুবনে পর্যটন করি। বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন

শুক বললেন, কৃষ্ণ ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে অবগাহন স্নান করতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আহ্নিক কৃত্যাদি শেষ করে তাঁর সুধর্মা নামের সভায় আসতেন। যদুগণে পরিবৃত হয়ে সভার শ্রেষ্ঠ আসনে তিনি উপবেশন করলে উপমন্ত্রীরা হাস্যরস ইন্দ্রজাল গীতবাদ্য প্রদর্শন করে, নর্তকীরা নৃত্য করে এবং সূত মাগধ ও বন্দীরা স্তব করে তাঁর আনন্দ বর্ধন করতেন। ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করতেন।

এইভাবে বহুকাল গত হবার পরে একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি সভায় এলেন এবং নমস্কার করে জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের দুঃখের বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। মহা ভৈরব নামে এক যজ্ঞে তিনি দুই অযুত রাজাকে বলি দেবেন বলে গিরিব্রজ দুর্গে বন্দী করে রেখেছেন। সেই রাজারাই দূত পাঠিয়ে বলেছেন, আমাদের মুক্তির বিধান করুন।

ঠিক এই সময়েই দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন সানুচর। কৃষ্ণ উঠে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আপনি এলে আমাদের লাভ হয়, ত্রিভুবনের কুশল জানতে পারি। পাণ্ডবদের কথাও আপনি বলুন। নারদ বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ চক্রবর্তী হবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। এই যজ্ঞে আপনাকে দেখবার জন্য সকলে সমবেত হবেন। এ কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে খুশী হলেন এবং উদ্ধবকে বললেন, তুমি আমাদের সুহৃৎ ও পরামর্শদাতা, তুমি যা

বলবে আমরা তাই করব। উদ্ধব বললেন, তোমার পিসির পুত্রের রাজসূয় যজ্ঞে যেমন তোমার সাহায্য করা কর্তব্য, তেমনি শরণাগত রাজাদের রক্ষা করাও উচিত। যুধিষ্ঠিরের দিগ্বিজয়ে জরাসন্ধের পরাজয় হলে দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের এখন ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া কর্তব্য। ভীম ছাড়া আর কেউ জরাসন্ধ বধ করতে সক্ষম হবেন না। তাঁর একেশো অক্ষৌহিণী সেনা আছে বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ সমাচীন নয়। তিনি ব্রাহ্মণ ভক্ত বলে তাঁকে ব্রাহ্মণের বেশেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। এই সময়ে তুমি নিকটে দাঁড়িয়ে থাকলেই তোমার যশ বিস্তার হবে। কৃষ্ণ এই মন্ত্রণা শুনে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। দেবর্ষি নারদ আকাশ পথে প্রস্থান করলেন এবং কৃষ্ণ রাজদূতকে বললেন, রাজাদের বোলো যে তাঁদের কোন ভয় নেই, জরাসন্ধকে আমি বধ করাব। এই কথা শুনে রাজদূতও প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণ তাঁর সৈন্যসামন্ত ও পরিবারে পরিবৃত হয়ে যাত্রা করলেন। আনর্ত সৌবীর মরু ও কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী উত্তীর্ণ হয়ে পাঞ্চাল ও মৎস্য দেশও পেরিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হলেন। তাঁর আগমনে সকলেই আনন্দিত হয়ে যথোচিত সম্বর্ধনা করলেন।

পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় ও জরাসন্ধ বধ

শুক বললেন, একদিন যুধিষ্ঠির তাঁর সভায় কৃষ্ণকে বললেন, আমি রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের অর্চনা করতে চাই, তার ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, এ তোমারই উপযুক্ত কাজ। তার আগে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে পৃথিবী নিজেব বশীভূত কর। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের দিগ্বিজয়ে নিয়োজিত করলেন—সহদেবকে দক্ষিণ দেশ, নকুলকে পশ্চিম দেশ, অর্জুনকে উত্তর দিক ও ভীমকে পূর্ব দিক জয় করতে পাঠালেন। অল্পকাল পরেই তাঁরা রাজাদের পরাজিত করে

যজ্ঞের জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধনরত্ন এনে দিলেন। কিন্তু যজ্ঞের প্রধান প্রতিবন্ধক জরাসন্ধকে বিদ্যমান দেখে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল ছিলেন। তাই দেখে কৃষ্ণ তাঁকে জরাসন্ধ বধের উপায় বললেন এবং ভীম অর্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজনেই ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের গিরিব্রজ দুর্গে গেলেন।

তাঁরা জরাসন্ধকে বললেন, আমরা অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি। আপনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। জরাসন্ধ সেই ছদ্মবেশে-ধারীদের আকৃতি কণ্ঠস্বর ও জ্যার আঘাত চিহ্ন প্রভৃতি দেখে প্রচ্ছন্ন ক্ষত্রিয় বলে বুঝতে পেরে বললেন, তোমরা যখন ব্রাহ্মণের বেশে আমার নিকটে ভিক্ষার্থী হয়েছ, তখন তোমরা আমার দেহ প্রার্থনা করলেও আমি তা দেব। কৃষ্ণ বললেন, আমরা আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য এখানে এসেছি। ইনি ভীম, ইনি অর্জুন, আর আমি কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের এই কথা শুনে জরাসন্ধ উচ্চস্বরে হেসে বললেন, যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই তোমাদের সাধ হয় তবে আমি তাতেই রাজী আছি। কিন্তু তোমার মতো ভীরুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তুমি তো আমার ভয়ে মথুরা থেকে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছ। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে আবার পালিয়ে যাবে। অর্জুন আমার চেয়ে বয়সে ছোট আর সমান বলবানও নয়, তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে কোন পৌরুষ নেই। তাই ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করাই আমার উচিত। বলে ভীমকে একটা গদা দিয়ে নিজেও গদা হাতে নিয়ে পুরীর বাহিরে মল্লভূমে এসে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। গদা চূর্ণ হবার পর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হল এবং কেউই পরাস্ত হলেন না বলে যুদ্ধ চলতেই লাগল।

দিনে তাঁরা যুদ্ধ করতেন এবং রাতে পরম সুহৃদের মতো চারজনেই একত্রে অবস্থান করতেন। এইভাবে সাতাশ দিন অতিবাহিত হবার পরে ভীম কৃষ্ণকে বললেন, জরাসন্ধকে পরাজিত করা আমার পক্ষে

একান্ত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কী ভাবে জরাসন্ধ বধ করা যায় তা চিন্তা করে কৃষ্ণ স্থির করলেন যে শৈশবে দেহের দুটি অংশ জুড়ে যখন জরাসন্ধ জীবিত হয়েছেন তখন তাঁকে আবার দ্বিখণ্ডিত করেই বধ করা সম্ভব হবে। তাই তিনি দুজনের যুদ্ধের সময়ে ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বৃক্ষের শাখা দু হাতে চিরে জরাসন্ধকেও দ্বিখণ্ডিত করার ইঙ্গিত করলেন। ভীম কৃষ্ণের এই ইঙ্গিত বুঝে জরাসন্ধের একটি পা নিজের পায়ে চেপে অন্য পা দু হাতে ধরে বৃক্ষশাখার মতো করে তাঁর দেহ চিরে ফেললেন। জরাসন্ধের প্রজারা হাহাকার করে উঠলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন আলিঙ্গন করলেন ভীমকে। তারপর মৃত জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিলেন। দুই অযুত আটশো রাজা মুক্তি পেয়ে কৃষ্ণের স্তব করলেন। কৃষ্ণের আদেশে সহদেব তাঁদের রাজোচিত বেশভূষা দিয়ে বিদায় দিলেন এবং কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

শিশুপাল বধ

শুক বললেন, যজ্ঞের উপযুক্ত সময় বসন্ত কালের আগমনে যুধিষ্ঠির ঋত্বিকদের বরণ করলেন। তাঁদের নাম দ্বৈপায়ন ব্যাস ভরদ্বাজ সুমন্ত গৌতম অসিত বশিষ্ঠ চ্যবন কণ্ব মৈত্রেয় কবষ ও ত্রিত। বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনি সুমতি ক্রতু পৈল পরাশর গর্গ বৈশম্পায়ন অর্থবা কশ্যপ ধৌম রাম ভার্গব আসুরি বীতহোত্র মধুছন্দ বীরসেন অকৃতব্রণও ঋত্বিক রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অন্যান্য রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রজারাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সোনার লাঙ্গলে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন। দেবতা গন্ধর্বরাও যজ্ঞ দেখতে এলেন।

সোমাভিষবের দিন যুধিষ্ঠির মাননীয় ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সভায় কে সর্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র তা নিরূপণে সভাসদরা অসমর্থ হলে সহদেব সকলকে সম্বোধন করে

বললেন, কৃষ্ণই এই পূজার অগ্র-অধিকারী। এ কথায় সভার সকলেই সন্তুষ্ট হলেন এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পূজা করলেন। তাঁর পা ধুইয়ে সেই জল নিজের এবং কুটুম্ব ও অমাত্যদের মাথায় ছেটালেন। তারপর পীতকৌশেয় বস্ত্রযুগল ও আভরণ কৃষ্ণকে দিলেন। কিন্তু দমঘোষের পুত্র শিশুপাল কৃষ্ণের এই অভ্যুদয় সহ্য করতে পারলেন না। ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বিবিধ কটূক্তি বর্ষণ করলেন। বললেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিরা এই সভায় উপস্থিত থাকতে ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক ঐ গোপালক কেমন করে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র হতে পারে! কৃষ্ণ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না এবং অনেকে সভা ত্যাগ করলেন। পাণ্ডব এবং মৎস্য সৃঞ্জয় ও কেকয়বংশীয়রা শিশুপালকে বধ করবার জন্য অস্ত্র ধারণ করলে শিশুপালও খড়্গ ও বর্ম ধারণ করলেন। এতে পাণ্ডবদের অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখে কৃষ্ণ তাঁর নিজের পক্ষের রাজাদের নিবারণ করে নিজেই তাঁর চক্রে শিশুপালের মাথা কাটলেন। তাঁর অনুচর রাজারা প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন। শিশুপালের দেহ থেকে নির্গত জীব জ্যোতি সকলের সামনেই কৃষ্ণের দেহে মিলিত হল। কৃষ্ণ আরও কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়ে দ্বারকাপুরে ফিরে গেলেন।

দুর্যোধনের অবমাননা

পরীক্ষিৎ বললেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু দুর্যোধনের অসন্তোষের কারণ আপনি বলুন।

শুক বললেন, যুধিষ্ঠিরের বান্ধবরাই যজ্ঞের নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভীম পাকশালার অধ্যক্ষ, দুর্যোধন ধনাধ্যক্ষ, সহদেব জনসাধারণের মর্যাদা রক্ষার কাজে এবং নকুল দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্জুন সাধু ও গুরুজনদের শুশ্রূষা এবং কৃষ্ণ তাঁদের পাদ প্রক্ষালন করছিলেন। দ্রৌপদী পরিবেশনে ও কর্ণ দানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলে সকলে গঙ্গায় অবভৃথ স্নানে

গেলেন। এই যজ্ঞ শেষের স্নানে নৃত্য গীত বাদ্য ও সমারোহ আনন্দ-দায়ক হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য দেখে ও প্রশংসা শুনে দুর্যোধন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ময় দানব নির্মিত সভায় স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সভায় প্রবেশ করলেন। সভার নির্মাণ কৌশলে তাঁর মোহ উপস্থিত হল, তিনি প্রকৃত পদার্থ নিরূপণে অক্ষম হলেন। যেখানে জল নেই সেখানে জলভ্রমে কাপড় তুললেন, অথচ যেখানে জল আছে সেখানে দৃষ্টির বিভ্রমে দ্রুত চলতে গিয়ে জলে পড়ে নিতান্ত অপ্রতিভ হলেন। ভীম উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতে মহিলা ও রাজারাও হাসলেন। এই উপহাসে দুর্যোধনের লজ্জা ও অবমাননার সীমা রইল না। তিনি ক্রোধে কোন কথা না বলে সভা থেকে বেরিয়ে হস্তিনা-পুরে প্রস্থান করলেন।

শাল্ব বধ দন্তবক্র ও বিদূরথ

শুক বললেন, এইবারে আমি সৌভপতি শাল্ব বধের কথা বলছি। শাল্ব শিশুপালের সখা। রুক্মিণীর বিবাহের সময় পরাজিত শাল্ব পৃথিবী যাদব শূন্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তারপর তিনি মহাদেবের আরাধনা করে তাঁর কাছ থেকে সৌভ নামে একখানি লোহার স্বেচ্ছাবিহারী যান পেয়েছিলেন। শাল্ব সেই যান নিয়ে দ্বারাবতীতে গেলেন এবং বিপুল সেনা দিয়ে এই পুরী নিরুদ্ধ করে সৌভ বিমানের উপর থেকে শস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করলেন। দ্বারকাপুরী বিপন্ন হল এবং দ্বারকাবাসীদের ক্লেশের আর সীমা রইল না। প্রদ্যুম্ন অন্যান্য যদুবীরদের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তারপর ঘোরতর রোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হল। শাল্বের মায়াযান কখনও দেখা যায়, কখনও অদৃশ্য হয়। কখনও বা বহুরূপে প্রতীত হয়—কখনও ভূমিতে, কখনও আকাশে, কখনও বা জলে। শাল্বের শরজালে যদুবীররা

কাতর হলেন বটে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়ে কেউই পলায়ন করলেন না। শাল্বের এক অমাত্যের অতর্কিত গদার আঘাতে প্রত্যুম্ন মূর্ছিত হলেন। তাই দেখে সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সংজ্ঞা লাভের পর প্রত্যুম্ন সারথিকে এই কাজেব জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করতে এসে সেই অমাত্যের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। সাতাশ দিন ধরে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল।

কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। দ্বারকায় ফিরে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ দেখে সারথি দারুককে বললেন, আমাকে শাল্বের নিকটে নিয়ে চল। কৃষ্ণকে দেখে শাল্ব তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বাণের প্রহারে কৃষ্ণের হাত থেকে শার্ঙ্গধনু পড়ে যেতেই শাল্ব বললেন, তুমি তোমার ভাই শিশুপালের পত্নী রুক্মিণীকে হরণ করেছ এবং রাজসূয় যজ্ঞের সভায় যুদ্ধে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁকে বধ কবেছ। আজ আমি তোমাকে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করব। কৃষ্ণ বললেন, প্রকৃত বীর বাগাড়ম্বর না কবে সামর্থ্যের পরিচয় দেয়। এই বলে গদার আঘাত কবলেন। শাল্ব এই আঘাতে রক্ত বমন করতে লাগলেন।

এই সময়ে শাল্ব অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন এবং মুহূর্তকাল পরে একজন পুরুষ এসে কাতরভাবে বললেন, দেবী দেবকী বলে পাঠিয়েছেন যে পাষণ্ড শাল্ব নির্দয় ভাবে আপনার পিতাকে বন্ধন করে নিয়ে গেছেন। এই সংবাদে কৃষ্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। এমন সময় সৌভপতি শাল্ব বসুদেবের মতো একজনকে বেঁধে এনে বললেন, তোমার জন্মদাতাকে আমি তোমার সামনেই বধ করছি। বলে খড়্গের আঘাতে তাঁর মস্তক ছেদন করলেন। কৃষ্ণ ক্ষণকাল অভিভূতের মতো থেকেই বুঝতে পারলেন যে এটা শাল্বের আসুরিক মায়া। তিনি গদার আঘাতে সৌভযান চূর্ণ করে সুদর্শন চক্রে শাল্বের মস্তক ছেদন করলেন।

এই সময়ে শিশুপালের সখা দন্তবক্র নামে একজন দৈত্য কৃষ্ণের

দিকে ধেয়ে এলেন। বললেন, তুমি আমার মাতুল পুত্র, কিন্তু তোমার দূষিত চরিত্রের জন্য তোমাকে বধ করা অন্যায় হবে না। এই বলে কৃষ্ণের মাথায় গদার আঘাত করলেন। কৃষ্ণও অটল ভাবে তাঁর বক্ষে গদার আঘাত করতেই তিনি রক্ত বমন করে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর জ্যোতি কৃষ্ণের অঙ্গে প্রবেশ করল।

দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণকে বধের জন্য এগিয়ে এলেন। কৃষ্ণ চক্র দিয়ে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। সকলে তাঁর জয় ঘোষণা করে পুষ্পবর্ষণ করলেন। তারপর কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

তীর্থযাত্রায় বলরামের রোমহর্ষণ বিনাশ ও প্রায়শ্চিত্ত

কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের উদ্‌যোগ করছেন শুনে বলরাম নিরপেক্ষ থাকবার জন্য তীর্থ যাত্রার নামে অন্যত্র গেলেন। প্রথমে প্রভাসে এবং তারপর সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হলেন। ক্রমশ পৃথূদক বিন্দুসর ত্রিতকূপ সুদর্শন বিশালা ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ এবং পূর্ববাহিনী সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থে গেলেন। সেখান থেকে যমুনা ও গঙ্গার নিকটবর্তী তীর্থ হয়ে নৈমিষারণ্যে এলেন। ঋষিরা সেখানে সহস্র বৎসর সাধ্য সত্র যাগের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। বলরামকে সমাগত দেখে ঋষিরা উঠে তাঁকে সম্মান ও অর্চনা করলেন। তিনি আসন গ্রহণ করে দেখলেন যে ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চ আসনে বসে আছেন এবং প্রতিলোমজাত হয়েও প্রত্যুত্থান করে তাঁকে অভিবাদন বা প্রণাম করলেন না। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এই প্রতিলোমজ ব্যক্তি ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসে কোন্ সাহসে আমাদের সম্মান রক্ষা করে না! বেদব্যাসের শিষ্য হয়ে ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি অনেক ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও কিছু শেখে নি। আমি যখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য দেহ ধারণ করেছি, তখন আমার হাতেই এর মৃত্যু হওয়া উচিত। বলে হাতের একটি কুশ দিয়ে

আঘাত করতেই রোমহর্ষণের মৃত্যু হল। সমবেত মুনিরা হাহাকার করে উঠলেন। তাঁরা বললেন, আপনি অত্যন্ত অধর্মের কাজ করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এঁর কাছে আমরা পুরাণ পাঠ শুনছি। আমাদের প্রভাবে ইনি এখন ব্রাহ্মণ, আপনার ব্রাহ্মণ বধের পাপ হল। বলরাম বললেন, বেদে আছে যে আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এঁর পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদের বক্তা হবেন। আপনারা আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন। ঋষিরা বললেন, ইল্বলের পুত্র বল্বল দানব আমাদের যজ্ঞে নানা রূপ ব্যাঘাত করে। ঐ পাপিষ্ঠকে বধ করলে আমাদের উপকার হবে। তারপর সমগ্র ভারত পর্যটন করে বারো মাস কৃচ্ছ্রসাধনের পর তীর্থ স্নান করলে আপনি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

এর পরে পর্বের দিন এলে যজ্ঞক্ষেত্রে দুর্গন্ধ ঝটিকা বায়ু বইল এবং শূল হাতে বল্বলকে বলরাম দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর মুষল ও হলকে স্মরণ করতেই তা এসে উপস্থিত হল। বলরামের সেই মুষলের আঘাতে বল্বলের মাথা চূর্ণ হল এবং সে রক্ত বমন করে ভূতলে পড়ল।

সেখান থেকে বলরাম কৌশিকী তীর্থে গেলেন। যে সরোবর থেকে সরযূ উৎপন্ন হয়েছে, সেখান থেকে সরযূর স্রোত ধরে প্রয়াগে উপনীত হলেন। তারপরে গেলেন পুলহের আশ্রমে। ক্রমশ গোমতী গণ্ডকী বিপাশা ও শোণে অবগাহন স্নান করে গয়ায় গেলেন। সেখানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হলেন। তারপর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করে পর্বতের উপরে পরশুরামের মূর্তি দর্শন করলেন। সেখান থেকে সপ্ত গোদাবরী বেণা পম্পা ও ভীমরথীতে গেলেন। কার্তিকেয়র দর্শনের পর গিরিশালয় শ্রীপর্বতে যাত্রা করলেন। সেখান থেকে দ্রবিড় দেশে বেঙ্কট পর্বত দর্শন করে কামকোষ্ণী কাঞ্চীপুরী ও কাবেরীতে গেলেন। সেখান থেকে শ্রীরঙ্গ হয়ে ঋষভ পর্বত ও দক্ষিণ মথুরায় গেলেন। তার পর সমুদ্র তীরে

সেতুবন্ধে পৌঁছলেন। সেখান থেকে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী হয়ে মলয় পর্বতে অগস্ত্যকে প্রণাম করলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে কন্যা নামের দুর্গা দর্শন করলেন। তারপর অনন্তপুরে পদ্মনাভের তীর্থে ধেনুদানের পর কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ অতিক্রম করে গোকর্ণ নামে শিবক্ষেত্রে উপনীত হলেন। পরে দ্বীপ নিবাসী আর্যাকে দর্শন করে শূর্পারক তীর্থে গেলেন। তারপর তাপী পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে রেবাতীরে মাহিষ্মতী পুরী হয়ে মনু তীর্থে স্নান করে পুনরায় প্রভাসে গেলেন। এখানে এসেই শুনলেন যে কুরু পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধে সমবেত রাজারা প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন। ভীম ও দুর্যোধন তখনও গদাযুদ্ধে নিযুক্ত আছেন শুনে তাঁদের নিবারণের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে বলরাম উভয়কে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের একজন আমার আত্মীয় ও আর একজন শিষ্য। একজন অধিক বলশালী ও আর একজনের শিক্ষা বেশী। তাই তোমরা দুজনেই সমান ও আমার কাছে সমান প্রিয়। তোমরা একজনকে পরাজিত করে আর একজন সুস্থ থাকবে বলে আমার মনে হয় না। তাই তোমরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। কিন্তু তাঁরা শত্রুতার জন্য এমনই মেতে উঠেছিলেন যে যুদ্ধ বন্ধ করলেন না। তাই দেখে বলরাম দ্বারকায় ফিরে গেলেন এবং কিছুকাল সেখানে বাস করবার পর নৈমিষারণ্যে গিয়ে রেবতীর সঙ্গে অবভৃথ স্নান করলেন।

সুদামার উপাখ্যান

পরীক্ষিৎ বললেন, কৃষ্ণের অলৌকিক লীলার কথা শোনবার একান্ত বাসনা জন্মেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তাই বলুন।

শুক বললেন, সুদামা নামে কৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। তিনি অতি দীন ভিখারীর মতো জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন। তাঁর

পত্নী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা। একদিন ক্ষুধার্ত স্বামীকে ভোজনের জন্য কিছু দিতে না পেরে নিরুপায় হয়ে বললেন, শুনেছি কৃষ্ণ তোমার সখা, তাঁর নিকটে একবার গেলে আমাদের আর সাংসারিক দুঃখ থাকবে না। তিনি তো নিকটে দ্বারাবতীতেই আছেন! এই ভাবে বার বার অনুনয় করলে ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে কৃষ্ণকে দর্শনের একটা সুযোগ পাওয়া গেল। তাই বললেন, সখার নিকটে যেতে হলে কিছু উপায়ন অর্থাৎ উপহার নিয়ে যাওয়া উচিত। ঘরে যদি কিছু থাকে তো দাও। ব্রাহ্মণী লজ্জিত হয়ে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের নিকটে চার মুঠো চিপিটক অর্থাৎ চিঁড়ে ভিক্ষা করে এক খণ্ডক জীর্ণ কাপড়ে বেঁধে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাই নিয়ে দ্বারকা যাত্রা করলেন।

তিনি তিনটি সেনা সন্নিবেশ অতিক্রম করে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের বাসভবন ছাড়িয়ে কৃষ্ণের বাস মন্দিরে একটি কক্ষে প্রবেশ করে রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং পর্যঙ্কে বসিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে সেই জল নিজের মাথায় নিলেন। তারপর তাঁর অর্চনা করে কুশল প্রশ্ন করলেন। রুক্মিণী সেই শীর্ণ দেহের জীর্ণ বসনধারী ব্রাহ্মণকে বীজন করতে লাগলেন। অন্তঃপুরের সকলেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই আদর দেখে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের হাত ধরে একত্রে উপবেশন করে বাল্যকালে গুরুগৃহে বাসের সময় যে সব ব্যাপার ঘটেছিল সেই সব মধুর বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, পাঠ সাঙ্গ করে তুমি বোধহয় গৃহে ফিরে বিবাহ করেছ এবং গৃহস্থ হয়েও বিষয় চিন্তায় ব্যাকুল নও। তোমার যে ঐশ্বর্যের কামনা নেই তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমার কি সেই রাত্রির কথা মনে আছে, যেদিন আমরা বনে কাঠ আনতে গিয়ে সারা রাত জল ঝড়ে দুর্ভোগ ভুগেছি এবং পরদিন গুরু আমাদের দুজনকেই আশীর্বাদ করেছিলেন? ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি সত্যকাম, তোমার সঙ্গে আমরা গুরুগৃহে বাস করেছি। আমাদের আবার অভাব কিসের! কৃষ্ণ হেসে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই রিক্ত হাতে আস নি, আমার জন্যে

কী খাদ্য এনেছ দেখি ! লজ্জায় ব্রাহ্মণ সেই কাপড়েব খুঁটে বাঁধা চিপিটক বার করতে পারলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর কাপড়ের ভিতর থেকে সেই চিঁড়ের পুঁটুলি বার করে বললেন, এই তো, আমার জন্যেই তো এনেছ দেখছি। বলে এক মুঠো চিঁড়ে খেয়ে নিলেন। দ্বিতীয় মুঠো হাতে নিতেই রুক্মিণী বাধা দিয়ে বললেন, আর থাক। এতেই তোমার যাবতীয় সম্পদ প্রদানেব তুষ্টি হয়েছে।

ব্রাহ্মণ আহাব করে সেই রাত্রি কৃষ্ণেব গৃহে কাটালেন এবং পবদিন প্রাতঃকালে গৃহে ফেরার জন্য যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে কিছু দূর এগিয়ে দিলেন। স্ত্রীব অনুরোধে তিনি ধনলাভের জন্য কৃষ্ণেব নিকটে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু লজ্জায় কিছু চাইতে পারেন নি। গৃহে ফিবে, স্ত্রীকে কী বলবেন তাই ভেবে লজ্জিত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণদর্শনের আনন্দে সে লজ্জা তাঁব মনে স্থান পেল না। ব্রাহ্মণের প্রতি কৃষ্ণের ভক্তির পরিচয় তিনি পেয়েছেন। ভাবলেন, আমি নিঃস্ব জেনেও তিনি আমাকে কিছু দেন নি, বোধহয় ধনলাভে আমি উৎপথগামী হতে পারি ভেবেই দেন নি।

কিন্তু নিজের বাসস্থানের নিকটবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পর্ণকুটীর দেখতে পেলেন না। তার বদলে সেখানে একটি অট্টালিকা দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। তার চারিদিকে উপবন। ভিতরে সুসজ্জিত পুরুষ ও নারী। তারা বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করলেন। পতি ফিরেছেন শুনে ব্রাহ্মণী সত্বর গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে এলেন। ব্রাহ্মণীকে দেবপত্নীর মতো শোভাসম্পন্ন ও দাসী পবিবৃত দেখে ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তিনি অমরাপুবীর মতো ভবনে প্রবেশ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জন্মাবধি দীন দুঃখীর এই সমৃদ্ধি কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়।

কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ

শুক বললেন, বলরাম ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন, তখন একটি সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণ উপস্থিত হয় এবং এই বার্তা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের নিকট অবগত হয়ে দেশ দেশান্তর থেকে মানুষ কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক তীর্থে সমবেত হয়। পরশুরাম এইখানে বহু হ্রদ সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বারকাবাসীও এখানে এসে অবগাহন স্নান করলেন। এখানে সুহৃৎ ও অপরপক্ষের রাজারা এবং নন্দ প্রভৃতি গোপ ও গোপীরাও এসেছেন দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন।

দ্রৌপদী কৃষ্ণের পত্নীদের সম্বোধন করে বললেন, কৃষ্ণ তোমাদের কেমন করে বিবাহ করেছিলেন সেই কথা বল। রুক্মিণী বললেন, আমার ভাই শিশুপালের হাতে আমাকে সমর্পণের জন্য কৃতসংকল্প হলে তিনি আমাকে হরণ করেন। সত্যভামা বললেন, অক্রূর প্রভৃতি অন্যের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছিল। কিন্তু আমার পিতা তাঁর ভ্রাতৃহত্যার অপবাদ তাঁর উপরে দিয়েছিলেন। তিনি এই অপবাদ দূর করলে তাঁর হাতেই আমাকে সম্প্রদান করেন। জাম্ববতী বললেন, আমার পিতা সাতাশ দিন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার পর তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করেন। কালিন্দী বললেন, আমি তাঁর জন্য কঠোর তপস্যা করেছি জেনে তিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। মিত্রবিন্দা বললেন, স্বয়ম্বর সভা থেকে আমার ভ্রাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আমাকে হরণ করে বিবাহ করেন। সত্যা বললেন, উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্য আমার পিতা সাতটি বৃষ মুক্ত রাখেন। তাদের বন্ধন করে কেউই আমাকে বিবাহ করতে পারেন নি। তিনি অনায়াসে তাদের বন্ধন করেছিলেন। পথে রাজারা তাঁকে বাধা দিয়ে পরাজিত হয়। ভদ্রা বললেন, মনে মনে আমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছি জেনে আমার পিতা তাঁর মাতুল পুত্রকে ডেকে তাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করেছেন। লক্ষণা বললেন, দেবর্ষি নারদের মুখে তাঁর জন্মকর্মের বিষয় অনেকবার শুনে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট-

হয়েছিলাম। আমার পিতা বৃহৎসেন আমার অভিপ্রায় জেনে যে স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান করেন, তাতে মৎস্য বেধনের পণ স্থির করা হয়েছিল। জলপূর্ণ কুম্ভে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। অনেকেই ধনুকের জ্যা যোজনা করতে পারেন নি। জরাসন্ধ শিশুপাল দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধারা ধনুকে জ্যা রোপণ করে-ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্জুনের বাণ মৎস্যকে স্পর্শ করেছিল, কিন্তু ছেদন করতে পারে নি। কৃষ্ণ একবার জলে দৃষ্টিক্ষেপ করেই সেই মৎস্য ভূপাতিত করেন। তারপর আমি স্বয়ম্বর সভায় এসে তাঁর গলায় বরণমালা দিয়েছি। রাজারা বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমরা আটজন মহিষী জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই তাঁকে পেয়েছি।

অন্যান্য ষোল হাজার মহিষী বললেন, ভূমিপুত্র নরকাসুর পরাজিত রাজার রাজকন্যাদের কারারুদ্ধ রেখেছিল। তিনি তাকে বধ করে আমাদের পাণিগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের মহিষীদের এই কথা শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন।

এই সময়ে বলরাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য চারিদিক থেকে ঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন। সমাসীন রাজা ও পাণ্ডবরা তাঁদের প্রণাম করলেন। তাঁরা উপবেশন করলে সভা নিস্তব্ধ হল। কৃষ্ণ ঋষিদের সম্বোধন করে বললেন, আপনাদের দর্শন পেয়ে আমাদের জন্ম সার্থক হল। তীর্থ জলময় বা দেবতা মৃত্তিকা-প্রস্তরময় নন। তাঁরা বিলম্বে, কিন্তু সাধুরা দর্শন মাত্রেই মানুষকে পবিত্র করেন।—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৮৪।১১

কৃষ্ণের এই কথার পর ঋষিরা কিছুকাল হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমরা তোমার মায়ায় মোহিত হচ্ছি। আমাদের বিদ্যা ও তপস্যা আজ সার্থক হল। এই বলে ঋষিরা গমনোদ্যত হলে বসুদেব সেখানে এসে বললেন, বেদবিদ ব্রাহ্মণের দেহে দেবতার

বাস। তাই জানতে চাইছি কোন্ অনুষ্ঠানে জীব কর্ম বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। এ কথা শুনে দেবর্ষি নারদ বললেন, গঙ্গাতীরবাসী লোক বিশুদ্ধির জন্য গঙ্গা ছেড়ে অন্য তীর্থে যায়। নৈকট্যই মানুষের কাছে অনাদরের কারণ।—

সন্নিকর্ষো হি মর্ত্যানামনাদর কারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যন্তস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥ ১০।৮৪।৩১

আপনি যে নিজের পুত্র কৃষ্ণকে বালক বোধে উপেক্ষা করে আমাদেব এই প্রশ্ন করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি আপনাদের নিকটে আছেন বলেই এই অনাদর। তবু বলছি যে যজ্ঞানুষ্ঠানই কর্ম বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভের উত্তম উপায়। এতেই দেবঋণ বিমুক্ত হয়ে প্রব্রজ্যায় গমন করুন।

এই কথা শুনে বসুদেব ঋষিদের ঋত্বিক পদে বরণ করলেন। যজ্ঞ শেষ হলে পরশুরাম নির্মিত হ্রদে অবগাহন স্নান করলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন। বর্ষা আসন্ন দেখে বৃষ্ণিরাও দ্বারকায় ফিরলেন।

দেবকীর মৃতপুত্র দর্শন

শুক বললেন, একদিন কৃষ্ণ ও বলরাম পিতার পাদ বন্দনা করলে বসুদেব আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা দুজন যে পরম পরুষ তা আমি জেনেছি, পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই তোমরা অবতীর্ণ হয়েছ। কৃষ্ণ বললেন, আমরা আপনার পুত্র। আত্মা এক স্বপ্রকাশ ও স্বরূপত নির্গুণ। নিজের সৃষ্ট গুণে উৎপন্ন অনেক দেহে তিনি বহু রূপে প্রতীত হন। নিজে অবিকৃত থেকে পঞ্চভূতের বিকারে আবির্ভাব তিরোভাব অল্পত্ব বহুত্ব একত্ব নানাত্ব প্রভৃতি ভাব ধারণ করেন।

তাঁরা গুরুপত্নীর মৃত পুত্রকে দক্ষিণারূপে দিয়েছিলেন শুনে দেবকী বিস্মিত হয়ে বললেন, কংস আমার যে ছয়টি পুত্রকে বধ করেছে, তাদের জীবিত করে আমাকে দাও। কৃষ্ণ ও বলরাম তৎক্ষণাৎ

যোগমায়াকে স্মরণ করে সুতলে বলির নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, ঊর্ণা নামে পত্নীর গর্ভে মরীচির ছয়টি পুত্র জন্মে। তাঁরা ব্রহ্মাকে নিজের কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে রমণে উদ্যত দেখে উপহাস করেছিলেন। এই দোষে তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন এবং দৈবচক্রে তাঁরাই মহামায়ার প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে দেবকীর পুত্র রূপে জন্মেই কংসের হাতে নিহত হন। তাঁরা এখন সুতলে আছেন এবং জননীর শোক অপনোদনের জন্য তাঁদের নিয়ে যেতে চাই। এই বলে তাঁদের সেখান থেকে এনে জননীকে সমর্পণ করলেন। দেবকী সানন্দে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

সুভদ্রা হরণ

পরীক্ষিৎ বললেন, আমার পিতামহী কৃষ্ণ ও বলরামের ভগিনী সুভদ্রাকে অর্জুন কী প্রকারে বিবাহ করেছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বলুন।

শুক বললেন, অর্জুন তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করে প্রভাস তীর্থে এসে উপনীত হলেন এবং সেইখানেই তাঁর মাতুল কন্যা সুভদ্রার সম্বন্ধে জল্পনা শুনলেন যে বলরামের বাসনা দুর্যোধনের হাতে ভগিনীকে সমর্পণ করবেন কিন্তু তাঁদের পিতা মাতা বা কৃষ্ণের এতে সম্মতি নেই। অর্জুন নিজে এই কন্যাকে সংগ্রহ করবার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন এবং বর্ষার চার মাস সেখানেই কাটালেন। বলরাম বা পুরবাসী কেউই তাঁকে চিনতে না পেরে সন্ন্যাসী ভেবে বিশেষ যত্ন ও সম্মান করতে লাগলেন। এমন কি একদিন বলরাম তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। সেই সময়ে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী সুভদ্রাকে দেখে তাঁর রূপে আসক্ত হলেন এবং সুভদ্রাও সুপুরুষ অর্জুনকে দেখে লজ্জাবনত মুখে হাসলেন। এরপর অর্জুন তাঁকে হরণের অবসর অন্বেষণ করতে লাগলেন। বসুদেব দেবকী ও কৃষ্ণ অর্জুনের পরিচয়

জানতে পেরে সুভদ্রাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে স্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে একদিন দেবদর্শনের মহোৎসব রথ যাত্রা উপলক্ষে সুভদ্রা রথারোহণে দুর্গ প্রাকারের বাহিরে দেবদর্শনেব জন্য যাত্রা করলেন। অর্জুন তাঁকে সেই সময়ে হরণ করলেন। সৈন্যরা সুভদ্রাকে রক্ষা করতে সমর্থ হল না। বলরাম এই সংবাদ পেয়ে ক্রোধে বিহ্বল হলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত করলেন। বলবাম প্রসন্ন হয়ে বরবধূকে নানা উপঢৌকন দিলেন।

কৃষ্ণের মিথিলা যাত্রা

শুকদেব বললেন, মিথিলায় শ্রুতদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। বিনা চেষ্টায় তিনি কোন রকমে সংসার চালাতেন। বহুলাশ্ব তখন মিথিলাব রাজা। তিনিও কৃষ্ণের ভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের তুষ্টির জন্য কৃষ্ণ ঋষিদের নিয়ে রথে আরোহণ করে মিথিলা যাত্রা করলেন। পথে নানা জায়গায় লোকে সমবেত হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। আনর্তধন্ব কুরু জাঙ্গল কঙ্ক মৎস্য পাঞ্চাল কুন্তি মধু কেকয় কোশল ও অর্ণ দেশের লোকেরা তাঁকে দেখে আনন্দ পেল। মিথিলায় উপস্থিত হলে রাজা বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব তাঁদের অতিথি হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কৃষ্ণ উভয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং কয়েক দিন মিথিলায় কাটিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

বেদ স্তুতি

শুক বললেন, একদিন দেবর্ষি নারদ প্রাচীন ঋষি নারায়ণকে দর্শনের জন্য বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে জনলোকে ব্রহ্মসত্রের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মবিচার সম্পর্কে বললেন, সনন্দন বলেছিলেন যে প্রলয়ের অন্তে পুনরায় সৃষ্টির জন্য শ্রুতি সমূহ পরম পুরুষের স্তব করে থাকেন। সনকাদি ঋষিরা এই বেদস্তুতির

সাহায্যে আত্মস্বরূপের আলোচনায় পরমতত্ত্ব অবগত হয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। তুমিও এই আত্মানুশাসনে বিশ্বাস করে যথেচ্ছ বিচরণ কর।

হরিহরের স্বভাব ও বৃকাসুর বধ বৃত্তান্ত

পরীক্ষিৎ বললেন, মহাদেবের উপাসকদের প্রায়ই ধনী দেখা যায় এবং হরির ভক্তরাই সাধারণত দরিদ্র ও নিঃস্ব। হরিহরের আরাধনায় এরূপ বিপরীত ফল কেন হয় তা জানবার ইচ্ছা হচ্ছে।

শুক বললেন, কৃষ্ণ আপনার পিতামহ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যাকে আমি অনুগ্রহ করি তার সমস্ত ধন হরণ করি, তাকে নির্ধন দেখে স্বজনেরা যখন তাকে পরিত্যাগ করে তখনই তার মনে বৈরাগ্য জাগে এবং আমার অনুগ্রহের যোগ্য হয়। শিব অল্পে তুষ্ট হন বলে জনগণ শিবের আরাধনায় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। পরিণামে গর্বিত হয়ে আরাধ্য দেবতারই অবমাননা করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনই শাপ বা বর দেন। ব্রহ্মা ও শিব যত তাড়াতাড়ি শাপ বা বর দেন বিষ্ণু তত তাড়াতাড়ি কিছু করেন না। বৃকাসুরকে বর দিয়ে শিব কীরকম সঙ্কটে পড়েছিলেন তা বলছি।

শকুনির পুত্র বৃক নামের অসুর একবার নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে সব চেয়ে অল্পে তুষ্ট হন। নারদ বলেছিলেন, শিব। নারদের কথায় বৃকাসুর কেদার ক্ষেত্রে গিয়ে দেহের মাংস আহুতি দিয়ে শিবের আরাধনা আরম্ভ করে। ছয় দিন এই ভাবে আহুতি দেবার পর সে নিজের মাথা কেটে শিবকে অর্পণ করার উদ্যোগ করলে শিব তাকে নিবারণ করেন। বলেন, তুমি বর নাও। বৃকাসুর বললে, এই বর দিন যে আমি কারও মাথায় হাত রাখলেই তার মৃত্যু হবে। শিব চিন্তিত হলেও প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যই তাকে সেই বর দিলেন। এই বর পেয়েই সেই অসুর গৌরীকে হরণ করবার অভিলাষী হল এবং শিবের মাথায় হাত দেবার

উদ্যোগ করল। শিব ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হয়ে নিজের জীবন রক্ষার জন্য স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে গিয়েও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। বৃকাসুর তাঁর পিছনে ছুটতেই লাগল। কোন উপায় না দেখে তিনি বৈকুণ্ঠে হরির নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

শিবকে বিপন্ন দেখে নারায়ণ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করলেন এবং বৃকাসুরের নিকটে এসে বললেন, আপনাকে দেখে শ্রান্ত মনে হচ্ছে। বসে একটু বিশ্রাম করুন। কোন বাধা না থাকলে আপনার অভিপ্রায়ের কথা বলুন, আমি আপনাকে সাহয্য করব। বৃকাসুব শান্ত হয়ে নিজের সংকল্পের কথা বলল। নারায়ণ বললেন, দক্ষের শাপে যে প্রেত পিশাচের পতি হয়ে আছে, তার কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিজের মাথায় হাত দিয়ে তার কথার সত্যাসত্য আগে যাচাই করে দেখুন। তার কথা যদি মিথ্যা হয় তো সেই মিথ্যাবাদী যাতে আর কাউকে প্রতারণা করতে না পারে সেই জন্যে তাকে বিনাশ করুণ। নারায়ণের এই কথায় অসুরের বুদ্ধি বিচলিত হল এবং সে নিজের মাথায় হাত রাখতেই বজ্রাঘাতের মতো ছিন্ন মস্তক হয়ে ভূপতিত হল। পাপাত্মা বৃকাসুর নিহত হতে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা

শুক বললেন, সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিরা যখন সত্র যজ্ঞ করছিলেন, তখন তাঁদের মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হল—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এর মীমাংসার জন্য ঋষিরা ভৃগুকে পাঠালেন।

ভৃগু ব্রহ্মার সভায় এসে তাঁকে প্রণাম বা অভিবাদন করলেন না। পুত্রের এই ধৃষ্টতা দেখে ব্রহ্মা মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু তা প্রকাশ না করে সেই ক্রোধ সংবরণ করলেন।

ভৃগু তাই দেখে আর কিছু না বলে কৈলাসে শিবের নিকটে

গেলেন। মহর্ষিকে অকস্মাৎ উপনীত হতে দেখে শিব আনন্দে গাত্রোত্থান করে সহোদরের মতো তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু ভৃগু তাঁকে উপেক্ষা করে বললেন, তুমি যথেচ্ছাচারী, তোমাকে আমি স্পর্শ করব না। এ কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে শিব তাঁর ত্রিশূল তুলে ভৃগুকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। দেবী তাঁর পায়ে পড়ে মিষ্টি কথায় তাঁকে শান্ত করলেন।

এরপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন, তিনি তখন লক্ষ্মীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। ভৃগু অকস্মাৎ তাঁর বুকে পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ উঠে ভক্তিভরে ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, আপনি যে এখানে অনেক্ষণ এসেছেন তা বুঝতে পারি নি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমার কর্কশ বুকে আঘাত করে আপনার কোমল পায়ে কত না বেদনা লেগেছে! বলে তাঁর পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

বিষ্ণুর এই বিনম্র ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হয়ে ভৃগু ঋষিদের সভায় গিয়ে সব কথা বললেন। জীবের যাবতীয় ভয়ের নিবারণে যিনি শান্তিলাভ করেন সেই বিষ্ণুকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন।

মহাকাল পুর দর্শন

শুক বললেন, এক সময় দ্বারাবতীতে এক ব্রাহ্মণ পত্নী এক সন্তান প্রসব করে। কিন্তু পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। ব্রাহ্মণ সেই মৃত পুত্র রাজদ্বারে এনে বিলাপ করতে লাগলেন যে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শঠ প্রবঞ্চক লোভী ও বিষয়লোলুপ ক্ষত্রিয় রাজার কর্মদোষেই তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। এই ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের মৃত্যুর পরেও তিনি এসে আক্ষেপ করেন এবং নবম পুত্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট অর্জুন সেই কাতরোক্তি শুনে ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি আপনাদের সন্তানের জীবন রক্ষা করব, না পারলে

আগুনে প্রবেশ করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। ব্রাহ্মণ বললেন, কেউ যা পারে নি, আপনি কি তা পারবেন! অর্জুন বললেন, যমরাজকে পরাজিত করে আমি আপনার পুত্রদের আনব।

এর পর সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর প্রসবকাল আসন্ন হলে তিনি এসে অর্জুনকে সংবাদ দিলেন। অর্জুন সেই সূতিকাগারের দশ দিক শর দিয়ে খাঁচার মতো করে রাখলেন। কিন্তু একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে মুহূর্তকাল রোদন করে আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার মৃতদেহও আর দেখা গেল না। ব্রাহ্মণ বললেন, ধিক অর্জুনকে! আত্মশ্লাঘাই দেখছি তাঁর পৌরুষের একমাত্র পরিচয়, তাই ইনি দৈবকে নিজের আয়ত্তে আনবার বাসনা রাখেন। ব্রাহ্মণের এই নিন্দা শুনে অর্জুন যমের সংযমনী পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণের পুত্রদের না দেখে সর্বত্র এমনকি রসাতলে গিয়েও তাদের দেখতে পেলেন না।

তারপর তিনি আগুনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করে বললেন, চল, আমি ব্যবস্থা করছি। বলে দিব্যরথে পশ্চিমে যাত্রা করে সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সমুদ্র ও লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে ভয়ানক অন্ধকারে প্রবেশ করলেন। তারপর সুদর্শন চক্রের আলোয় অগ্রসর হয়ে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলে প্রবেশ করলেন এবং জলের নিচে কালপুর নামে এক রমণীয় গৃহে প্রবেশ করে একটি সহস্রশির সর্প দেখলেন। তারই দেহে আসীন ছিলেন ভগবান অনন্তদেব। কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁকে প্রণাম করলে অনন্তদেব বললেন, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তোমরা উভয়ে আমার অংশে অবতীর্ণ হয়েছ। আমিই তোমাদের দেখবার জন্য ব্রাহ্মণের সন্তানদের এখানে এনেছি। তোমরা পৃথিবীর ভার অসুরদের বিনাশ করে সত্বর আমার নিকটে ফিরে এস। কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিয়ে ফিরে এলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।

সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা ও যদুবংশের কথা

শুক বললেন, কৃষ্ণ দ্বারকাপুরে তাঁর ষোল হাজার মহিষীর গৃহে ষোল হাজার মূর্তি ধারণ করে সুখে ক্রীড়া করতেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে জলবিহার করতেন। তাঁরা বলতেন, লক্ষ্মীই তাঁর একমাত্র পত্নী নন, তাঁরাও একনিষ্ঠ ও পতি পরিয়ান। তবে আমরা স্বামীর আদর চাই। এইভাবে তাঁরা বৈষ্ণবগতি লাভ করেছিলেন এবং কৃষ্ণ এই ভাবেই তাঁর ষোল হাজার একশো আট পত্নী গ্রহণ করেছিলেন।

এঁদের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি আটজন তাঁর প্রধান মহিষী। এঁদের প্রত্যেকেরই দশটি করে পুত্র হয়েছিল। এই পুত্রদের মধ্যে আঠারো জন বিপুল কীর্তিশালী হয়েছিলেন। তাঁদের নাম প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দীপ্তিমান ভানু সাম্ব মধু বৃহদ্ভানু চিত্রভানু বৃক অরুণ পুষ্কর বেদবাহু শ্রুতদেব সুনন্দন চিত্রবাহু বিরূপ কবি ও ন্যগ্রোধ। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নই পিতার মতো গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মাতুল রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর দৌহিত্র হয়ে রুক্মীর পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। এঁদের পুত্র বজ্র মৌসল যুদ্ধে অবশিষ্ট ছিলেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তাঁর পুত্র সুবাহু, তাঁর পুত্র শান্তসেন এবং তাঁব পুত্র শতসেন। যদুকুলে জাত কুমারদের উপদেশের জন্য তিন কোটি আট হাজার আটশো আচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। অমৃত মন্থনের সময় দেবাসুর সংগ্রামে নিহত অসুররাই শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের বিনাশের জন্যই দেবতারা যদুকুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

দশম স্কন্ধ সমাপ্ত

একাদশ স্কন্ধ

যদুকুল ধ্বংসের অভিশাপ

শুক বললেন, কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে অনেক দৈত্য বধ করেছিলেন। তারপর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করে ভাবলেন যে যদুকুল বিদ্যমান থাকতে কিছু ভার থেকেই গেল। এই ভেবে তিনি বসুদেবের গৃহে বিশ্বামিত্র অসিত কণ্ব দুর্বাসা ভৃগু অঙ্গিরা কশ্যপ বামদেব অত্রি বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি ঋষিদের নিমন্ত্রণ করলেন এবং শুভ ক্রিয়াকলাপ শেষ করে তাঁদের পিণ্ডারক তীর্থে পাঠালেন। এরই নিকটে যদুবংশের বালকরা খেলা করছিল। ঋষিদের দেখে তারা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে তাকে তাঁদের সামনে এনে বিনীত ভাবে বলল, ইনি গর্ভবতী, এঁর গর্ভে কী সন্তান হবে তা জানতে চাইছেন। ঋষিরা এইভাবে উপহসিত হয়ে বললেন, ইনি তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করবেন। বালকেরা ভয় পেয়ে সাম্বের উদরবস্ত্র উন্মোচন করে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল এবং তাই নিয়ে রাজসভায় গিয়ে রাজা উগ্রসেনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। রাজা সেই মুষল চূর্ণ করিয়ে অবশিষ্ট একটি খণ্ডের সঙ্গে তা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন। একটি মৎস্য সেই লোহার খণ্ডটি গ্রাস করল এবং লৌহ চূর্ণ থেকে সমুদ্রের তীরে এরকা নামে এক জাতের তৃণের জন্ম হল। মৎস্যটি মৎস্যজীবীদের জালে আবদ্ধ হলে তার উদরে প্রাপ্ত লৌহের শলাটি এক ব্যাধ তার শরের অগ্রভাগে শল্যরূপে ব্যবহার করল। কৃষ্ণ সব জেনেও কোন প্রতিকার করলেন না।

নিমি ও নব যোগীন্দ্র সংবাদ

শুক বললেন, কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য দেবর্ষি নারদ প্রায় সব সময়েই দ্বারকাপুরীতে বাস করতেন। একদিন তিনি বসুদেবের

গৃহে উপস্থিত হলে বসুদেব তাঁকে বসিয়ে বললেন, যে ধর্মের অনুশীলন করলে মৃত্যুর হাত থেকে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় তাই বলুন। নারদ বললেন, এর উত্তরে আমি বিদেহরাজ নিমির সঙ্গে ঋষভপুত্র ঋষিদের সংবাদ নামে পুরাতন ইতিহাস বলছি। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র, আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি ও তাঁর পুত্র ঋষভ। বৃদ্ধেরা বলেন যে মোক্ষধর্ম প্রবর্তনের জন্যই বিষ্ণুর অংশে এই ঋষভদেবের জন্ম। তাঁর একশো ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত। তাঁরই নামে অজনাভ বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। অবশিষ্ট পুত্রের মধ্যে নয়জন কুশাবর্ত ইলাবর্ত ব্রহ্মবর্ত মলয় কেতু ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃক বিদর্ভ ও কীকট নামে ভূখণ্ডের রাজা হয়েছিলেন। একাশীজন পুত্র কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং বাকী নয়জন আত্মবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। সংসারের কিছুতে তাঁদের আসক্তি ছিল না এবং তাঁরা দিগম্বর হয়েই সর্বত্র বিচরণ করতেন। তাঁদের নাম কবি হরি অন্তরিক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রুমিল চমস ও করভাজন।

একদিন তাঁরা বিচরণ করতে করতে রাজা নিমির যজ্ঞস্থলে উপনীত হলেন। বিদেহ রাজ তাঁদের পূজা করে বললেন, যে ধর্মের অনুশীলনে বিষ্ণু প্রসন্ন হন, আপনারা সেই ধর্মের কথা বলুন। কবি বললেন, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি মিথ্যা ও অনিত্য। একে আত্মা ভাবলে চিত্তে শান্তি থাকে না। ভগবানের চিন্তাতেই সর্ববিধ ভয়ের নিবারণ হয়। ভগবান নিজে যে উপদেশ দিয়েছেন, তারই নাম ভাগবত ধর্ম। সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরে সমর্পণ করা উচিত। এই জগৎ মিথ্যা হলেও বিষয়ে আসক্তির জন্য যথার্থ বলে মনে হয়। ভগবানের নাম কীর্তনে হৃদয়ে যখন অনুরাগের উদয় হয়, তখন ভক্ত উন্মাদের ন্যায় আচরণ করেন।

নিমি বললেন, এবারে আপনি ভক্তের পরিচয় বলুন। এর উত্তরে হরি বললেন, যিনি সর্বভূতে হরিকে দেখেন, তিনিই ভাগবত প্রধান।

যিনি ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তের সঙ্গে মিত্রভাব, অনভিজ্ঞ জনে কৃপা ও বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করেন, এই রকম ভেদদর্শী ভক্ত মধ্যম শ্রেণীর ভাগবত। ভগবান সর্বব্যাপী জেনেও যিনি শালগ্রাম প্রভৃতি প্রতিমায় বিষ্ণুপূজা করেন এবং অন্যত্র ভগবদ্ভাব উপলব্ধিতে অক্ষম হন, তিনি নিকৃষ্ট স্তরের ভক্ত। শুধু ধন পুত্রে নয় দেহেও যাঁর আত্মীয় পর ভেদজ্ঞান থাকে না, তিনিই ভগবদ্ভক্ত।

নিমি বললেন, বিষ্ণুর মায়ার বিষয়ে আমি শুনতে চাই, আপনারা বলুন। অন্তরিক্ষ বললেন, বিষ্ণু জীবের দেহে অন্তরাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হয়ে অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা রূপে এক রকম এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় রূপে দশ প্রকারে জীবকে বিষয় ভোগ করাচ্ছেন ও জীব দেহে আত্মজ্ঞানে ভোগে আসক্ত হচ্ছে। এই ভাবেই তারা প্রলয় পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর স্রোতে ভাসছে।

নিমি বললেন, জীব এই মায়া কী ভাবে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে, এবারে তাই বলুন। প্রবুদ্ধ বললেন, সুখের আশায় মানুষ বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু সংসারের জন্য সস্ত্রীক ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেও বিপরীত ফল ভোগ করে। ইহলোকে সুখের সমস্ত পদার্থই অনিত্য, পরলোকে স্বর্গাদিও নশ্বর। এই মায়া থেকে নিস্তার পেতে হলে ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর শরণাগত হওয়া বিধেয়।

নিমি বললেন, পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ বলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। পিপ্পলায়ন বললেন, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ সেই পরম তত্ত্বই ব্রহ্মস্বরূপ। পরম ব্রহ্ম প্রমাণের বিষয় নন বলে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়।

নিমি বললেন, যে কর্মযোগের অনুষ্ঠানে মানুষ এই জন্মেই পবিত্র হয়ে পরমাত্মাকে অবগত হতে পারেন, আপনারা সেই উপদেশ দিন। আবির্হোত্র বললেন, আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষ যদি বেদবোধিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ জনিত পাপে লিপ্ত হয়ে জন্মান্তর ভোগ করে। কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেই

ব্রহ্মলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যিনি অহঙ্কার বৃত্তি আশু ছেদন করতে চান, তিনি বেদের বিধানের সঙ্গে তন্ত্রের বিধি সমবায়ে কেশবের আরাধনা করতে পারেন।

নিমি বললেন, হরি যে সব অলৌকিক কাজ করেছেন করছেন বা পরে করবেন তা আমাকে বলুন। দ্রুমিল বললেন, নারায়ণ যখন নিজে দেহ ধারণ করেন, তখনই তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন। তিনি রজো গুণে ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু ও তমো গুণে রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। দক্ষের কন্যা ও ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে তিনি নর ও নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বদরিকাশ্রমে তাঁদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ইন্দ্র কামের সঙ্গে অপ্সরাদের পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের কাজে ঋষিরা বিরক্ত হলেন না। বললেন, তোমরা তো নিরপরাধ। তোমরা এই আশ্রমে বিশ্রাম করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। এই বলে কয়েকজন অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী নারী সৃষ্টি করে বললেন, এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই নিয়ে যাও। তাঁরা শ্রেষ্ঠ অপ্সরা উর্বশীকে নিয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। বিস্মিত হলেন দেবরাজ। জীবের মঙ্গলের জন্য নারায়ণই হংস দত্তাত্রেয় সনৎকুমার ও আমাদের পিতা ঋষভ প্রভৃতি মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনিই মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে সত্যব্রত মনুর সাহায্যে পৃথিবী ওষধি ও ঋষিদের রক্ষা করেন, বরাহ রূপে পৃথিবী উদ্ধার করে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ বধ করেন। অমৃতের জন্য দেবাসুর যখন সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তিনিই কূর্মের মূর্তিতে মন্থনদণ্ড মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তিনিই কুমীরের হাত থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন। যেখানে কোন অবতারের নামের উল্লেখ নেই, সেখানেও তিনি অব্যক্ত শক্তির সঞ্চারে মঙ্গলপ্রদ কাজ করেছেন। গোষ্পদে পতিত বালখিল্য ঋষিদের তিনিই উদ্ধার করেছিলেন। বৃত্রাসুর বধে ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে ইন্দ্রকেও রক্ষা করেন তিনি। আবার অসুরদের ভয়ে দেবতারা পালিয়ে গেলে তাঁদের বন্দী পত্নীদেরও তিনি রক্ষা করেন। আবার প্রহ্লাদকে

রক্ষার জন্য তিনিই নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং বামন রূপে বলির ঐশ্বর্য হরণ করে ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তিনি পরশুরাম রূপে জন্মগ্রহণ করে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তারপর রাম হয়ে জন্মে রাবণ বধ করে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণ হয়ে জন্মে, পৃথিবীর ভার হরণ করবেন। পরে বুদ্ধ নামে জন্মগ্রহণ করে দৈত্যের অংশে উৎপন্ন ব্যক্তিদের বেদ-বিরুদ্ধ বিতর্ক দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরস্ত করবেন এবং কলিযুগের অন্তে তিনি কল্কি নামে দেহ ধারণ করে ম্লেচ্ছ রাজাদের নিধন করবেন।

নিমি বললেন, অনেকেই তো হরিকে ভজনা করে না। তাদের কী গতি হবে বলুন। চমস বললেন, পরম পুরুষকে যারা ভজনা করে না, তারা কৃতঘ্নতা দোষে নিজেদের বর্ণ ও আশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়। যাদের অদৃষ্টে হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন ঘটে না তাদের প্রতি এবং স্ত্রীজাতি ও শূদ্রাদির প্রতি আপনাদের অনুকম্পা থাকা উচিত। মূর্খ জনগণ বেদের আপাতমধুর বাক্যে প্রলোভিত হয়ে সেই সব অনুষ্ঠানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। তারা নারীর প্রেমেই আসক্ত থাকে এবং রসনার তৃপ্তির জন্যই জীবহিংসা করে। স্ত্রী সম্ভোগ আমিষ ভোজন ও মদ্য পানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচারের বিধি নেই। বিবাহ করে পত্নী সম্ভোগ, যজ্ঞে আমিষ ভোজন ও সৌত্রামণি প্রভৃতি যজ্ঞে মদ্য পান করা চলে। মদ্য পান না করে ঘ্রাণেও সিদ্ধি লাভ হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে পশু হত্যায় হিংসার পাপ হয় না এবং শুধু পুত্র লাভের জন্যই স্ত্রী সম্ভোগ করা চলে।

নিমি বললেন, ভগবান কোন্ সময়ে কী রূপে আবির্ভূত হন তা বলুন। করভাজন বললেন, সত্য যুগে তিনি ব্রহ্মচারীর বেশে, ত্রেতায় যজ্ঞ মূর্তিতে এবং দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হন। কিন্তু কলিযুগে মানুষ বিবিধ তন্ত্রোক্ত প্রকারে তাঁর আরাধনা করবেন। কলিযুগে মুক্তির উপায় সুগম হবে।

নারদ বসুদেবকে বললেন, এই ভাবে প্রশ্ন করে বিদেহরাজ নিমি নয়জন যোগীন্দ্রের মুখে ভাগবত ধর্মের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের অর্চনা করলেন। আপনিও এই ধর্মের অনুষ্ঠান করে পরমপদ লাভে সমর্থ হবেন।

উদ্ধব গীতা

শুক বললেন, দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে ব্রহ্মা ও শিব কৃষ্ণকে দেখবার জন্য দ্বারকায় এলেন। কৃষ্ণের স্তব করে ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবীর ভার হরণের কাজ আপনি সুসম্পন্ন করেছেন। ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনার বয়স এখন একশো পঁচিশ। দেবতাদের কোন কাজ আর বাকি নেই। তাই এখন আপনি বৈকুণ্ঠে ফিরে চলুন। ভগবান বললেন, যদুকুলের উপসংহার বাকি আছে। আমি যদি এদের সংহার না করে লোকান্তরে যাই, তবে এরা সমুদায় লোক বিনষ্ট করবে। ব্রাহ্মণের শাপে এদের বিনাশ আরম্ভ হয়েছে। এদের কুল নির্মূল হলেই আমি বৈকুণ্ঠে ফিরব। কৃষ্ণের এই কথা শুনে সবাই ফিরে গেলেন।

এর পর কৃষ্ণ দ্বারাবতীতে নানা উৎপাত আরম্ভ হতে দেখে প্রাচীনদের বললেন, এখানে আমাদের আর বাস করা উচিত নয়। চলুন আমরা প্রভাস তীর্থে যাই।

কৃষ্ণের এই আদেশে যাদবেরা প্রভাস তীর্থে যাবার জন্য রথে অশ্বযোজনা করতে লাগলেন। এই সব দেখে উদ্ধব এসে কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, ব্রাহ্মণের অভিশাপ অন্যথা করতে সমর্থ হয়েও তুমি তা করলে না। এবারে বোধহয় যদুবংশ ধ্বংস করে নরলোক ত্যাগ করবে। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না, তুমি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

উদ্ধবের এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বলছ তাই আমার অভিপ্রেত। পরস্পরে বিবাদ করে যদুকুল ধ্বংস হবে এবং সপ্তম

দিনে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরী জলে প্লাবিত করবে। আমি এই মরলোক ত্যাগ করলেই কলির প্রভাবে সংসারে আর কল্যাণের লেশমাত্র থাকবে না। তুমি আর এখানে থেকো না।

উদ্ধব বললেন, তুমি আমাকে মোক্ষের জন্যই সন্ন্যাস লক্ষণ ত্যাগের কথা বলেছ। আমি যাতে অনায়াসে তোমার কথা মানতে পারি, তুমি আমাকে সেই শিক্ষা দাও।

ভগবান বললেন, আত্মাকে বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত করতে হবে। আত্মাই মানুষের গুরু, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দিয়ে এই আত্মাই জীবকে শ্রেয় বুঝতে শেখায়।—

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ১১।৭।২০

আত্মার দ্বারাই আত্মার সম্যক উদ্ধার হয়। বিদ্বানরা অবধূত ও যদুর সংবাদ নামে একটি প্রাচীন ইতিহাস এর উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন। যদু এক অবধূত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে বুদ্ধি লাভ করে আপনি সংসারে বালকের মতো বিচরণ করেন, সেই বুদ্ধি আপনি কোথায় পেয়েছেন? ব্রাহ্মণ বললেন, নিজের বুদ্ধিতে শরণাগত হয়ে আমি অনেক শিখেছি। তোমাকে আমি সেই সব গুরুর কথা বলছি, শোন। চব্বিশজন আমার গুরু। ক্ষমাব্রত আমি পৃথিবীর নিকটে শিখেছি। পরের জন্যই যে জন্ম ও জীবন তা পর্বতের নিকটে শিখবে এবং বৃক্ষের নিকটে পরোপকার ও পরাধীনতা শিখবে। আহারের অভাবে জ্ঞান নষ্ট না হয় এবং বাক্যে মন বিক্ষিপ্ত না হয়, দেহরক্ষার উপযোগী এই শিক্ষা নিতে হয় প্রাণ বায়ুর নিকটে। বায়ু যেমন সর্বত্র গিয়েও কিছু গায়ে মাখে না, তেমনি বিষয় ভোগ করেও তাতে অনুরাগী হতে নেই। আকাশের মতো অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সমান হতে হবে এবং জলের মতো সব কিছুকে পবিত্র করতে হবে নিজের আচরণে। অগ্নি যেমন সর্বভুক হয়েও অপবিত্র হয় না, তেমনি অন্যের পাপ গ্রহণ করেও নিজেকে নিষ্পাপ থাকতে হবে।

যেমন কলার ক্ষয় আছে অথচ চন্দ্রের নেই, তেমনি দেহের ক্ষয় আছে অথচ আত্মার নেই। জলে সূর্যের একাধিক প্রতিবিম্বের মতো স্থূল বুদ্ধির মানুষ আত্মাকে বহু রূপে দেখে। সংসারে অতিরিক্ত আসক্তির জন্য কপোতের মতো সন্তাপ পেতে হয়। শাবকদের ব্যাধের জালে আবদ্ধ দেখে প্রথমে কপোতী ও পরে কপোতও জালে আবদ্ধ হয়েছিল। স্বর্গে যেমন তেমনি নরকেও ইন্দ্রিয় সুখ আছে। কিন্তু যাঁর বিবেক আছে, তিনি এ সুখ চাইবেন না। দৈবে যা পাওয়া যায় তাই আহার করবেন, কিছু না পেলে অজগরের মতো নিরুদ্যমে শুয়ে থাকবেন। নারী ভগবানের মায়া, তাকে দেখে প্রলুব্ধ হলে নরকে যেতে হয়। ভিক্ষু সঞ্চয়ী হবেন না। সন্ন্যাসী কাঠের যুবতীকেও স্পর্শ করবেন না এবং বনচর যতি কখনও গ্রাম্য গীত শুনবেন না। রসনাকে জয় করতে পারলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। আমি বিদেহ নগর মিথিলায় পিঙ্গলা নামের এক বেশ্যার কাছে যা শিখেছি তা শোন। একদিন রাতে সে সাজসজ্জা করে তার গৃহের দ্বারে বসে ছিল। পথে যাতায়াতকারী পুরুষদের দেখে সে ভাবছিল যে কেউ বোধ হয় তার কাছে আসবে। এই ভাবে ঘর বার করে নিশীথ-কাল উপস্থিত হলে তার বৈরাগ্য উৎপন্ন হল। সে বলল, বিজ্ঞান বিরহিত মানুষ যেমন মমতা ত্যাগ করতে পারে না, তেমনি বৈরাগ্য-রহিত মানুষও আশ-পাশ মুক্ত হতে পারে না। নিজের মনকে জয় করতে না পেরেই আমি পুরুষের কাছে ভোগ ও ধন চাইছি। এখন থেকে আমি নিজের আত্মার কাছেই আত্ম বিক্রয় করে আনন্দ লাভ করব। যথালাভে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের আত্মার সঙ্গেই অহরহ বিহার করব। আশাই পরম দুঃখ এবং পরম সুখ নৈরাশ্যে।—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। ১১।৯।৪৪

যে বস্তু মানুষের সবচেয়ে প্রিয় তা পরিগ্রহই দুঃখের কারণ হয়, তাই যিনি তা গ্রহণ করেন না তাঁরই অনন্ত সুখ লাভ হয়। কুরর অর্থাৎ চিল জাতীয় পক্ষীর মুখে আমিষ দেখে শ্যেন ও গৃধ্র তার প্রাণ

বিনাশের উদ্যোগ করে, সেই আমিষ ত্যাগ করে কুরর রক্ষা পায়। মান-অপমানের জন্য আমার সুখ দুঃখ নেই, গৃহস্থদের মতো চিন্তাও নেই। আমি পরমাত্মাব প্রেমেই আত্মহারা হয়ে বালকের মতো বিচরণ করি। এক কুমারীর কাছে আমি শিখেছিলাম যে বহু লোকেব একত্র বাসে কলহ হয়, দুজনেও হয় আলাপ। তাই একাকী বিচরণ করা কর্তব্য। মহেশ্বর মাকড়শার মতো জাল তৈরি করে তাতে বিহার করে নিজের সৃষ্টিকে আবার গ্রাস করেন। আরশোলা যেমন কাঁচপোকার ভয়ে কাঁচপোকায় পরিণত হয়, তেমনি দেহী তার মনকে স্নেহ দ্বেষ বা ভয়ে নিশ্চল ভাব ধারণ করলে সমান রূপ পায়। উৎপত্তি বিনাশ শীল এই দেহকেও আমি গুরু মনে করি।

কৃষ্ণ বললেন, সেই অবধূত ব্রাহ্মণ দত্তাত্রেয় যদুকে এই কথা বলে চলে গেলেন। আমাদের আদিপুরুষ যদু সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বত্র সমচিত্ত হলেন। তুমিও প্রবৃত্তির পথ পরিহার করে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন কর। আত্মা সুখ দুঃখের ভোক্তা নয়, মৃত্যুর অধীনও নয়। সে স্ব-তন্ত্র। সুখ দুঃখ এখানে যেমন, স্বর্গেও তেমনি।

উদ্ধব বললেন, জীব কী ভাবে নিত্য বদ্ধ বা নিত্য মুক্ত হতে পারে, আমার এই সংশয় দূর কর।

কৃষ্ণ বললেন, বন্ধন বা মুক্তি আত্মার স্বরূপ নয়, তা মায়াময় গুণের জন্য। এক বৃক্ষেব উপরে দুটি পক্ষীর একটি ফল খায় ও অপরটি শুধু দেখে। যিনি বিদ্বান তিনি কর্মফল ভক্ষণ করেন না, তিনি আত্মাকে জানেন। আর যিনি কর্মফল ভোক্তা তিনি আত্মা ও পরমাত্মাকে জানেন না। যিনি অবিদ্যায় যুক্ত তিনি নিত্য বদ্ধ এবং যিনি বিদ্যাময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তিনি নিত্য মুক্ত।

উদ্ধব বললেন, কী রকম ভক্তি ভাল তাই বল।

কৃষ্ণ বললেন, পরদুঃখে কাতর অহিংস ও শত্রু মিত্রে সমভাবাপন্ন সত্যনিষ্ঠ মানুষই শ্রেষ্ঠ সাধু। সাধুসঙ্গে ও ভক্তি যোগেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

উদ্ধব বললেন, তোমার কথায় কর্ম ত্যাগ করা উচিত কিনা এই সংশয় মনে জেগেছে। তুমি তা দূর কর।

কৃষ্ণ বললেন, সংসার তরু অদৃষ্ট রূপে পুষ্প ও সুখ দুঃখের ফল প্রসব করে। পাপ পুণ্য দুটি বীজ। বাসনার শত মূল। গৃধ্র বা বিষয়ভোগী দুঃখের ফলটি এবং হংস বা সন্ন্যাসী সুখের ফলটি ভক্ষণ করে। গুরুর নিকটে অর্জিত বিদ্যার কুঠারে লিঙ্গ দেহ ছেদন করে পরমাত্মাকে পাবার পরেই কর্ম ত্যাগ করতে হয়।

উদ্ধব বললেন, বিষয়কে মানুষ আপদের কারণ বলে জানে, তবু তারা কেন বিষয় ভোগ করে?

কৃষ্ণ বললেন, মনকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে ভগবানে স্থির করতে হয়। সনকাদি ঋষিরা যোগের গতির কথা তাঁদের পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ব্রহ্মা এর উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না দেখে আমি হংস রূপে তাদের কাছে গিয়ে বললাম, দেহ জীবের উপাধি মাত্র, তার স্বরূপ নয়। আমার স্বরূপই যে তার প্রকৃত স্বরূপ, এই তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেই চিত্ত ও বিষয়ের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন বাসনার নিবৃত্তি হয়। গুণের অধীন মনের অবস্থা আমারই মায়ায় কল্পিত। তাই আমার ভজনাতেই ঐ মায়া দূর হয়।

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন, শ্রেয়োলাভের পথ কি সবই সমান?

কৃষ্ণ বললেন, সৃষ্টির আদিতে আমি ব্রহ্মাকে বেদের যে বাণী বলেছিলাম, তা কালক্রমে নানা জনের উপদেশে ভিন্ন রূপ পেয়েছে। যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি পুরুষার্থ শোকদুঃখপ্রদ অনিত্য ফল ভোগের জন্য। ভগবানে আত্মসমর্পণেই পরম সুখ লাভ হয়, বিষয়ভোগীরা এ সুখের অধিকারী হয় না।

উদ্ধব বললেন, ধ্যান কী ভাবে করতে হয়?

কৃষ্ণ বললেন, আসনে ঋজু ভাবে উপবিষ্ট হয়ে আমার চতুর্ভুজ মূর্তি ধ্যান করবে। তারপর অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও ধারণার কথায়

বললেন, যিনি যে-রকমের ধারণা নিয়ে আমার কোন বিশেষ রূপের ধ্যান করেন তিনি সেই সিদ্ধি লাভ করেন।

উদ্ধব বললেন, তোমার বিভূতির কথা আমি শুনতে চাই।

কৃষ্ণ বললেন, কুরুক্ষেত্রে আমি অর্জুনকে এই কথা বলেছিলাম। আমি সকল জীবের অন্তরাত্মা ও অধিষ্ঠান, আমার বিভূতির কোন শেষ নেই। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আমি সৃষ্টি করেছি ও করছি। কে আমার বিভূতির হিসেব রাখবে!

উদ্ধব বললেন, কী ভাবে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করলে ভগবানে ভক্তি হয় তাই বল।

কৃষ্ণ বললেন, কল্পের আদিতে মানুষের হংস নামে একটি বর্ণ ছিল। জন্মেই তারা কৃত-কৃতার্থ হত বলে সেই যুগের নাম কৃত বা সত্য যুগ। ত্রেতায় বেদ বিদ্যা ও যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। তারপর আমার মুখ বাহু উরু ও চরণ থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এবং জঘন থেকে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্য, বক্ষ থেকে বাণপ্রস্থ ও মস্তক থেকে সন্ন্যাস আশ্রম উৎপন্ন হয়। গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে মিলন পান্থশালায় পথিকের মিলনের মতো। নিদ্রা-ভঙ্গের পর স্বপ্নের মতো দেহান্তে এই সমস্ত সম্পর্কই লোপ পায়।—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থ সঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ১১।১৭।৫৩

এই অনিত্যতা মেনে নিয়ে যে গৃহী অতিথির মতো গৃহে বাস করেন, তিনি মুক্তই থাকেন। তিনি গৃহে অথবা বনে থাকবেন, পুত্রবান হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। বনে যেতে চাইলে সস্ত্রীক বা পুত্রের উপরে পত্নীর ভার দিয়ে বনে গিয়ে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করবেন। এই বাণপ্রস্থ আশ্রমে বিরক্ত হলে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা যায়। সন্ন্যাসীর মুখ্য কর্ম শম ও অহিংসা, বাণপ্রস্থীর তপস্যা ও ঈক্ষা বা তত্ত্ব বিচার, গৃহস্থের পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও ব্রহ্মচারীর আচার্য সেবা। ধর্ম যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তবেই তা মুক্তিপ্রদ হয়। স্বধর্ম পালনেই

পরমাত্মাকে লাভ হয়। তাই জ্ঞান দিয়ে আত্মাকে অবগত হয়ে আর সমস্ত পরিত্যাগ করে জ্ঞানবিজ্ঞান-যুক্ত ভক্তিতে ভগবানের আরাধনা কর।

উদ্ধব বললেন, এইবারে ভক্তিযোগের কথা বল।

কৃষ্ণ বললেন, ভারত যুদ্ধের অবসানে সুহৃদদের মৃত্যুতে বিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে মোক্ষ ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা ধর্মের কথা আমি তোমাকে বলছি। যা নিত্য তা সৎ ও বাকি সব কিছুই নশ্বর—এ জ্ঞানের নাম শুদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান, এতে দেখা জিনিসও ব্রহ্ম বলে মনে হয়। ভক্তিযোগের কথা আমি তোমাকে আবার বলছি। ভগবানে ভক্তিজনক সমস্ত কাজই ধর্ম। জ্ঞান, গুণে অনাক্তি, বৈরাগ্য এবং অনিমাদিকে ঐশ্বর্য বলে মনে করা হয়।

উদ্ধব বললেন, যম ও নিয়ম কত প্রকার এবং শম দম প্রভৃতি কাকে বলে তাই বল।

কৃষ্ণ বললেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ পরধন গ্রহণ না করা, অনাসক্তি, নিন্দিত কর্মে লজ্জা, অসঞ্চয়, ধর্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা ও অভয় এই বারোটি যম এবং শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, অর্চনা, তীর্থভ্রমণ, পরোপকারের চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্য সেবা এই বারোটি নিয়ম। এই যম ও নিয়ম পালন করলে নিবৃত্ত-গণের মোক্ষ ও প্রবৃত্তগণের অভ্যুদয় লাভ হয়। ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা শম, ইন্দ্রিয় সংযম দম, দুঃখ সহা তিতিক্ষা, ধৃতি জিহ্বা ও উপস্থ জয়। জীবের প্রতি বিরোধ ভাবের ত্যাগই প্রকৃত দান, ভোগে উপেক্ষাই তপস্যা, বাসনা জয়ই দেবত্ব, সমদর্শনই সত্য, প্রিয় ও সত্য কথাই ঋত, অধর্মে অনাসক্তিই শৌচ এবং ত্যাগই সন্ন্যাস। ধর্মই ইষ্ট ও ধন, আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানের উপদেশই দক্ষিণা, মনের দমনই বল, সুখ-দুঃখের অন্বেষণ না করাই সুখ ও আকাঙ্ক্ষার নামই দুঃখ। সত্ত্বগুণের উদয় স্বর্গ, অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, অনাসক্তই প্রভু

এবং আসক্তই দাস। গুণ দোষ দর্শনই দোষ এবং তা না দেখাই গুণ।—

গুণ দোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ। ১১।২০।৪৫

উদ্ধব বললেন, গুণ ও দোষের ভেদ না দেখলে তোমার বিধি-নিষেধ কী ভাবে মানুষকে মুক্তি দেবে?

কৃষ্ণ বললেন, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনটিই মানুষের শ্রেয়ো লাভের যোগ বা উপায়। কর্মে যাঁরা বিরক্ত তাঁদের জন্য জ্ঞান যোগ এবং যাঁদের কামনা আছে তাঁদের জন্য কর্ম যোগ। যিনি বিরক্ত নন, অতিশয় আসক্তও নন এবং আমার কথায় যিনি শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিযোগ তাঁকে পুরুষার্থ প্রদান করে। যতকাল বিরক্তি না আসে বা আমার কথা শুনে শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততকাল নিত্যকর্ম করে যেতে হবে। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাও ব্রহ্মকে অবগত হয়ে মুক্তি লাভ করা যায়। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ম্লেচ্ছবহুল বলে অশুচি; কিন্তু ব্রাহ্মণভক্ত আছে বলে কীকটও শুচি।

উদ্ধব বললেন, তত্ত্বের সংখ্যা কত?

কৃষ্ণ বললেন, ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেন তা যুক্তিযুক্ত।

উদ্ধব বললেন, জড় ও অজড় স্বভাবের জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ তো ভিন্ন, তাদের এই ভিন্নতা কেন দেখা যায় না?

কৃষ্ণ বললেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন, কিন্তু গুণ ক্ষোভকর বলে সৃষ্টি বিকার সম্পন্ন। আমার মায়াও অনেক প্রকার। ভেদজ্ঞান সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়।

ভিক্ষু গীতা-তিতিক্ষু দ্বিজের উপাখ্যান

শুক বললেন, কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, তোমার এ কথা সত্য যে দুর্বিনীত ব্যক্তির দুর্বাক্যে বিতাড়িত মনকে সমাহিত করতে পারে এমন সাধু দেখা যায় না। পরুষ বাক্য হৃদয়কে যেমন বিদীর্ণ করে, বাণে বিদ্ধ হয়েও সে রকম বেদনা অনুভূত হয় না। এই রকম একটি পুরাতন

ইতিহাস তোমাকে বলছি। অবন্তীতে একজন সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ধন উপার্জন করে তিনি শুধু সঞ্চয় করতেন। ধর্মকর্ম উপেক্ষা করে এবং পরিবারবর্গ ও অতিথিকে বঞ্চনা করে লোভীর মতো কালাতিপাত করতেন। কেউই এই কোপনস্বভাব কৃপণের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করত না, বরং অত্যাচারই করত। কালক্রমে তাঁর ধন শেষ হয়ে গেল—জ্ঞাতিরা কিছু নিল, কিছু দস্যুরা অপহরণ করল, কিছু গৃহদাহে নষ্ট হল, বাকি চোর ও রাজা আত্মসাৎ করল। তখন স্বজনেরা সবাই তাঁকে উপেক্ষা করল এবং সুদীর্ঘ চিন্তায় তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হল। তিনি মনে মনে বললেন, ধন কখনও সুখ দেয় না, বরং তা দুঃখেরই কারণ। অর্থ উপার্জনে বিবিধ ক্লেশ ও দুঃখ আছে, তা রক্ষা ও ভোগের জন্যও ভয় ও চিন্তা। অর্থের জন্য নানা অনর্থ এই দুঃখের কারণ হয়। তাই মুক্তিকামী ব্যক্তির এ সব দূর থেকে বিসর্জন করাই উচিত। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, মনে হচ্ছে বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তাই আমার এই বৈরাগ্য এসেছে, এইবারে আমি তপস্যা করব। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করে নগরে ও গ্রামে ভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। এই মলিনবেশধারী বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখে দুরাচারীরা তাঁকে তিরস্কার ও অবমানিত করত। ব্রাহ্মণ ভাবতেন যে জনসাধারণ দেবতা গ্রহ কর্ম বা কাল তাঁর দুঃখের কারণ নয়, আত্মাও দুঃখময় নয়। মনই দুঃখ আনে। মনের অন্তরে নিয়ন্তা রূপে যিনি নিত্য বিদ্যমান, জীবের পরম সখা সেই পরমাত্মা কিন্তু অহংকার বা মমতায় লিপ্ত নন। জীবই তার মনকে আত্মজ্ঞানে স্বীকার করে, মনের স্বরূপে আসক্ত হয় ও বিষয় সম্ভোগে আবদ্ধ হয়। মন যার সমাহিত, কর্মের অনুষ্ঠান তার নিষ্প্রয়োজন। এই আত্মজ্ঞান অনুশীলন করে আমি সংসার অতিক্রম করব। এই ভেবে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষণকালের জন্যও তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। তাই আমি আপনাকে বলছি যে সর্ব প্রযত্নে মনেরই নিগ্রহ করা দরকার।

সাংখ্যযোগ বর্ণনা

কৃষ্ণ বললেন, কপিল প্রভৃতি আচার্যরা যে সাংখ্য শাস্ত্রের কথা বলেছেন, আজ আমি তোমাকে সেই তত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছি। সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞান ও পদার্থ অভিন্ন রূপে পরম ব্রহ্মে বিলীন ছিল। 'আমি বহু হব' এই সংকল্প করে পরম ব্রহ্ম দু ভাগে বিভক্ত হলেন। পদার্থের ভাগ প্রকৃতি ও চৈতন্যের ভাগ পুরুষ নামে অভিহিত হল। পুরুষের প্রেরণায় মহাকালের উত্তেজনায় প্রকৃতির অন্তরে সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণের উদয় হল। এই ত্রিগুণ থেকেই সূত্রাত্মা এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্ঞানশক্তি মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। মহত্তত্ত্বের বিকারে অভিমান নামের অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি। এরই প্রভাবে জীবের ভ্রম হয়। এই অহঙ্কার গুণভেদে ত্রিবিধ এবং পঞ্চ তন্মাত্র দশ ইন্দ্রিয় ও মনের জন্ম এই অহঙ্কার তত্ত্ব থেকেই। তামসিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে। কালের প্রভাবে এই অহঙ্কারের সৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত হয়।

এর পর কৃষ্ণ সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণের প্রভাবে পৃথক ভাবে যে স্বভাবের ও ধর্মের পরিচয় হয়, তার আনুপূর্বিক বর্ণনা করে বললেন, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভের জন্য এই মানুষ জন্ম যেন বৃথা না হয়।

ঐলের উপাখ্যান

কৃষ্ণ বললেন, অসৎ ব্যক্তির সংসর্গে নরকে যেতে হয়। ইলার পুত্র মহারাজ ঐল উর্বশীর বিরহে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে শয্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পুরূরবা 'দাঁড়াও, আমাকে ফেলে যেও না' বলে নগ্ন দেহে তাঁর পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন। গন্ধর্বলোকে পুনর্মিলনেও তাঁর চিত্ত শান্ত হয় নি। তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখে তাঁর কত কাল অতিবাহিত হয়েছিল, সে সংবাদ তিনি রাখেন নি। নিদ্রিতের মতো ভোগেই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

বিবেকের উদয় হলে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন নিজেকে, রাজচক্রবর্তী হয়ে আমি এক কামিনীর হাতে বানরের মতো নেচেছি। ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য স্ত্রীলোক ও স্ত্রৈণের সঙ্গ খুবই অনুচিত। মনে মনে এই কথা ভেবে পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং অন্তরে পরমাত্মার চিন্তায় পরম জ্ঞান লাভ করলেন। তাই বলছিলাম যে দূষিতের সঙ্গ ত্যাগ করে সাধু সঙ্গ করাই বুদ্ধিমানেব কাজ। সাধুরা বিবিধ উপদেশ দিয়ে সংসারীব সংশয় ও মনের গ্লানি দূর করেন। সংসারে তাঁদেব প্রত্যাশা কিছু নেই। শত্রু ও মিত্রে তাঁদের সমদৃষ্টি। নৌকা যেমন নিমজ্জমানের অবলম্বন, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুই সংসারী মানুষের আশ্রয়।

ক্রিয়া যোগ, পরমার্থ ও ভাগবদ্‌ধর্ম নিরূপণ

উদ্ধব বললেন, সাধুরা যে ভাবে তোমার আরাধনা করেন, সেই ক্রিয়া যোগের বিষয় বল।

কৃষ্ণ বললেন, কর্মকাণ্ডের শেষ নেই। এ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ ও প্রকরণও অনেক। বৈদিক তান্ত্রিক ও মিশ্র প্রণালীতে ভগবানের উপাসনা করা যায়। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করলে ভক্তিযোগ লাভ হয়। যে অন্যের স্বভাব বা কর্মে দোষ গুণের অনুসন্ধান করে নিন্দা বা প্রশংসা করে, সে নিজেরই অভিমানে আসক্ত হয়ে আত্ম স্বরূপের উপলব্ধি থেকে ভ্রষ্ট হয়।—

পরস্বভাব কর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদ সত্যভিনিবেশতঃ॥ ১১।২৮।২

এই সংসার মায়াময় মিথ্যা ও কল্পিত বলে এর ভাল ও মন্দ দুই-ই মিথ্যা।—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ১১।২৮।৪

বেদান্ত বিজ্ঞানে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই পরমাত্মা নামে অভিহিত।

তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত, ঈশ্বররূপে মুক্ত এবং তিনিই সব হরণ করেন।

উদ্ধব বললেন, আমাদের জড় দেহে একটি সচেতন পুরুষ আছেন বলে অনুভব করি। জন্ম মৃত্যুর এই স্রোত কার উপরে প্রতিপত্তি করে?

কৃষ্ণ বললেন, দেহের সঙ্গে যখন আত্মার সম্পর্ক ঘটে, তখন এই মিথ্যা সংসারও সত্য বলে মনে হয়। জীবাত্মার সঙ্গে সংসারের সংস্রব না থাকলেও মানুষের পক্ষে ভগবানে ভক্তি থাকা খুবই দরকার। বিষয়ের আসক্তি বিসর্জন দিয়ে যোগের অনুষ্ঠান করলে আত্ম সুখে মগ্ন থাকা যায়।

উদ্ধব বললেন, যোগানুষ্ঠান তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়, সহজে মুক্তিলাভ করা যায় এমন কোন সাধনাব কথা বল।

কৃষ্ণ বললেন, যেখানে আমার ভক্ত সাধুবা বাস কবেন, সেই পবিত্র দেশেই বাস করা উচিত এবং যাঁরা আমার প্রতি ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের কথা শোনা দরকার। সবাই মিলিত হয়ে নৃত্য গীত ও পর্ব উপলক্ষে যাত্রা প্রভৃতি উৎসব করতে হয়। যত দিন জীব মাত্রে ভগবদ্‌ভাবের স্ফূর্তি উপলব্ধি না হয়, তত দিন এই ভাবেই উপাসনা চলবে। মানুষ যখন সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখনই সে অমৃতময় মোক্ষলাভের অধিকারী হয়।

শুক বললেন, কৃষ্ণের এই উপদেশ শুনে উদ্ধব অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইলেন। তারপর প্রণাম করে বললেন, আমি তোমাব শরণাগত। এবারে আমাকে কী করতে হবে বল। কৃষ্ণ বললেন, তুমি বদরিকাশ্রমে যাও। সেখানে তপস্বীর জীবন যাপন করে মোক্ষ লাভ করবে। কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গিয়ে ঘোরতর তপস্যায় পরম গতি লাভ করেছিলেন।

যদুকুল সংহার

পরীক্ষিৎ বললেন, উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গেলে দ্বারকায় কী হয়েছিল তাই বলুন।

শুক বললেন, কৃষ্ণ তাঁর সুধর্মা সভায় আসীন যদুগণকে বললেন, এখানে যেমন উৎপাত দেখা যাচ্ছে, তাতে আর এক মুহূর্তও এখানে বাস করা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়। বালক বৃদ্ধ ও বনিতারা শঙ্খোদ্ধার তীর্থে যান, আমরা প্রভাস তীর্থে যাব। কৃষ্ণের কথায় যদু বারগণ নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে রথে প্রভাস তীর্থে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা মৈরেয়ক নামে মদ্য পান করে উন্মত্ত হলেন। তারপর এক বিষম কলহে ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে সমুদ্র তীরেই পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং পরস্পরের শর প্রহারে নিহত হতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন সাম্বের সঙ্গে, অক্রূর ভোজের সঙ্গে, অনিরুদ্ধ সাত্যকির সঙ্গে, সুভদ্র সংগ্রামজিতের সঙ্গে, কৃষ্ণের ভাই গদ কৃষ্ণের পুত্র গদের সঙ্গে এবং সুমিত্রা সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘোর মোহে অভিভূত হয়ে পুত্র পিতার সঙ্গে, ভ্রাতা ভ্রাতার সঙ্গে, দৌহিত্র মাতামহের সঙ্গে, ভাগিনেয় মাতুলের সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অস্ত্র শস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা ব্রহ্মশাপে মুষলের চূর্ণ থেকে উৎপন্ন এরকা তৃণই অস্ত্র রূপে সংগ্রহ করলেন। মুঠোর মধ্যে এই তৃণগুচ্ছই যেন লোহার দণ্ডে পরিণত হল। কৃষ্ণ তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলে কৃষ্ণ ও বলরামকেই তাঁরা শত্রু বোধে তাঁদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করলেন। তখন তাঁরাও ক্রুদ্ধ হয়ে মুঠোয় এরকা গুচ্ছ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাদবদের বধ করতে লাগলেন। এই ভাবে সমগ্র যদুকুল বিনষ্ট হলে কৃষ্ণ ভাবলেন যে পৃথিবীর ভার হরণ করা হল।

কৃষ্ণের পরম ধাম গমন

বলরাম সমুদ্রের তীরে গিয়ে যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে একটি পিপ্পল বৃক্ষের মূলে

হেলান দিয়ে মাটিতে বসলেন। এই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ মুষলের লৌহখণ্ডে নির্মিত বাণ হাতে নিয়ে মৃগের অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল। কৃষ্ণের চরণ পদ্মকেই সে মৃগভ্রমে বিদ্ধ করল। তারপরেই কৃষ্ণকে দেখে বলে উঠল, আমাকে ক্ষমা করুন। কৃষ্ণ বললেন, তোমার ভয় নেই। এ সবই আমার ইচ্ছায় হয়েছে। জরা কৃষ্ণকে প্রণাম করে বিমানে স্বর্গে গেল এবং কৃষ্ণের অন্বেষণে দারুক এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর গরুড়ধ্বজ রথ সকলের সামনেই আকাশে অন্তর্হিত হল। কৃষ্ণ বললেন, তুমি দ্বারাবতী গিয়ে আমাদের সংবাদ দিও। বোলো যে সমুদ্র অবিলম্বে এই স্থান প্লাবিত করবে। আমার পিতামাতা ও পরিবারবর্গ যেন অর্জুনের তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তুমিও বিষয় চিন্তা ছেড়ে জ্ঞানের পথ ধর। দারুক কৃষ্ণকে প্রণাম করে দ্বারকাপুরে প্রস্থান করলেন।

তারপর ব্রহ্মা, ভবানীর সঙ্গে শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি সবাই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা গান করতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। সবাইকে দেখে কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন এবং বৈকুণ্ঠে গেলেন। তাঁর সঙ্গেই সত্য ধর্ম ধৃতি কীর্তি ও শ্রী পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হল।

এদিকে দারুক দ্বারকায় গিয়ে যদুবংশের নিধন বার্তা নিবেদন করলেন। দেবকী রোহিণী ও বসুদেব শোকে মূর্ছিত হলেন এবং প্রভাসেই প্রাণত্যাগ করলেন। স্ত্রীরা মৃত পতির দেহ আলিঙ্গন করে চিতারোহণে মৃত্যু বরণ করলেন। অর্জুন বন্ধুদের পারলৌকিক কাজ করলেন। কৃষ্ণের গৃহ ছাড়া আর সব কিছু সমুদ্রের জলে প্লাবিত হল। অর্জুন জীবিত স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন এবং অনিরুদ্ধর পুত্র বজ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। অর্জুনের মুখে সুহৃদদের নিধনবার্তা শুনে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তাঁদের বংশধরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে হিমালয় যাত্রা করলেন।

দ্বাদশ স্কন্ধ

ভাবী রাজবংশ বর্ণনা

পরীক্ষিৎ বললেন, কৃষ্ণের পর কার বংশ পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হবেন তা বলুন।

শুক বললেন, বৃহদ্রথ বংশের শেষ রাজা পুরঞ্জয়কে বধ করে তাঁর অমাত্য শুনক নিজের পুত্র প্রদ্যোৎকে রাজা করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র পালক, তাঁর পুত্র বিশাখযূপ, তাঁর পুত্র রাজক এবং তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন এই পাঁচজন রাজা একশো আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব ভোগ করবেন। তারপর রাজা হবেন শিশুনাগ। তাঁর বংশে কাকবর্ণ ক্ষেমধর্মা ক্ষেত্রজ্ঞ বিম্বিসার অজাতশত্রু দর্ভক অজয় নন্দিবর্ধন ও মহানন্দি এই দশজন রাজা কলিযুগে তিনশো ষাট বৎসর রাজত্ব ভোগ করবেন। তারপর মহানন্দির এক শূদ্রা পত্নীর গর্ভে জাত পুত্র নন্দ রাজা হবেন। মহাপদ্ম নন্দের আদেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না, তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের মতো একচ্ছত্র পৃথিবী শাসন করবেন। তাঁর সুমাল্য প্রভৃতি নামে আট পুত্র একশো বৎসর পৃথিবী ভোগ করবেন। কোন এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ এই নয়জনের বংশের শেষ রাজাকে উন্মূলীত করে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও তাঁর পুত্র অশোকবর্ধন। অশোকবর্ধনের পুত্র সুযশা, তাঁর পুত্র সঙ্গত, তাঁর পুত্র শালিশূক, তাঁর পুত্র সোমশর্মা, তাঁর পুত্র শতধন্বা এবং শতধন্বার পুত্র বৃহদ্রথ। মৌর্য বংশের এই দশজন রাজা একশো সাঁইত্রিশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করবেন।

অতঃপর বৃহদ্রথকে বধ করে তাঁর সেনাপতি শুঙ্গ বংশের পুষ্যমিত্র রাজা হবেন। পুষ্যমিত্রের পর অগ্নিমিত্র সুজ্যেষ্ঠ বসুমিত্র ভদ্রক পুলিন্দ ঘোষ বজ্রমিত্র ভাগবত ও দেবভূতি নামে শুঙ্গ বংশের দশজন রাজা একশো বৎসরের অধিক রাজত্ব করবেন। তারপর এই পৃথিবী কণ্বদের হস্তগত হবে। শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা দেবভূতিকে বধ করে

তাঁর অমাত্য কণ্ব বংশের বসুদেব রাজা হবেন। এই বংশের রাজারা তিনশো পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করবেন।

শেষ রাজা সুশর্মাকে বধ করে তাঁর ভৃত্য বলী নামে অন্ধ্র জাতীয় এক শূদ্র কিছুকাল পৃথিবী ভোগ করবেন। তারপর বলীর ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হবেন। তাঁর পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ ও তাঁর পুত্র পৌর্ণমাস, তাঁর পুত্র লম্বোদর, তাঁর পুত্র চিবিলক, তাঁর পুত্র মেঘস্বাতি, তাঁর পুত্র অটমান, তাঁর পুত্র অনিষ্টকর্মা, তাঁর পুত্র হালেয়, তাঁর পুত্র তলক তাঁর পুত্র পুরীষভীরু, তাঁর পুত্র সুনন্দন, তাঁর পুত্র চকোর এবং চকোরের বহু পুত্র হবে। রাজা হবেন কনিষ্ঠ শিবস্বাতি। তাঁর পুত্র গোমতী, তাঁর পুত্র পুরীমান, তাঁর পুত্র মেদশিরা, তাঁর পুত্র শিবস্কন্দ, তাঁর পুত্র যজ্ঞশ্রী, তাঁর পুত্র বিজয়, তাঁর পুত্র চন্দ্রবিজ্ঞ, তাঁর পুত্র সলোমধি রাজা হবেন। বলী প্রমুখ এই সব অন্ধ্র রাজা চারশো ছিয়াশী বৎসর পৃথিবী ভোগ করবেন।

এর পর অবভৃতি নগরীর সাতজন আভীর রাজা, দশজন গর্দভী রাজা এবং ষোলজন কঙ্ক রাজা পৃথিবী পালন করবেন। এর পর আটজন যবন, চৌদ্দজন তুরস্ক, দশজন গুরুণ্ড ও এগারজন মৌল রাজা হবেন। আভীর থেকে গুরুণ্ড পর্যন্ত পঁয়ষট্টিজন রাজা এক হাজার নিরানব্বুই বৎসর পৃথিবী ভোগ করবেন। এগারজন মৌল রাজা তিনশো বৎসর রাজত্ব করবেন।

এঁদের পর কিলকিলা নগরীতে ভূতনন্দ বঙ্গিরি শিশুনন্দি যশোনন্দি ও প্রবীরক রাজা হয়ে একশো ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন। ভূতনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন রাজার বহ্লিক নামে তেরজন পুত্র রাজা হবেন। তারপর রাজা হবেন পুষ্পমিত্র নামে এক ক্ষত্রিয় ও তাঁর পুত্র দুর্মিত্র। তারপর সাতজন অন্ধ্র, সাতজন কোশল বিদূরপতি ও নিষধ-পতিরা একই সময়ে রাজত্ব করবেন। তারপর বিশ্বস্ফূর্জি মগধের রাজা হবেন। তিনি পদ্মাবতী পুরীতে ক্ষত্রিয় জাতিকে উৎসন্ন করে নিজের রাজ্যে নীচ জাতের প্রজা রাখবেন ও গঙ্গাদ্বার থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত

রাজত্ব ভোগ করবেন। সৌরাষ্ট্র অবন্তি আভীর শূর অর্বুদ ও মালব দেশের দ্বিজগণও ব্রাত্য হয়ে পড়বেন এবং রাজারাও শূদ্রতুল্য হবেন। তখন ব্রাত্য দ্বিজ শূদ্র ও ম্লেচ্ছরা সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা নদীর তীর ও কাশ্মীর মণ্ডল ভোগ করবেন।

কল্কি অবতার কথা

শুক বললেন, কালের প্রভাবে ধর্ম সত্য ক্ষমা দয়া আয়ু বল ও স্মৃতি নষ্ট হতে থাকবে। কলি যুগে বিত্তই মানুষের আচার ও উৎকর্ষের কারণ হবে এবং বলেই ধর্ম ও ন্যায় নিরূপিত হবে। অভিরুচি মতে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, রতি কৌশলেই স্ত্রী পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, প্রবঞ্চনায় ক্রয়-বিক্রয়, সূত্র ধারণে ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড ও অজিনে আশ্রম, চটুল বাক্যে পাণ্ডিত্য এবং দম্ভে সাধুত্ব নিরূপণ হবে। উদর পূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্ব ভরণই দক্ষতা ও যশোলাভের জন্যই ধর্ম বলে বিবেচিত হবে। যিনি বলবান তিনিই রাজা হবেন। তিনিই প্রজার ধন অপহরণ করবেন। অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষে, করভারে পীড়িত হৃতদার প্রজারা বনে পালিয়ে যাবে, বা প্রাণত্যাগ করবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবাদ হিম রৌদ্র ও ব্যাধিতে তাদের আয়ু হবে পঞ্চাশ বৎসর।

এই ভাবে কলিযুগ প্রায় অতীত হলে ধর্ম উদ্ধারের জন্য শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে বিষ্ণু কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি দেবদত্ত নামে এক অশ্বে আরোহণ করে পৃথিবী বিচরণ করে কোটি কোটি রাজবেশধারী প্রচ্ছন্ন দস্যুকে বধ করবেন। তারপর সত্য যুগ আরম্ভ হবে। পুরাবিদরা বলেন যে কৃষ্ণ যেদিন নিজ ধামে যান, সেই দিন থেকেই কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে। চন্দ্র বংশের শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও সূর্য বংশের মরু এখন কলাপ গ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের অবসানে তাঁরাই বর্ণাশ্রম যুক্ত ধর্ম সংস্থাপন করবেন।

যুগধর্ম

শুক বললেন, রাজাদের পৃথিবী জয়ে ব্যাকুল দেখে পৃথিবী হেসে ভেবেছিলেন, যমের খেলার পুতুল রাজারা আমাকে জয় করতে চায়। যাঁরা আমাকে জয় করেছিলেন, তাঁদের কথাই এখন শুধু অবশিষ্ট আছে। আমি তো তাঁদের কথা আপনাকে বললাম, আপনি কৃষ্ণের কথা শুনুন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কলিযুগে কলির দোষ কী ভাবে জনগণ দূর করতে পারবেন তাই বলুন।

শুক বললেন, সত্য যুগে ধর্মের চারি পাদ সত্য দয়া তপস্যা ও দান। ত্রেতায় এক পাদ নষ্ট হয়ে অধর্মের একটি পাদ যুক্ত হয়। দ্বাপরে আর একটি পাদ হ্রাস হয়ে অধর্মেরই আর এক পাদ যুক্ত হয়। কলিতে ধর্মের একটি পাদই অবশিষ্ট থাকে। মিথ্যা হিংসা অসন্তোষ ও কলহ অধর্মের এই চার পাদে সমস্তই পূর্ণ হবে। মানুষ নীচ কামুক দরিদ্র ও স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাচারিণী হবে। জনপদ দস্যুপ্রধান, বেদ পাষণ্ড কর্তৃক দূষিত, রাজারা প্রজাশোষণকারী, ব্রাহ্মণ শিশ্নোদর-পরায়ণ, ব্রহ্মচারী ব্রতহীন, গৃহস্থ ভিক্ষাজীবী, তপস্বী গ্রামবাসী ও সন্ন্যাসী অর্থলোভী হবেন। নারী নির্লজ্জা হবে, বণিক হবে প্রবঞ্চক এবং নিন্দিত কার্যই জীবিকার জন্য উত্তম বৃত্তি মনে হবে। লোকে নিজের ভাই বন্ধুকে ছেড়ে স্ত্রীর আত্মীয়ের পরামর্শ নেবে। পাঁচ গণ্ডা কড়ির জন্যেও লোকে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করবে। লোকে কৃষ্ণের পূজাও প্রায়শ করবে না। অথচ সত্য যুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে বিষ্ণুর পরিচর্যায় যে ফল, কলি যুগে হরিনাম কীর্তনেই সেই ফল পাওয়া যাবে।

স্থিতি ও প্রলয়

শুক বললেন, চার হাজার যুগ ব্রহ্মার এক দিন বা কল্প। এক কল্পে চোদ্দজন মনু। এক দিনের অবসানে প্রলয় কাল ব্রহ্মার এক

রাত্রি। এর নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। বিশ্বস্রষ্টা তখন অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। এ ছাড়া প্রাকৃতিক প্রলয় আছে। জীবাত্মা যখন জ্ঞানের দ্বারা মায়াময় অহঙ্কার ত্যাগ করে পরমাত্মাকে অনুভব করে, সেই মোক্ষকে আত্যন্তিক প্রলয় বলে। জীবের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশকে নিত্য প্রলয় বলে।

আত্মতত্ত্ব

শুক বললেন, মহারাজ, 'আমি মরে যাব' এই পশু-বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। দেহের মতো আপনি নূতন জন্ম গ্রহণ করেন নি এবং বিনষ্টও হবেন না। দেহ থেকে আপনি ভিন্ন। জীবাত্মা নিজেব দেহ থেকে পৃথক থেকে দেহের মৃত্যু দেখে। আত্মার জন্ম মৃত্যু নেই। এর পর আপনি কী শুনতে চান?

পরীক্ষিৎ বললেন, হরির কথা শুনিয়ে আপনি আমাকে অনুগ্রহ করলেন। তক্ষকের ভয়ে আমি আর ভীত নই। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন কৃষ্ণে মনোনিবেশ করে প্রাণত্যাগ করতে পারি।

সূত বললেন, পরীক্ষিতের কথা শুনে শুকদেব ঋষিদের সঙ্গে চলে গেলেন।

পরীক্ষিতের মুক্তি ও জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ

পরীক্ষিৎ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে তক্ষক তাঁকে হত্যার জন্য পথে যেতে যেতে কাশ্যপকে দেখতে পেলেন। ইনি বিষ নষ্ট করতে সক্ষম বলে ইচ্ছামতো রূপ ধারণে সক্ষম তক্ষক কাশ্যপকে অর্থে সন্তুষ্ট করে ব্রাহ্মণ বেশে পরীক্ষিৎকে দংশন করলেন। ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত পরীক্ষিতের দেহ সাপের বিষাগ্নিতে সকলের সামনে ভস্ম হয়ে গেল। হাহাকার উঠল চারিদিক থেকে। দুন্দুভি বেজে উঠল, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা গান করতে লাগল এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এর পর ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

যজ্ঞের আগুনে সর্পকুল আহুতি দিতে লাগলেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন, তক্ষক কেন দগ্ধ হচ্ছে না? ব্রাহ্মণরা বললেন, ইন্দ্র তাকে রক্ষা করছেন। এই কথা শুনে জনমেজয় বললেন, তবে আপনারা ইন্দ্রের সঙ্গেই তক্ষককে আহুতি দিন। ব্রাহ্মণেরা তাই করলেন। ব্যোমযানের সঙ্গে তক্ষককে আকাশ থেকে পড়তে দেখে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি বললেন, তক্ষক অমৃত পান করে অজর ও অমর হয়েছেন, ইনি বধযোগ্য নন। এই আভিচারিক যজ্ঞে নিরপরাধ সর্পরা দগ্ধ হয়েছে। এখন যজ্ঞ শেষ হোক। মহারাজ জনমেজয় ঋষির কথার সম্মান রেখে বললেন, তাই হোক। তারপর সর্প যজ্ঞে বিরত হয়ে বৃহস্পতির পূজা করলেন।

বেদ ও পুরাণ বিভাগ

শৌনক বললেন, হে প্রিয়দর্শন সূত, ব্যাসের শিষ্যরা বেদকে কত প্রকারে বিভাগ করেছেন তা বলুন।

সূত বললেন, ব্রহ্মার হৃদয় থেকে নাদ ও তার থেকে ওঙ্কার উৎপন্ন হয়েছে। সেই ওঙ্কার থেকেই অন্তঃস্থ বর্ণ (য র ল ব), উষ্ম বর্ণ (শ ষ স হ), স্বর বর্ণ, স্পর্শ বর্ণ (ক থেকে ম পর্যন্ত) হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা এই অক্ষর দিয়ে তাঁর চার মুখে চার বেদ সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদের হোতা, যজুর্বেদের অধ্বর্যু, সামবেদের উদ্গাতা ও অথর্ব বেদের প্রশাস্তার অনুষ্ঠেয় কর্মের জন্যই এই চার বেদ। বেদব্যাস এই সব মন্ত্র দিয়ে চারটি সংহিতা প্রণয়ন করে শিষ্য পৈলকে ঋক্, বৈশম্পায়নকে যজুঃ, জৈমিনিকে সাম ও সুমন্তকে অথর্ব সংহিতার উপদেশ দেন। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, আমি একাই আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপনাশক ব্রত আচরণ করব। এই কথায় গুরু বলেন, তোমার মতো ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী শিষ্যের প্রয়োজন নেই, যা শিখেছ তা পরিত্যাগ করে

তুমি চলে যাও। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ বমন করে চলে গেলে অন্য শিষ্যরা তিত্তির পক্ষী রূপে তা গ্রহণ করেন। এই জন্যই যজুর্বেদের এক শাখার নাম তৈত্তিরীয়। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের আরাধনা করে পুনরায় যজুর্বেদ পেয়ে তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন। এই ভাবে সাম ও অথর্ব বেদও শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে।

এইবারে পৌরাণিকদের নাম শুনুন। ত্রয্যারুণি কশ্যপ সাবর্ণি অকৃতব্রণ বৈশম্পায়ন হারীত এই ছয়জনই পৌরাণিক। এঁরা বেদব্যাসের শিষ্য আমার পিতা রোমহর্ষণের মুখ থেকে এক একটি পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয়জনের শিষ্য বলে ছয়টি পুরাণ সংহিতাই অধ্যয়ন করেছি। পিতার নিকটে আমি কশ্যপ সাবর্ণি ও অকৃতব্রণ সমগ্র পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেছি।

পুরাণের দশটি লক্ষণ। এগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টি, বিসর্গ বা প্রলয়, বৃত্তি বা স্থিতি, রক্ষা, অন্তর বা মন্বন্তর, বংশ ও বংশানুচরিত, সংস্থা বা নিরোধ, হেতু এবং অপাশ্রয় বা আশ্রয়। অনেকে পুরাণের সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচ লক্ষণ বলেন।

পুরাণজ্ঞরা এই লক্ষণযুক্ত ছোট ও বড় আঠারোখানি পুরাণ আছে বলেছেন। তাদের নাম ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্ধ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

মার্কণ্ডেয় ঋষির কথা

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয়কে চিরজীবী বলে। প্রলয়ে পৃথিবী সমদ্রে নিমগ্ন হলেও তিনি কী ভাবে থাকেন?

সূত বললেন, আপনার প্রশ্নে লোকের ভ্রম বিনষ্ট হবে। মার্কণ্ডেয় অযুত অযুত বৎসর হৃষীকেশের আরাধনা করে দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। তিনি যোগ সমাহিত অবস্থায় দীর্ঘ ছয় মন্বন্তব অতিবাহিত করেছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তাঁর ভয়ে তপস্যায়

বিঘ্ন ঘটাতে আরম্ভ করেন। হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে যেখানে পুষ্পভদ্রা নামে নদী ও চিত্রা নামে শিলা আছে, সেখানে তাঁর আশ্রমে ইন্দ্র কামদেব বসন্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের পাঠালেন। পুঞ্জকস্থলী নামে এক অপ্সরা স্খলিত বসনে মুনিকে জয় করেছেন ভেবে কামদেব যখন পঞ্চশর প্রয়োগ করেছিলেন, তখন সেই মুনির উপরে তাঁদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল এবং মুনির তেজে দগ্ধ হবার ভয়ে তাঁরা পলায়ন করেছিলেন। তারপর নর ও নারায়ণ রূপধারী হরি তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি দুই ঋষিকে প্রণাম করে স্তব করলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁরা বললেন, তুমি বর নাও। মার্কণ্ডেয় বললেন, বরে আমার প্রয়োজন নেই। আমি আপনার মায়া দেখতে ইচ্ছা করি। 'তাই হবে' বলে তাঁরা বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলেন।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় মার্কণ্ডেয় মুনি যখন পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বসে আছেন তখন প্রবল ঝড় উঠল। তার সঙ্গে মেঘ বিদ্যুৎ ও বর্ষণ। পৃথিবী জলপ্লাবিত হতে যাচ্ছে দেখে মার্কণ্ডেয় ভীত হয়ে উঠলেন। মহা সমুদ্রে ভ্রমণ করতে করতে তাঁর অযুত অযুত বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন তিনি একটা উঁচু জায়গায় ছোট একটি বট গাছ দেখতে পেলেন। তারই শাখায় একটি শিশু শুয়ে আছে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। কিছু জিজ্ঞাসার জন্য এগিয়ে যেতেই সেই শিশুর নিঃশ্বাসের টানে মশার মতো তাঁর শরীরে প্রবেশ করে এই জগৎটাকে দেখে ঋষি মোহিত হয়ে পড়লেন। আকাশ স্বর্গ পৃথিবী নক্ষত্রমালার সঙ্গে হিমালয়ে নিজের আশ্রমও তিনি দেখতে পেলেন। এই ভাবে বিশ্ব দর্শন করে শিশুর প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আবার সেই প্রলয় সমুদ্রে নিপতিত হলেন। তিনি ভগবানকে আলিঙ্গন করবার জন্য এগিয়ে দেখলেন যে শিশুরূপী ভগবান অন্তর্হিত হয়েছেন। তারপরেই সেই বটগাছ জলরাশি ও লোকপ্রলয় তিরোহিত হল এবং তিনি নিজের আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন রুদ্র রুদ্রাণীর সঙ্গে আকাশ পথে বিচরণ করতে করতে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দেখতে পেলেন। উমা গিরিশকে বললেন, এই ব্রাহ্মণকে আপনি সিদ্ধি প্রদান করুন। ভগবান বললেন, এই ব্রহ্মর্ষি পরা ভক্তি লাভ করেছেন, ইনি মোক্ষও পেতে চান না। তবু আমরা এঁর সঙ্গে কথা বলব। এই বলে মহাদেব সেই মুনির নিকটে গেলেন। কিন্তু তখন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ থাকায় তিনি তাঁদের আগমনের বিষয় জানতে পারেন নি। তাই মহাদেব যোগমায়া অবলম্বন করে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। সহসা নিজের হৃদয়ে মহাদেবকে উদ্ভাসিত দেখে মার্কণ্ডেয় সবিস্ময়ে সমাধি থেকে বিরত হলেন। তারপর চোখ খুলে উমা ও প্রমথদের সঙ্গে মহাদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁদের প্রণাম ও পূজা করলেন। তাঁর কথায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব হেসে বললেন, বর নাও। জলময় তীর্থ মাটি ও পাথরের দেবতা দর্শন মাত্রেই কাউকে পবিত্র করতে পারেন না, কিন্তু তোমরা দর্শনমাত্রই জনগণকে পবিত্র কর বলে ব্রাহ্মণকে আমরা নমস্কার করি। মার্কণ্ডেয় বললেন, কী আশ্চর্য! ঈশ্বরও দেখছি তাঁদের শাসনাধীন জীবকে প্রণাম ও স্তব করেন। তবু বর যখন দিতে চাইছেন, তখন এই বর দিন যে আপনাদের প্রতি আমার ভক্তি যেন অচল থাকে। মহাদেব বললেন, প্রলয়কাল অবধি যশ পুণ্য অমরত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হোক। বলে বিদায় নিলেন। মহাদেবের বরেই মার্কণ্ডেয় এখনও বিচরণ করছেন।

তান্ত্রিক উপাসনা

শৌনক বললেন, আপনি তন্ত্র শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানেন। এই বিষয়ে কিছু বলুন।

সূত বললেন, বেদ ও তন্ত্র ভগবানের যে বিভূতির বর্ণনা করেছেন, তাই বলছি। মায়া প্রভৃতি নয়টি তত্ত্বে বিকারময় সেই বিরাট পুরুষ নির্মিত। তাঁতে ত্রিভুবন দেখা যায়। সূর্য মণ্ডল সেই দেবতার

উপাসনার স্থান, তাঁর সেবায় উপাসকের পাপক্ষয় হয়। বিনাশরহিত জ্ঞানশক্তি হরির লক্ষ্মী, তন্ত্রমূর্তি বিশ্বক্‌সেন তাঁর পারিষদদের অধিপতি, অণিমাদি আট গুণ তাঁর আট দ্বারপাল।

সূর্য

বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ সূর্য যাত্রা নির্বাহক হয়ে লোকসমূহকে প্রকাশ করছেন। বিশ্বের স্রষ্টা লোকসকলের আত্মা হরিই সূর্য। বিষ্ণুরূপ সূর্যের বিভূতি প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে স্মরণ করলে মানুষের পাপ হৃত হয়। সূর্য বারো মাস দশ দিকে বিচরণ করে ইহলোক ও পরলোকে জনগণের শুভ বুদ্ধির বিকাশ করেন। ঋষিরা সূর্যরূপী বিষ্ণুর স্তব করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান বিষয় ও মাহাত্ম্য

সূত বললেন, আপনাদের কথায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বিষ্ণুর অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করলাম। এতে কৃষ্ণের কথা সম্যক রূপে কীর্তিত হয়েছে। এতে সংসারী জীবের উৎকৃষ্ট জন্মলাভ ও মোক্ষপ্রাপ্তি পরব্রহ্ম বিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত গুহ্যজ্ঞান ও উপাখ্যানের সহিত সেই জ্ঞানের জনক কর্মের কথাও বলা হয়েছে। ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যও সম্যক রূপে বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন কালে মহর্ষিদের সভায় শুকদেবের মুখ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, সেই বাসুদেবের মহিমা আমি আপনাদের বললাম।

এইবারে আপনারা পুরাণের শ্লোক সংখ্যা শুনুন। ব্রহ্ম পুবাণে দশ হাজার, পদ্ম পুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, বিষ্ণু পুরাণে তেইশ হাজার, শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার, ভাগবত পুরাণে আঠারো হাজার, নারদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নি পুরাণে পনেরো হাজার চারশো, ভবিষ্য পুরাণে চোদ্দ হাজার পাঁচশো, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার, লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার,

বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশী হাজার একশো, বামন পুরাণে দশ হাজার, কূর্ম পুরাণে সতেরো হাজাব, মৎস্য পুরাণে চোদ্দ হাজার, গরুড় পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দশ হাজার শ্লোক আছে। এইভাবে সব পুরাণ মিলিয়ে চার লক্ষ শ্লোক বলা হয়।

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সার জীব ও ব্রহ্মের একত্ব রূপ এই পুরাণের বিষয়। ভগবানের সঙ্গে জীবের কৈবল্য বা অভেদবাদ এই পুরাণের প্রয়োজন বা ফল। শ্রীমদ্ভাগবতই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সার বলা হয়। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে মহাদেব, বৈষ্ণবদের মধ্যে কৃষ্ণ ও তীর্থের মধ্যে কাশী, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ। যে গ্রন্থে পরমহংসের পরম জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত কর্মত্যাগ আবিষ্কৃত হয়েছে তা শ্রবণ বা পাঠ করলে বিমুক্ত হওয়া যায়। যাঁর নাম কীর্তনে সমস্ত পাপের বিনাশ হয় এবং প্রণামে হয় দুঃখের নাশ, সেই পরমাত্মা হরিকে প্রণাম করি।

নাম সংকীর্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখ শমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।১৩।২৩

॥ শ্রীমদ্ভাগবত সমাপ্ত ॥